স্মৃতি অম্লান

১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১ম থেকে ৪০তম
শহীদ ভাইদের তথ্য সম্বলিত

শহীদ স্মরণিকা

স্মৃতি অম্লান

১

স্মৃতি অমলিন

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৫০৫৩৮, ৮১১৩৯৯৮
ফ্যাক্স : ৯৫৫৬৬২৬
www. shibir.org.bd

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১০ ইংরেজি
পৌষ ১৪১৭ বাংলা
মহররম ১৪৩২ হিজরি

প্রচ্ছদ
হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ
আল-কাওছার প্রিন্টার্স

মূল্য : ১২৫ (একশত পঁচিশ) টাকা

SMRITY OMOLIN: A compilation on Myrtars of Bangladesh Islami Chhatrashibir. Edited and published by Bangladesh Islami Chhatrashibir, December 2010
Price Tk. 125.00 US$ 3.00

www.pathagar.com

প্রধান সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম

সম্পাদক
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মুর্তজা

সম্পাদনা সহযোগী
নূর মোহাম্মদ মণ্ডল
মো: দেলাওয়ার হোসেন
মু. আতাউর রহমান সরকার
মুহাম্মদ নিজামুল হক নাঈম
মিয়া মুজাহিদুল ইসলাম
মুহাম্মদ সোহেল খান
মুহাম্মদ আতিকুর রহমান
মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার
শামসুল আলম গোলাপ
মোকাররম বিল্লাহ আনসারী
মাসুদ পারভেজ রাসেল
মোহাম্মদ আবু নাসের
মুহাম্মদ তারেকুজ্জামান
আল-মুত্তাকী বিল্লাহ
মো: আব্দুর রহমান
জুবায়ের হুসাইন
আবুল কালাম খান
মো: আবদুর রহমান
রিয়াদ, ফেরদৌস
সুলতান, রাফিউল
মাহদী, মামুন

www.pathagar.com

পৃথিবীর শুরু থেকে
আজ অবধি
যাঁদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হলো
এ সবুজ ভূখণ্ড

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আমীরে জামায়াতের বাণী
কেন্দ্রীয় সভাপতির বাণী
সম্পাদকীয়

'শাহাদাত' ইসলামী আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন	১৩
শাহাদাতের সংক্ষিপ্তসার	২৯
শহীদদের জীবনী	৩৭
১ম শহীদ সাব্বির আহমদ	৩৯
২য় শহীদ আবদুল হামিদ	৪৪
৩য় শহীদ আইয়ুব আলী	৫২
৪র্থ শহীদ আব্দুল জব্বার	৫৬
৫ম শহীদ খুরশীদ আলম	৬৪
৬ষ্ঠ শহীদ আব্দুল মতিন	৬৮
৭ম শহীদ রাশিদুল হক রশিদ	৭১
৮ম শহীদ শীষ মোহাম্মদ	৭৩
৯ম শহীদ মুহাম্মদ সেলিম	৭৫
১০ম শহীদ শাহাবুদ্দিন	৭৭
১১তম শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ	৮০
১২তম শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর	৮২
১৩তম শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী	৮৬
১৪তম শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর	৯২
১৫তম শহীদ বাকীউল্লাহ	৯৬
১৬তম শহীদ আমীর হোসাইন	১০০
১৭তম শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	১০৩

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১৮তম শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী	১০৮
১৯তম শহীদ আব্দুল আজিজ	১১১
২০তম শহীদ আইনুল হক	১১৫
২১তম শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরী	১১৮
২২তম শহীদ আমিনুল ইসলাম	১২১
২৩তম শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ	১২৪
২৪তম শহীদ আসলাম হোসাইন	১২৬
২৫তম শহীদ আসগর আলী	১২৯
২৬তম শহীদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম	১৩২
২৭তম শহীদ তরিকুল ইসলাম	১৩৪
২৮তম শহীদ জসিম উদ্দিন মাহমুদ	১৩৬
২৯তম শহীদ শফিকুল ইসলাম	১৩৯
৩০তম শহীদ আফাজ উদ্দিন	১৪৪
৩১তম শহীদ শিহাব উদ্দিন	১৪৭
৩২তম শহীদ মীর আনসার উল্লাহ	১৪৯
৩৩তম শহীদ খোরশেদ আলম	১৫২
৩৪তম শহীদ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন	১৫৩
৩৫তম শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া	১৫৫
৩৬তম শহীদ আলী হোসেন	১৫৭
৩৭তম শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক	১৫৯
৩৮তম শহীদ মোজাহের আলী	১৬২
৩৯তম শহীদ খলিলুর রহমান	১৬৫
৪০তম শহীদ শেখ ফিরোজ মাহমুদ	১৬৯
অ্যালবাম	১৬৩

www.pathagar.com

বাণী

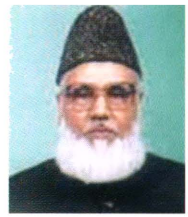

পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে সেই অতি প্রাচীনকাল থেকে। এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন। বাতিল শক্তির ধ্বজাধারীরা সত্যের বিরুদ্ধে অপচেষ্টা চালিয়েছে বারবার। আল্লাহ যেমনটি বলেন, "তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। আর আল্লাহর এটাই ফয়সালা যে, কাফিররা যতই অপছন্দ করুক, তিনি তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেনই।" (সূরা আস্-সফ, আয়াত : ৮)

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সত্য ও সুন্দরের পথের সৈনিকদের একটি সংগঠনের নাম। এটি এক অনন্য ও ঐতিহাসিক নাম। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা যখন সুনাগরিক তৈরিতে ব্যর্থ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরাজ করছিল অস্থিরতা, সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিকামী মানুষের দিগ্বিদিক ছোটাছুটি– এমনই এক প্রেক্ষাপটে ছাত্রশিবির তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে। তরুণ ছাত্রসমাজের অহঙ্কার এ সংগঠনটি আজ এদেশের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার হৃদয়স্পন্দন।

প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসন এবং ইংরেজ শাসনপরবর্তী শাসকগোষ্ঠীর চরম ব্যর্থতা আর উদাসীনতায় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। পঙ্গু হয়ে যায় তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। বৈষম্যের অবসান আর শান্তির অন্বেষায় পাকিস্তান ভেঙে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এ স্বাধীন দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার জয়-জয়কার, হত্যার রাজনীতির মহোৎসব, ইসলামী রাজনীতি বন্ধসহ এমন সবকিছু ঘটতে থাকলো যা ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। মানুষ এ অবস্থার উত্তরণ

www.pathagar.com

চেয়েছিল। অবস্থার পটপরিবর্তনের একটা সময়ে ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবিরের যাত্রার সূচনা ছিল এদেশ ও জাতির জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাজুক আর অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ এমন একটি আদর্শবাদী ছাত্রসংগঠনের জন্য অপেক্ষার প্রহর গুনছিল।

দীর্ঘ ৩৩ বছরে নিজেদের গঠনমূলক আর কল্যাণধর্মী কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ছাত্রশিবির আজ এক বিকল্প শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম- এক মুক্তিকামী কাফেলার নাম। ছাত্রশিবিরের এ অর্জনটুকুর পেছনে যেমন ছিল তাদের গঠনমূলক আর কল্যাণধর্মী কর্মসূচি, তেমনি একদল মর্দে মুমিনের ত্যাগ, কুরবানি আর শাহাদাতের নজরানা। ৩৩ বছরে ১৩৬ জন তরতাজা যুবকের শাহাদাতের মধ্য দিয়ে ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রা হয়েছে বেগবান, পেয়েছে শহীদি কাফেলার মর্যাদা। রাসূলের (সা) আদর্শ আর সাহাবায়ে কেরামের ত্যাগের ধারাবাহিকতা এ সংগঠন ধরে রাখতে পেরেছে শহীদের রক্ত, পঙ্গু এবং আহত ভাইদের ত্যাগ আর কুরবানির মধ্য দিয়ে।

যে ১৩৬ জন মর্দে মুমিন তাদের জীবন দিয়ে এ দেশে ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী দেখতে চেয়েছেন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তার সেসব বীর সিপাহসালার জীবনী আর ইতিহাস রক্ষার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তাদের এ উদ্যোগ সত্যিই সময়োপযোগী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণাদায়ক। এ উপলক্ষে **'স্মৃতি অমলিন'** নামক শহীদ স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগের প্রশংসা করছি এবং সেই সাথে সফলতাও কামনা করছি।

শহীদরা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তারা কোনো দোষ করেননি। তবুও হায়েনারা-ঘাতকরা অকালে তাঁদের জীবন কেড়ে নিয়েছে। তাঁদের মায়ের বুক খালি করেছে। কুরআনের ভাষায় তাদের দোষ হচ্ছে- "তাঁদের অপরাধ একটাই তাঁরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।"

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে শহীদ ভাইদের উচ্চ মর্যাদা কামনা করছি। তাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ যেন সবর দান করেন এবং উত্তম প্রতিদান দান করেন সেই দোয়া করছি।

(মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী)
আমীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
এবং সাবেক মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

বাণী

"জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদি রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি।"

শহীদি রক্তে হেসে উঠেছে এ দেশের তরুণ-যুব সমাজের বিশাল একটি শহীদি কাফেলা। আর তাইতো ১৩৬ জন শহীদের রক্তস্নাত কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আজ এ দেশের মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার কাছে একটি প্রিয় নাম। জাহেলিয়াতের তীব্র নখরাঘাত, রামপন্থী-বামপন্থী আর নাস্তিক্যবাদের সয়লাবে জাতি যখন আপাদমস্তক নিমজ্জিত; অশ্লীলতা-বেহায়াপনা আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির থাবা যখন তরুণ সমাজকে গ্রাস করছিল ঠিক এমনি প্রেক্ষাপটে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি **'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির'** তার যাত্রা শুরু করেছিল। শুরুতেই অনেক মহলের সাধুবাদ পেলেও এ সংগঠনকে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে হয়েছে। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে ছাত্রশিবির আজ সুধী-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটি বিশ্বস্ত ঠিকানা।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবির আজ এক অপ্রতিরোধ্য সংগঠনের নাম। এ অপ্রতিরোধ্য গতি এনেছে এ সংগঠনের অসংখ্য ভাইয়ের আত্মত্যাগ আর পঙ্গুত্ব বরণের মধ্য দিয়ে। সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে, এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের পথ পরিক্রমাকে ব্যাহত করতে বাতিল শক্তি সব সময় ছিল সোচ্চার। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ শহীদেরা এ শক্তিকে রুখে দিয়েছেন, তাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এ দেশের সবুজ ভূ-খণ্ডে ইসলামকে বিজয়ী করার দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে তাদের মহামূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। পেশ করেছেন শাহাদাতের সুমহান নজরানা।

www.pathagar.com

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশ এবং তার সবুজ ক্যানভাস আজ আর একদল মর্দে মুমিন তরুণ প্রতিভাবান ছাত্রের রক্তে রঞ্জিত। তাঁরা কোনো অপরাধ করেননি। তাঁরা একটি শোষণ-বৈষম্যহীন স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন আল্লাহর এ জমিনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার। ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ী করার দৃঢ়প্রত্যাশা হৃদয়ে লালন করেছিলেন তাঁরা। পরিণতিতে বাতিল শক্তির মোকাবেলায় তাদের জীবন বিলিয়ে দিতে হয়েছে। হায়েনারা জনমদুখী মাকে করেছে সন্তানহারা আর প্রিয় বোনকে করেছে ভাইহারা। সন্তানহারা মায়ের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হলেও, ভাইহারা বোনের আর্তনাদে ওই আরশ কেঁপে উঠলেও কেঁপে ওঠে না খুনি-হায়েনাদের অন্তরাত্মা। এরা হিংস্র, মানবতার দুশমন।

আল্লাহর পথে যাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁরা চিরঞ্জীব-চির অমর, তাদের প্রকৃত কোনো মৃত্যু নেই। আমাদের শহীদেরা বাহ্যিকভাবে মৃতুবরণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা জীবিত। এ ক্ষেত্রে কুরআন পাকের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা, "আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। প্রকৃতপক্ষ তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।" (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫৪)

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যে অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। অনুপ্রেরণা জোগাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও। আমরা সে অনুপ্রেরণা ধরে রাখতে চাই। শহীদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজকে অব্যাহত রাখতে চাই। এ ক্ষেত্রে শহীদদের জীবনী, স্মৃতি, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আমাদের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। সে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা শহীদ স্মরণিকা **'স্মৃতি অমলিন'** প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা এই চির তরুণ-চির জীবিত মর্দে-মুমিনদের শাহাদাতের নজরানা থেকে শিক্ষা নিয়ে তাঁদের অসমাপ্ত কাজ যদি কিছুটাও আঞ্জাম দিতে পারি– তাহলে সেখানেই খুঁজে পাব এই শহীদ স্মরণিকার যথার্থতা। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন॥

(ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম)
কেন্দ্রীয় সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির এ দেশের ছাত্রসমাজের আদর্শিক ঠিকানার নাম। যে ঠিকানা জীবনের প্রতিটি বাঁক, স্বপ্ন ও সম্ভাবনার প্রতিটি ক্ষেত্র, জীবনের শেষ পরিণতিকে স্বচ্ছতায় অঙ্কিত করে। হতাশার গুহায় আশার আলো জ্বালিয়ে নির্ভেজাল করে আগামীর রাজপথ। ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদের সংগঠন হলেও প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রসহ দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় বহুবিধ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান-পতন ও ভাঙা-গড়ায় এক সাহসী ও উজ্জ্বল ভূমিকা রেখে চলেছে ছাত্রশিবির। এছাড়া ছাত্রসমাজের দাবি আদায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধান, ছাত্রদের নানা সুবিধা আদায়ের সংগ্রামে শিবির আজও সদা সচেতন ও তৎপর।

তথাপি মানবকল্যাণে নিবেদিত এই সংগঠনটির চলার পথকে নানা সময়ে নানানভাবে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সে ধারা এখনও অব্যাহত আছে। এমনকি সমাজ উন্নয়নে যে ছাত্রসমাজ অকাতরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের মূল্যবান জীবনটি কেড়ে নিতেও কুণ্ঠিত হয়নি বাতিলের ধ্বজাধারীরা। মূলত সত্য ও শাশ্বত আদর্শের কাছে পরাজিত হয়েই তারা বেছে নিয়েছে মানবতার বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম পথটি। ফলে অকালে ঝরে গেছে সম্ভাবনাময় কিছু প্রাণ– যারা পারতেন বাংলাদেশের সবুজ জমিনকে আরও সবুজ করতে, দেশের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে। হয়তো আমরা ইতোমধ্যেই তাদের নেতৃত্বে পেয়ে যেতাম সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ যার স্বপ্ন আমরা প্রতিনিয়ত দেখে চলেছি।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। পৃথিবীর শুরু থেকেই এর আরম্ভ। এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে। নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, সত্য পথে হাঁটতে গেলে বাধা-বিপত্তি ও আঘাত আসবেই, খুন-রক্ত ঝরবেই। ইসলামী ছাত্রশিবির যেহেতু মহান রাব্বুল আলামিনের পথে মানুষকে আহ্বান করে, মানবতার মুক্তির মূলমন্ত্র প্রচার করে, মানুষ হয়ে মানুষের সকল প্রকার দাসত্ব পরিহার করে আল কুরআন তথা রাসূল (সা) প্রদর্শিত বিধান বাস্তবায়নের জন্য জোর প্রচারণা চালায়– মানবতা তথা ইসলামের দুশমনরা তাই এটা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তাইতো নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তারা বেছে নেয় হত্যা, নির্যাতন, শোষণ আর পাশবিকতা ও পৈশাচিকতার ঘৃণ্য যত পন্থা। ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিয়ে ইসলামকে এই জমিনে বাস্তবায়নের শপথ নিয়েছে। আর এই পথে জীবন দেয়াটাকে আল্লাহপাক মৃত্যুহীন জীবন বলে তাঁর কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন। কাজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবনটাকে কুরবানি করতে এতটুকু দ্বিধান্বিত হন না মানুষের মুক্তিকামী এই কাফেলার সৈনিকেরা। ফলে ১৩৬ জন টগবগে অপার সম্ভাবনার, জীবন জাগানিয়া কলরবের, স্বপ্নময় উচ্ছল ঢেউয়ের অর্থাৎ একটি সমৃদ্ধ ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষী সমাজ বিনির্মাণে সদা প্রচেষ্টারত অর্ধ ফুটন্ত একগুচ্ছ গোলাপের অকালে ঝরে পড়ার পরও থেমে থাকেনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুর্গম পথচলা। বরং "শহীদেরা আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ, গড়ে গেছে দ্বিধাহীন সাহসের সোজা রাজপথ।" ছাত্রশিবিরের জনশক্তি মূলত শহীদদের উদ্যমতা, সাহসিকতা, নির্ভীকতা, অকপটতা তথা তাঁদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে খিলাফতের দায়িত্বকে সফল আঞ্জাম দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। "স্মৃতি অমলিন" মূলত ছাত্রশিবিরের শহীদ ভাইদের জীবনালেখ্য তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস। যদিও এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁদের জীবনের সকল বিষয় উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, তারপরও আগামী দিনে এই সংগঠনের কর্মীবাহিনী তথা ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীদের সম্মুখে চলার পথকে আরও প্রশস্ত করবে- এই প্রত্যাশা নিয়েই ছাত্রশিবিরের সকল শহীদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রথম ৪০ জন শহীদ ভাইয়ের জীবনী থেকে নির্যাস নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যোগের প্রথম প্রকাশ "স্মৃতি অমলিন-১"। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য শহীদদের জীবনীকে অমলিন করে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের সম্বল নিতান্তই অপ্রতুল আর সীমাবদ্ধতা প্রচুর। তারপরও শহীদদের পরিবার, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্মরণিকার সাথে জড়িত ভাইদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সহযোগিতা সেই দুরূহ কাজকে সম্ভব করেছে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন শহীদ, পঙ্গু, আহত ও নির্যাতিতদের ত্যাগ ও কুরবানি কবুল করেন, শুভাকাঙ্ক্ষী, লেখক এবং এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের উত্তম জাজাহ প্রদান করেন- এই প্রত্যাশা করছি। আমিন।

(ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক)
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'শাহাদাত' ইসলামী আন্দোলনের প্রাণস্পন্দন

অধ্যাপক মফিজুর রহমান

এ দেশের তরুণদের যে সংগঠন মানবতার মুক্তির দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে নিজেদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, সাহাবায়ে কিরামদের আখলাকের আলোকে আগামী প্রজন্মের চরিত্র সংশোধন ও পুনর্গঠনে অষ্টপ্রহর তারবিয়াত গাহে পড়ে রয়েছে, ইসলামী বিপ্লবের মহা প্রয়োজনে এ দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আর প্রতিটি জনপদে যারা গড়ে তুলছে কুরআনের পাঠশালা, লাখ লাখ পথহারা তরুণকে যারা দেখাচ্ছে হেরার রাজতোরণ– তাদের জন্য মিল্লাতের স্বজনেরা দুই হাত তুলে মুনাজাত করছে মহান প্রভুর দরবারে। তাদের পথ অতি দীর্ঘ, ভয়াল ও বিপজ্জনক। যারাই ইসলামকে বিজয়ের আসনে দেখতে চেয়েছে তাদের সকলকে দীর্ঘমেয়াদি রক্তাক্ত যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে হয়েছে। সকলের জানা রয়েছে, ইসলাম আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সৃষ্টির জন্য অবতীর্ণ গ্রহণযোগ্য জীবনবিধান

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ এটা মানবরচিত আইন ও কানুনের অধীন থাকতে আসেনি। এটা সকল মত ও পথের ওপর বিজয়ী হতে এসেছে। আর সমস্ত নবীকে এ দ্বীনে হককে বিজয়ী করার দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর সকল যুগের সকল নবী ও উম্মতে মুহাম্মদী (সা)-কে এ দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করাকে ফরজ করে দেয়া হয়েছে। এ দায়িত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে জান্নাতে যাওয়ার চিন্তা করা একটি কল্পনাবিলাস ভয়াবহ অপরাধ।

আগেই বলেছি এ দায়িত্ব পালনে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের জন্য কোন সহজ পথ নেই। এ পথের প্রতিটি ইঞ্চি জমিন সংঘাতময়, এ জমিনের ওপর হাজার বছর ধরে দাপটের সাথে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বস্তুবাদী সভ্যতা। এ জাহেলি সভ্যতাকে পাহারাদারি করার জন্য পরাশক্তির অস্ত্রাগারে হাজার হাজার টন পরমাণু অস্ত্র মজুদ রয়েছে। তাক করে রাখা হয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় দূরপাল্লার ভয়াল ক্ষেপণাস্ত্র। তাকে দীর্ঘস্থায়ী ও সম্প্রসারিত করার চিন্তা নিয়ে জ্ঞান-গবেষণায় নিরন্তর ব্যস্ত রয়েছে শত শত হান্টিংটনের মস্তিষ্ক। ইসলামকে প্রতিষ্ঠার 'আওয়াজ যারা' যখন যে ময়দান থেকে তুলবে তাদেরকে সাম্রাজ্যবাদীদের এ লোমহর্ষক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এর ওপর তাদের

www.pathagar.com

হাতে রয়েছে Media-এর ভয়াল অস্ত্র। এটা তো হাজার হাজার টন গোলাবারুদের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই Electronic Media সৃষ্টি করে চলছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের হাজার হাজার হিরোসিমা ও নাগাসাকির তাণ্ডবলীলা। ইতোমধ্যে এ Media আর মিথ্যাচার সারা পৃথিবীতে ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনে নিবেদিত লাখ লাখ নিরপরাধ কর্মীকে আখ্যায়িত করছে জঙ্গিবাদী, মৌলবাদী, Fanatics, সন্ত্রাসী, স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী বলে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথে শত শত শক্তিশালী মাইন পুঁতে দিয়ে সত্যের পথ চলাকে কঠিন ও দুর্বিষহ করা, নেতৃবৃন্দকে ভয়ানক সন্ত্রাসী ও জঙ্গি বলে চিহ্নিত করা, আর খোঁড়া অজুহাত সৃষ্টি করে স্বাধীন দেশে মনুষ্যবিহীন বিমান হামলা করা, স্বাধীনতা বিপন্ন করে হাজার বছরের সভ্যতাকে বিরান করে তাদের নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করা, সভ্য সমাজের একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে নিজ দেশে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া, আর স্বাধীন সরকার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উৎখাত করে গণতন্ত্রের নামে দালাল সরকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি অচিন্তনীয়, ভয়াল অপরাধ সংঘটিত করানো হচ্ছে প্রতিনিয়ত। এত ষড়যন্ত্র, এত বিপদ ও বাধা, এত মারণাস্ত্র ও লাশের পাহাড় ঠেলে ইসলামী আন্দোলন কিভাবে এত জোরদার ও এত অপ্রতিরুদ্ধ হচ্ছে তা ইসলামের শত্রুদেরকেও ভাবিয়ে তুলছে। এর কোন Clue আজও তাদের জানা নেই। আমি তাদেরকে অবহিত করে বলতে চাই, 'তোমাদের আঘাত, অত্যাচার, জুলুম, দলন, নিপীড়ন, বোমা, অগ্নিসংযোগ ও নির্বিচার হত্যা তোমাদের জন্য বুমেরাং হচ্ছে। তোমাদের বিবেক তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলছে, তোমাদের নিষ্পাপ প্রজন্ম এ অন্যায়কে মেনে নিতে পারছে না। তারা তোমাদের সন্তান হয়ে তোমাদের অর্থে কেনা অস্ত্র দিয়ে তোমাদের শত্রুদের পক্ষে লড়াই করছে। এত কিছুর পরও একদল মানুষ সমগ্র পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে আজ ইসলামী বিধান বিজয়ের সংগ্রামে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। তাদেরকে কী পরিমাণ ত্যাগ দিতে হবে? কত খুন জমিনে ঢেলে দিতে হবে? কত হাজার মায়ের বুক খালি করে দিতে হবে? তার পরিমাপ করা এক কঠিন ব্যাপার। আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে আর কত রক্ত প্রয়োজন? আর কত ভাইয়ের শাহাদাতের বিনিময়ে বিজয়ের লাল সূর্য উদিত হবে? আমি বলব, আটলান্টিক মহাসমুদ্রের জলরাশি যেমন অপরিমেয়, সম্ভবত সে পরিমাণ খুনের দরিয়া সৃষ্টি প্রয়োজন হতে পারে। কত ভাইকে শহীদ হতে হবে? তার হিসাব করা কঠিন। সাহারার বালুকারাশি যেমন অগণন তেমনি অসংখ্য বিপ্লবীকে শাহাদাতের মিছিলে কাতারবন্দী হওয়া জরুরি। কুরআনের বিধান বিজয় করার পথে এত খুন, এত শাহাদাত বেশি নয়। সমস্ত মুসলিম উম্মাহর ধমনীতে প্রবাহিত সমুদয় রক্ত আর সকলের জীবন একত্র করলেও আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াতের মর্যাদা সব কিছুর চাইতে বেশি। তাই এ পথের ওপর চলার সিদ্ধান্ত যারাই নিয়েছে, তাদেরকে পার্থিব লোভলালসা, আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, ইত্যাকার বস্তুর সাথে সারা জীবন দেখা নাও হতে পারে। কারণ ভোগ-বিলাস, হতাশা-ক্লান্তি, অধৈর্য-অস্থিরতা, আরাম ও বিশ্রামের সাথে বিপ্লবের রয়েছে আজন্ম শত্রুতা। বিপ্লবের ইতিহাসে যারা স্মরণীয় তাদের সকলের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, বিপ্লব কোন কবিতার পঙক্তি রচনা

www.pathagar.com

নয়, গোলাপ ফুলের মালা গাঁথা নয়, শান্তির পায়রা অবমুক্ত করা আর আকাশে বেলুন উড়ানোর দৃশ্য দেখা নয়,

চীনের মাও সেতুং বলেন, 'বিপ্লব রক্তের কলকল স্রোত বইয়ে দেয়ার নাম, তা একটি ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করে অপরটিকে বিজয় করার বিষয়'। আল্লামা মওদূদী (রহ) বলেন, 'ইনকিলাব বাচ্চুকা খেল নেহি'। 'বিপ্লব ছেলের হাতের মোয়া নয়'। বিপ্লবের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয় ও সার্থক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে। Historian Gibon মন্তব্য করে বলেন, 'It was one of the memorable revolution in the history of the revolutions'। তিনি আরও বলেন, 'মুহাম্মদের বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে সংঘটিত যারা সমস্ত আন্তরাত্মা প্রকম্পিত করে দিয়েছে'। মুসলিম মনীষার মধ্যে আমাদের যুবকদের জীবন দেয়ার উন্মাদনাকে থামিয়ে দিতে চায়। যারা এটাকে আত্মঘাতী মনে করে। আমাদের যুবকদের জীবন উৎসর্গ করার চেয়ে জীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে নসিহত করছে। আমার বলতে কোন দ্বিধা নেই, সম্ভবত এরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পোষা ও গৃহপালিত প্রাণী। এ সমস্ত বুজুর্গকে নসিহত আমল করলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী রেনেসাঁর যে অনল জ্বলে উঠছে তা নিভে যাবে। দুশমনরা কবে আমাদেরকে সংঘাত ছাড়া নির্বিঘ্নে ইসলামের দাওয়াত তানজিম ও তারবিয়াতের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ দেবে সে দিনের অপেক্ষা করার মিথ্যা, অসম্ভব ও অবাস্তব কুহেলিকার গোলকধাঁধায় মিল্লাতের ভাগ্য জুড়ে দিতে চায়। মহাকাশের বুক চিড়ে উড়ে চলা মুক্ত বিহঙ্গের ডানা অকেজো করে এরা সোনার খাঁচায় দানা-পানি দিয়ে যে ঈগল ছানা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'মহাকাশে উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে বন্দিখাঁচায় দানা-পানি গ্রহণ করার চেয়ে সে ঈগলের মরণ ভক্ষণ করা শ্রেয়'। সোনালি মসজিদের চার দেয়ালের খাঁচায় সালাত, সিয়াম ও জিকিরের দানা-পানিতে সন্তুষ্ট রেখে যারা ইসলামের বিজয়ের ডানায় উড়ার ক্ষমতা কেড়ে নিতে চায় তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী নয়। আমাদের চলার পথনির্দেশ রয়েছে আল্লাহতায়ালার আখেরি কিতাবে ও আখেরি রাসূলের পবিত্র জীবনে। কোন পীর কী বলছে, আর কোন বুজুর্গ কী করছে তা ইসলাম নয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর কী নির্দেশ আর রাসূলুল্লাহর (সা) কী আমল। কুরআনুল কারিমে শাহাদাতের এত উচ্চমর্যাদা আলোচিত হয়েছে যেন মুসলিম উম্মাহ তার প্রতিটি পশমে তার শাহাদাতের তামান্না পোষণ করে। এ শাহাদাতকে কুরআন জীবনের জীবন বলেছে, একে মৃত্যু বলা পর্যন্ত হারাম করে দেয়া হয়েছে। শাহাদাতের এক এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে শতশত ফোঁটা জীবন রয়েছে, তা যেন জাতির জন্য জীবনের সঞ্জীবনী একটি জাতির অন্ধ চোখে আলোর মত, বধির কর্ণে শ্রবণশক্তি, হৃদয়ের মধ্যে চেতনার অনুভব। এ শহীদরা একটি জাতির জীবনের আকাশে চেতনার ধ্রুবতারা। জাতি যখন হতাশার তিমিরে ডুবে যায়, জীবনের লক্ষ্য যখন হারিয়ে যায়, শহীদরা তাদের জন্য নিয়ে আসে চেতনার আলো। দিশাহারা নাবিক যেমন মহাসমুদ্রে ধ্রুবতারা দেখে পথ খুঁজে নেয়। কবি BINYON বলেন, শহীদরাও তেমনি জাতির আলোর জ্যোতিষ্ক–

www.pathagar.com

"As the stars that are starry in the time of our darkness.
To the end, to the end they remain."

শহীদরা বৃদ্ধ হয় না, অসুস্থ ও নিষ্ক্রিয় হয় না। শাহাদাতের সময় যে উন্মাদনা নিয়ে তারা জীবন উৎসর্গ করেছে অনন্তকাল তারা সে জীবনী শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে। আর নিষ্ক্রিয় ও স্বার্থপর, ভীরুদেরকে ভাগ্যের উন্মাদনায় উজ্জীবিত করে কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে।

আল কুরআন তাদের অনন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়ে বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

"আল্লাহর পথে যারা জীবন দিয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না, প্রকৃতপক্ষে তারাই জীবিত। তাদের জীবন সম্পর্কে তোমাদের চেতনাই নেই"। (সূরা আল-বাকারা : ১৫৪)

কুরআন সাধারণ মানুষের জীবন ও মরণ সম্পর্কে প্রচলিত চিন্তা চেতনাকে কঠিনভাবে আঘাত করেছে। কুরআন বলছে, তোমরা যারা বেঁচে রয়েছ, তারা মরে রয়েছ। তোমাদের জীবনের মধ্যে কোন জীবনের স্পন্দন নেই, একে বলে 'Death in life'। এদের চোখ আছে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নেই, মজলুমদের ওপর জালেমদের অত্যাচারের মর্মস্পর্শী দৃশ্য অবলোকন করেও তাদের চোখ অশ্রু বিসর্জন করে না। নির্যাতিতদের আর্তনাদ এ জীবিতদের বধির কর্ণে কোন অনুভূতি জাগায় না। বঞ্চিত মানুষদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে এদের জিহ্বা প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করে না। আগুনের লেলিহান শিখায় যে বস্তি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে তাদের বাঁচানোর জন্য যাদের কদম সামনে এগোয় না, হাত-পা অচল এবং অবশ হয়ে থাকে তাদেরকে কুরআন জীবিত হওয়ার পরও মৃতদের মধ্যে শামিল করে।

আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যুদ্ধে হক্বের জন্য যাদের রক্ত প্রবাহিত হলো জমিনে, প্রতিবাদ করতে করতে যারা নির্বাক হয়ে গেল জনমের তরে, যুদ্ধের ময়দানে তরবারি নেজা-বল্লম, বন্ধুক আর কামানের গোলার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যারা পান করল শাহাদাতের পেয়ালা, কুরআন তাদের বলছে Life in death। তাদের প্রবাহিত রক্তের প্রতিটি কণা যেন খুনিদের বিরুদ্ধে এক একটি ভয়াল ও জীবন বোমা তাদের নির্বাক হয়ে যাওয়া জিহ্বা থেকে যেন উচ্চারিত হচ্ছে ইসরাফিলের বজ্রনিনাদ। তাদের নিষ্প্রাণ ও পলকহীন চাহনির দিকে কার সাধ্য তাকানোর? যে চোখের দিকে দৃষ্টি দিলে জালেমদের কলিজার পানি শুকিয়ে যায়। শহীদদের রক্তাক্ত, প্রাণহীন পড়ে থাকা দেহটি যেন জালেমদের অগ্রযাত্রার পথে বাধার হিমালয়, যা থামিয়ে দেয় তাদের সামনে চলার মিছিল। এ লাশের পাহাড় অতিক্রম করা দুর্লঙ্ঘ এক বিষয়।

কুরআনুল কারিমও শহীদদের বলেছে– এরাই সত্যিকারার্থে জীবন্ত যা তোমাদের অনুধাবনের ক্ষমতার বাইরে।

প্রিয় পাঠক, আজ থেকে হাজার বছর আগে ইসলামী খিলাফতব্যবস্থা ধ্বংস করে সর্বপ্রথম ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াহ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতার মসনদ দখল করেন।

www.pathagar.com

ইমাম হোসাইন (রা) এই ইয়াজিদী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ৭২ জন সাথীর মধ্যে ১৮ জন ছাড়া বাকিরা আহলে বায়াতের সদস্য। তিনি যাচ্ছিলেন কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে। পথে চার হাজার সৈন্য ইয়াজিদের নির্দেশে ওরায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের নেতৃত্বে ইমামের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায় কারালার প্রান্তরে।

রাসূলের প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসেনকে তারা ইয়াজিদের খিলাফত মেনে নিয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করার আহ্বান করে।

ঐতিহাসিকদের সকলের মতে, ইয়াজিদ গান বাদ্য করে, রেশমি বস্ত্র পরিধান করে ও শরাব পান করে। হাজার হাজার সাহাবী যখন জীবিত ছিলেন, তখন এমন ব্যক্তির খিলাফত মেনে নিতে ইমাম হোসাইন (রা) অস্বীকার করেন। ইমামের বুঝতে বাকি ছিল না এই বিদ্রোহের কী ভয়াবহ পরিণতি হবে। তিনি আপসের পথে, জীবনে আরাম-আয়েশের সাথে বেঁচে থাকার সহজ পথে গেলেন না। তিনি নিশ্চিত মরণের পথ বাছাই করলেন। তিনি নিজে এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ ৭২ জন আহলে বায়াতের প্রায় সবাই একে একে শাহাদাত বরণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও ইমাম মরণের পথ বাছাই করেছেন কিন্তু সত্যিকারার্থে তিনি জীবনের পথে এগিয়ে গেলেন। কুরআন সে পথকে সত্যিকারার্থে জীবনের পথ বলেছে। ইমাম হোসাইন (রা) তাই গ্রহণ করে নিলেন আর রেখে গেলেন উম্মাহর জন্য চিরন্তন এক আদর্শ।

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"সাবধান আল্লাহর রাহে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছে তোমরা তাদেরকে মৃতের মধ্যে শামিল করো না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই জীবিত, তাঁদের জন্য জান্নাতের রিজিক অবধারিত রয়েছে।" সূরা আল ইমরান :

হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষী, ইয়াজিদের কেউ বেঁচে নেই, বেঁচে থাকতে পারে না। ইমাম হোসেন (রা)ও যদি বেঁচে থাকতেন তিনি মৃত্যুবরণ করতেন। তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে। ইয়াজিদের স্বৈরতন্ত্র, জুলুম ও অত্যাচার মাথা উঁচু করেছে সেখানেই ইমামের খুন লাখ গর্জন নিয়ে প্রতিবাদ করে চলছে। আর লাখ হৃদয়ে প্রজ্বলিত করে চলছে বিদ্রোহের অনল। হোসাইনের শাহাদাতের খুন ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে– সৃষ্টি করে চলছে হাজার কারবালার। কে আমাদেরকে আপসের পথে ও বাঁচার পথে পথ দেখায় তারাই আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে মরণের খবর।

নবীয়ে করিম (সা) ও সাহাবীদের জীবন সাক্ষী, যারা শাহাদাতের অমৃত পান করার জন্য ছিলেন পিপাসার্ত।

ইমাম মুসলিম সঙ্কলিত হজরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত–

ى نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّىْ أُغْزُوْا فِى سَبِيْلِ الله فَاقْتُلُ ثُمَّ اُغْزُوا فَاقْتُلْ ثُمَّ اُغْزُوا فَاقْتُل (مسلم)

"নবীয়ে কারিম (সা) বলেন, ঐ আল্লাহ্তায়ালার কসম খেয়ে বলছি যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন। আমার হৃদয়ের তাই আরজু, আমি আল্লাহর দ্বীনের জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবিত হই আবার যুদ্ধে জড়িয়ে যাই আবার শহীদ হই

www.pathagar.com

আবার জীবিত হই আবার লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করি। একইভাবে ইমাম বুখারী হাদিসটি নিয়েছেন শব্দের একটু পার্থক্যসহ। 'আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই আবার জীবিত হই'।

ثُمَّ اُحْيَ ثُمَّ اُقْتَلْ ثُمَّ اُحْيَ ثُمَّ اُقْتَلْ

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) চয়নকৃত বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হাদিস দু'টি গোটা মুসলিম উম্মাহর উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট যে, শাহাদাতের তামান্না কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যত দিন মুসলমানদের হৃদয়ে বেঁচে থাকার চাইতে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা তীব্র থাকবে তত দিন তারা বেঁচে থাকবে মাথা উঁচু করে। আর পরাজয়ের যুগে অসংখ্য মুসলমান হয়ে পড়বে সাগরের ভাসমান ফেনার মতো। হজরত চায়বান থেকে বর্ণিত ইমাম আবু দাউদ একটি দীর্ঘ হাদিসে বিষয়টি উল্লেখ করেন।

قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلَكِنَّهُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ – وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمْ المَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِى قُلُوْبِكُمْ الوَهْنُ – قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا الوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المَوْتِ (ابو داود)

নবী কারীম (সা) বলেন, অতিশীঘ্র আমার উম্মতের ওপর একটি কঠিন সময় আসবে, আমার উম্মতের ওপর শত্রুরা এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্যের ওপর যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! মুসলমানরা সংখ্যায় তখন কি এতই কমে যাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) জবাবে বললেন, না, তোমাদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি থাকবে। তোমাদের অবস্থা হবে অতল মহাসাগরের ওপর ভাসমান মূল্যহীন ফেনারাশির মতো। শত্রুদের হৃদয়ে তোমাদের বিষয়ে কোনো ভয় থাকবে না। আর তোমাদের হৃদয়ে 'ওয়াহান' পয়দা হবে। ওয়াহান কী? যা আমাদের ধ্বংসের কারণ? নবীজি বললেন, তা দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও মরণের ভয়। (আবু দাউদ)

হাদিসের প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ যা বিস্তারিত বলার সুযোগ নেই। মুসলমানরা রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত যখন বিজয়ের কেতন উড়িয়ে যাচ্ছিল, তখন পৃথিবীর জনসংখ্যার ১/৩ অংশ এর কম তারা ছিল। সেনাপতি তারেক যখন স্পেনে কলেমার পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন জিব্রালটারের পাহাড়ে যার সত্যিকার নাম 'জবলুত্ তারেক'। স্পেনের জনগোষ্ঠীর তুলনায় তার সৈন্যসংখ্যা ছিল হাতে গুনার মতো। সাগরের কাছে যেন গোষ্পদ মাত্র। প্রথমে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে 'কিশতি' করে আমরা এসেছি সে কিশতিগুলো জ্বালিয়ে দাও। সৈন্যগণ! জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়ার কথা ভুলে যাও। হয় স্পেনের আকাশে কলেমার পতাকা দুলবে নচেৎ এই সাগরে শহীদদের সলিল সমাধি হবে।

ইতিহাস ভালোভাবে জানে জীবনের ওপর মরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী এ ক্ষুদ্র তারেকের বাহিনী কী দুঃসাহসিক অভিযানে স্পেনের মাটিতে উড়িয়েছিল বিজয়ের কেতন। ইরানিদের সাথে মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয়েছিল কাদেসিয়ার ভয়াবহ

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে। সোয়া লাখ ইরানি সৈন্যের নেতৃত্বে ছিল দুনিয়া কাঁপানো বীর রুস্তম। আর ৩০ হাজার মুসলিম বাহিনী যার মধ্যে ৭০০ সাহাবী অন্তর্ভুক্ত সেনাপতি ছিলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)। যুদ্ধে রওনার প্রাক্কালে আমিরুল মোমেনিন হজরত উমর (রা) বলেছিলেন, "হে সাদ! তুমি রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী ও তাঁর আত্মীয়– এ চিন্তা যেন তোমাকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন না করে। বন্দেগি ছাড়া মানুষের সাথে আল্লাহর আর কোন সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদের সাথে যে আচরণ করতেন সৈন্যদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবে যুদ্ধের মুখোমুখিতে। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) রুস্তমকে লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমার সাথে যুদ্ধ করার দুঃসাহস দেখানোর আগে আমার যোদ্ধাদের পরিচয় জেনে নাও। 'তোমরা শরাব ও নারীর প্রতি যেমন আসক্ত, আমার সাথীরা শাহাদাতের মৃত্যুর প্রতি এর চেয়ে বেশি আসক্ত।' ইতিহাস সাক্ষী, ৩০ হাজার ইরানি সৈন্যের লাশের মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় পড়েছিল রুস্তম পাহ্লোয়ান। চার হাজার মুজাহিদের শাহাদাতের খুনের ওপর অগ্নিউপাসকদের বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের সমাধি রচিত হলো আর তাদের রাজধানীর শ্বেত প্রাসাদে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন সেনাপতি সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা)। কাদেসিয়ার বিজয়ের সংবাদ শুনে খলিফা উমর (রা) সিজদায় পড়ে ডুকরে কাঁদতে ছিলেন। প্রিয় পাঠক! মাগরিব থেকে মাশরিক পর্যন্ত আল্লাহর বিস্তীর্ণ জমিনে তারই বান্দাদের ওপর বান্দাদের জুলুমের শিকল মুক্ত করে শুধু এক মহান প্রভুর দাসত্বের দাওয়াত নিয়ে যারা ছুটে গিয়েছিল প্রতিটি প্রান্তরে সহায় সম্বলে অপ্রতুল আর সংখ্যায় নগণ্য সে দায়ীদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিল ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বিশাল বাহিনী, যারা ছিল যুগের সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত। ভাবতে অবাক লাগে জীবনের ওপর মরণে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যাদের রক্তের প্রতিটি কণিকায় শাহাদাতের আগুন প্রজ্বলিত। পার্থিব সুখ, আরাম, আয়েশ যাদের কাছে তাদের পায়ের বালুর চেয়েও কম মূল্য ছিল– সে আবু ওবায়দা (রা) ও সাদ (রা)-এর বাহিনীর সামনে এত বিশাল সৈন্য বাহিনী, এত বিপুল মারণাস্ত্র, অচিন্তনীয় কলাকৌশল ও উপায়-উপকরণ সবকিছু তছ্নছ্ হয়ে গিয়েছিল, উড়ে গিয়েছিল সব কর্পূরের মতো। ভোগবাদী আর বস্তুবাদীদের নিকট এ রহস্যের কারণ আজও অজানা কিন্তু গায়েবের ওপর বিশ্বাসীদের নিকট তা কখনও অজানা নয়– সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল আর শাহাদাতের নেশায় যারা উন্মাদ ছিল, তাদের মরণে অদম্য জজবার সামনে ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল দানবীয় শক্তির মারণাস্ত্রের বিশাল পাহাড়। সেই শাহাদাতের উজ্জীবনী শক্তি নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে মুসলিম যুবকদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুঃসহ মানবতার বস্তিতে, যারা চিৎকার করে বলছে–

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ

"হে প্রভু! আমাদেরকে জালেমদের অধ্যুষিতদের এ জনপদ থেকে বের করে দাও। তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও"। (সূরা নিছা : ৭৫)

www.pathagar.com

শত্রুরা আঁচ করতে শুরু করেছে মুসলিম যুবক-যুবতীদের কেন দমানো যায় না, কোন উন্মাদনায় ফাঁসির রশি সহাস্যবদনে গলায় পরে, কোন নেশায় হিমাঙ্কের নিচে ঠাণ্ডায় অসাড় হওয়ার পরও হামাস কর্মীরা আল্লাহু আকবারের আওয়াজ বুলন্দ করে। ১৯৬৩ সালের আশুরার যে মিছিল তেহরান ভার্সিটি থেকে শুরু হলো। দেশে কারফিউ চলছিল শাহের অত্যাচার, সেনাবাহিনী কামান তাক করে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। নির্বাসিত ইমাম খোমেনী ফ্রান্স থেকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, '১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল শুরু হবে তবে একটি গুলিও নয়, পাথরও ছোড়া যাবে না। সৈন্যদের গুলির বিনিময়ে পুষ্প নিক্ষেপ করবে, বুকের বসন খুলে চিৎকার করে বলবে আমাদেরকে শুধু শহীদ কর।' কী ভয়াল সে লাখ লাখ লোকের মিছিল, যার সামনে রয়েছে ২০-৩০ হাজার নারী। সে মিছিলে প্রায় ১৫ হাজার নর-নারী শাহাদাত বরণ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন কোরবানির নজির কোন জাতির জীবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না। লাশের স্তূপ আর শহীদের রক্তের স্রোত থামিয়ে দিয়েছিল কামানের গর্জন। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল জালেম শাহের বর্বর সেনাবাহিনী। তারাও বলতে বাধ্য হলো, 'না আমরা আমাদের মা, বোন, ভাইদের ওপর আর গুলি চালাতে পারব না।' হাতিয়ার হাতে তারাও একাকার হয়ে গিয়েছিল জনতার উত্তাল সাগরের বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালায়, শাহাদাতের রক্ত কি ভয়াল ও অপরাজেয় শক্তির নাম যার কাছে কামান, গোলা, দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রসহ সকল মারণাস্ত্র যেন Showcase-এ রাখা খেলনা। যত দিন মুসলমান যুবকদের কলিজায় শাহাদাতের বারুদ জমা থাকবে, ততদিন সকল পরাশক্তি তাদের নিকট পরাজিত থাকবে।

তাই শত্রুরা আমাদের যুবকদের কলিজা থেকে শাহাদাতের অনির্বাণ আগুন নিভিয়ে দিতে চায়। কারণ তা তাদের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, তা তাদের প্রভুত্ব বিস্তারের সকল আয়োজনকে করেছে রুদ্ধ। এ জন্য তারা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক কিনেছে যারা নসিহত করে শাহাদাতের বিষয়কে বিতর্কিত করেছে। জীবন উৎসর্গকারীদেরকে আত্মঘাতী খুনি আখ্যা দিচ্ছে।

অথচ রাসূল (সা) রোমান সম্রাট হেরাকেলের নিকট দাওয়াতে দ্বীনের চিঠিসহ হারেছ ইবনে উমাইয়াকে পাঠালেন। সে পত্র বাহককে অন্যায় কূটনৈতিক শিষ্টচারবহির্ভূতভাবে নির্দয় ও নিষ্ঠুরতার সাথে রাসূলের চিঠি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে পদদলিত করা হয়েছে। এ সংবাদে নবীজি (সা) বিচলিত হয়ে পড়েন এবং রোমানদের শায়েস্তা করার জন্য নিহত ব্যক্তির পুত্রের হাতে সেনাপতির ঝাণ্ডা তুলে দিয়ে বলেন, যায়েদ বিন হারেসা শহীদ হলে জাফর বিন আবু তালিব ঝাণ্ডা হাতে নেবে ও নেতৃত্ব দেবে আর জাফর বিন আবু তালেব শহীদ হয়ে গেলে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা সেনাপতির দায়িত্ব নেবে। সম্ভবত সেও শহীদ হয়ে যাবে এরপর তোমরা সেনাপতি নির্বাচিত করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। মাত্র তিন হাজার সৈন্যের এ বাহিনীকে এক লাখ রোমান সৈন্যের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। ১:৩৩ এর পার্থক্যের একটি জীবন-মরণ যুদ্ধে। ইমাম বুখারীর বর্ণনা মতে, রাসূলের (সা) কথামতো তিনজন সেনাপতি পরপর শাহাদাতবরণ করেন ও পরবর্তীতে খালেদের নেতৃত্বেও অসম যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হয়ে আসেন।

www.pathagar.com

এখানে ভাবার বিষয় এই যে, রাসূল (সা) যা বলতেন তা নিজের থেকে বলতেন না। রাসূলরা দ্বীনের বিষয়ে যা বলতেন তা আল্লাহর অহি বর্ণনা করেন মাত্র। নবীজী (সা) মরণের সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে মোতার যুদ্ধেও সেনাপতিদের লড়াইয়ে পাঠিয়ে ছিলেন যা যুদ্ধের ইতিহাসের এক বিরল ঘটনা। সত্যের মহা প্রয়োজনে নিজ জীবনের ওপর মরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে যারা জীবন উৎসর্গ করার যুদ্ধে ছুটে চলছেন পরিতৃপ্ত অন্তরে, অবশ্যই তারা মুসলমানদের জন্য রচনা করেছেন বিজয়ের মহাকাব্য। তাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করা এ জাতির জন্য অমার্জনীয় অপরাধ। আমাদেরকে শত্রুদের বিছানো ফাঁদে পা বাড়ানো উচিত হবে না। প্রবন্ধের কলেবর সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে শাহাদাত আমাদের প্রেরণার উৎস আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন। এ প্রসঙ্গে কথার ইতি টানছি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমে সারা ভারতে ইংরেজদের শাসন। শাহ ওয়ালীউল্যাহ (রঃ) এর জ্যেষ্ঠ সন্তান শাহ আবদুল আযিজ মুহাদ্দেসি দেহলভী তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেম। তিনি ঐতিহাসিক ঘোষণায় বলেছিলেন "ভারত দারুল হরব। এখানে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত নেই। ভারতকে দারুল ইসলামে রূপান্তর করার জিহাদে অংশগ্রহণ করার জিহাদে অংশগ্রহণ করা ভারতবর্ষের প্রতিটি নর-নারীর ওপর ফরযে আইন"। এ জিহাদ আন্দোলনের নেতৃত্বে ঝাণ্ডা দিয়েছিলেন উস্তাদ আবদুল আযিয (রঃ) তার সে শিষ্যের হাতে যার ছিল না কোন প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সনদ। আবদুল আযিয (রঃ) সান্নিধ্য তার মধ্যে জ্ঞান, চরিত্র ও প্রজ্ঞার এক অসাধারণ মিলন ঘটিয়েছিল। তাঁর চেহারার রওনক ও আখলাকের জাদু ও সাথীদের তাকওয়া দেখে ভারতে লাখের ওপর অমুসলিম তার কাছে বায়াত নেন। দুই হারামাইনের ইমাম ও ভারতের সকল ফিরকার সকল আলেম তার জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। তার মুজাহিদদের চারিত্রিক মান সম্পর্কে আল্লামা মওদূদী বলেন, "তার মুজাহিদদের দেখলে সাহাবীদের কথা মনে পড়ত। যাদের দিন কাটত জিহাদের মাঠে আর রাত কাটত সিজদায় অবনত হয়ে"। ১৮২৪ সালের দিকে তার নিজ শহর রায়বেরলী থেকে জিহাদের সূচনা হয়। অল্প সময়ে সারা ভারতে জিহাদের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ভারতের এমন কোন পরিবার ছিল না যেখান থেকে মুসলিম যুবকেরা এ জিহাদে অংশ নেয়নি। এমনকি নারীরা মুষ্টি চালের দানা দিয়ে জিহাদের রশদ সরবরাহ করে। গোটা ভারত ইংরেজ ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে পরিণত হয় বারুদাগারে। এক এক এলাকা মুক্ত করে তিনি ইসলামী শাসন কায়েমও করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম নামধারী শত্রুদের চরেরা ঢুকে পড়েছিল মুজাহিদ বাহিনীতে, ইংরেজ ও শিখদের আধুনিক মারণাস্ত্রের তুলনায় সাদামাটা অস্ত্র ও হাতিয়ারের স্বল্পতা ও প্রযুক্তির দৈন্যতায় ১৮৩১ সালে ৬ মে জুমাবার সকালে শিখদের সাথে এক কঠিন যুদ্ধে ভারতের এ সিংহপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী সাড়ে তিনশত বড় বড় আলেমে দ্বীনের সাথে বালাকোটের রক্তাক্ত প্রান্তরে শহীদ হন। শত্রুরা একজন শহীদের লাশ অক্ষত রাখেননি সকলকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। ইংজেদের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছে সাইয়েদ

www.pathagar.com

বেরলভীর অদম্য খুন। ভারতে আজাদী আন্দোলনে সাইয়েদ আহমদ বেরলভীর অনুসারীরা কি ত্যাগ স্বীকার করেছিল পরবর্তীতে উইলিয়াম হান্টারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "ভারতের এমন কোন বটবৃক্ষ ছিল না যার শাখায় ২৫/৩০ আলেমের লাশ ঝুলন্ত ছিল না"। আফসোস! আযাদী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সত্যিকার ইতিহাস আমাদের সন্তানেরা আদৌ জানবে কিনা বলা দুষ্কর। শহীদের রক্ত যুগের পর যুগ বেঁচে থাকবে ও কথা বলবে। বালাকোট Tragedy এর শতবর্ষ পরে ১৯৪১ সালে সাইয়েদ মওদূদী আবার ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের আলেমদের ডাক দেন। পরে জামায়াতে ইসলামীর সূচনায় বলেন "১৮৩১ ইং বালাকোটে ইসলামী আন্দোলনের সাথে ঝাণ্ডা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল আমি উহা আবার হাতে নিলাম"। মুজাহিদ আন্দোলনের সেই রেশ ধরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে দানা বাঁধে শরীয়ত উল্লাহর বাঁশের কিল্লার আন্দোলন এবং দুদুমিয়ার আন্দোলন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসরের মাটিতে শহীদ হাসান আল বান্নার নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল ইসলামী বিধান কায়েমের আন্দোলন। তার বিপ্লবী দাওয়াতের প্রভাবে গোটা মিসর কেঁপে উঠেছিল। মিসরের প্রধান বিচারপতি, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি আমলা ও সেনা সদস্যসহ লাখ লাখ মানুষ তার কাফেলায় সম্পৃক্ত হতে থাকে। একটি পর্যায়ে মিসরের জালিম সরকার বিশেষ করে কর্নেল নাসের সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অত্যাচার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এ আন্দোলন থামিয়ে দিতে। হাজার হাজার বিপ্লবীকে কারাগারে বন্দি করে। আর কারা প্রকোষ্ঠে চলতে থাকে অবিশ্বাস্য নির্যাতন বিবস্ত্র মানুষ ঝুলিয়ে রাখা, Electric shock দিয়ে মাথায় টগবগ করা পানি ঢালা, লোহার হাতুড়ি দিয়ে অমানবিকভাবে পেটানো, দুপুরের খরতপ্ত রোদে পোড়ানো, অখাদ্য ভক্ষণ করতে দেয়া, বিবস্ত্র করে সেলের মধ্যে শিকারিকুকুর লেলিয়ে দেয়া 'এইভাবে নির্যাতন করে করে প্রায় ৪০ হাজার 'ইখওয়ানুল মুসলেমিন' এর কর্মীকে শহীদ করা হয়। এদের মধ্যে হাজার হাজার নারীও ছিল। শহীদ করেছে বিপ্লবের নায়ক হাসানুল বান্নাকে। যাকে শহীদ করে দেশে কারফিউ দিতে হয়েছিল। জালেমরা শহীদ করেছিল ফি যিলালিল কুরআনের 'মুফাস্সির' বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিপ্লবের নায়ক সাইয়্যেদ কুতুবকে। শাহাদাতের দিন যখন শেষবারের মত তাকে আদালতে আনা হয়েছিল এ মুজাহিদ দু'পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়াতে পারছিলেন না। অত্যাচারে জর্জরিত এ মজলুম ফাঁসির রজ্জু গলায় পরার মুহূর্তে হেঁসে উঠেছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন "যে মৃত্যুর জন্য আমি বছরের পর বছর কারা কক্ষে সীমাহীন যাতনা ভোগ করেছি। আমি সে ব্যক্তি যে তার জীবনের সফলতা চোখে দেখে যাচ্ছি। আমি মউতের দিকে নয় হায়াতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি"। ইখওয়ানের প্রথম সারির নেতা মিসরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি আবদুল কাদের আওদাকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। দুটি ক্রেনের একটিতে এক পা করে বেঁধে বিপরীত দিকে ক্রেন চালিয়ে দেয়া হয়েছিল। নিষ্ঠুরতার কী লৌমহর্ষক ঘটনা। তিনি শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে বলেছিলেন, 'আমাদের রক্ত কথা বলবে। এ রক্ত বৃথা যাবে না'। প্রিয় পাঠক সারা প্রবন্ধে একথাই বলতে

www.pathagar.com

চেয়েছি যা শহীদ আবদুল কাদের আওদা (রঃ) বলেছিলেন 'রক্ত বৃথা যায় না, যেতে পারে না' রক্ত শুধু রক্তের কণিকায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এখনও পর্যন্ত মিসর 'ইখওয়ানকে' নিষিদ্ধ হওয়ার মিথ্যা অজুহাত থেকে রেহাই দেয়নি। কিন্তু গোটা আরব বিশ্ব শহীদ বান্নাহ, শহীদ কুতুব, শহীদ আবদুল কাদের আওদা, শহীদ শেখ আহমদ ইয়াছিন এর লাল খুনের এক উত্তপ্ত কড়াই। গোটা আরব দরিয়ার পানি এ ভয়াবহ আগুন নেভাতে পারবে না। তরুণ প্রজন্মরা সে রক্তের আগুন বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাবে মারণাস্ত্রের পাহাড় পদদলিত করে।

শাহাদাতের মর্যাদা

এবার আমি আলোকপাত করতে চাই শাহাদাতের মর্যাদার ওপর। এটি একটি বিশাল আলোচনার শিরোনাম। আমি শুধু ঈমান ও বৈশিষ্ট্যের আলোকপাত করব।

১. শাহাদাত আল্লাহর একটি অনুগ্রহ, একটি তোহ্ফা যিনি ইচ্ছা তাকে তা দেন। শাহাদাতের তামান্না একটি কল্যাণের বিষয় কিন্তু শাহাদাত নসিব হওয়া একটি দুর্লভ বিষয়। কুরআন বলছে,

وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

"সময়কে আল্লাহতায়ালা পরিবর্তন করেন যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন সুসময় ও দুঃসময়ে ঈমানের আস্থা কেমন। আর তোমাদের মধ্যে থেকে কিছু বান্দাহকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।" (সূরা আল ইমরান : ১৪০)

২. শহীদরা চিরঞ্জীব : সকলের জন্য মৃত্যু রয়েছে এমনকি নবীদের জন্যও মৃত্যুবরণ শব্দ কুরআনে ব্যবহার করেছেন–

أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ "যদি তারা মৃত্যুবরণ করেন বা শহীদ হন"। কিন্তু শহীদদের জন্য মৃত শব্দ বলা কুরআনে হারাম করে দিয়েছে, তা শুধু শহীদদের জন্য। (সূরা আল ইমরান : ১৪৪)

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"সাবধান, আল্লাহর রাহে যারা জীবন দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং সত্যিকার অর্থে তারাই জীবন্ত, আর প্রভুর নিকট রয়েছে তাদের জন্য রিজিক।" (সূরা আল ইমরান : ১৭০)

৩. শহীদদের খুন পবিত্র : আল্লাহতায়ালার নিকট দুই ফোঁটা বেশি মর্যাদাবান।

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ قَطْرَةُ دُمُوْعٍ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَقَطْرَةُ دَمٍ يُهْرَقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ (ترمزى)

হজরত আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা) বলেন, 'দু'টি ফোঁটা আল্লাহতায়ালার নিকট সবকিছুর চেয়ে প্রিয়। এক. আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ক্রন্দনশীল

www.pathagar.com

বান্দার এক ফোঁটা চোখের পানি, দুই. শহীদদের রক্তের প্রথম ফোঁটা খুন।' (তিরমিজি)

৪. শহীদদের গুনাহ্ থাকবে না : শহীদদের রক্ত তাদের জীবনের সব গুনাহ ধৌত করে দেয়। আল্লাহতায়ালা ঋণ ছাড়া আর কোন গুণাহর ওপর প্রশ্ন করবেন না।

قَالَ قَالَ صـ يَغْفِرُ لِلشَّهِيْدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْن

"শহীদদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় কিন্তু অন্যের হক ছাড়া।"

عَنْ المِقْداد قَالَ قَالَ صـ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِى أَوَّل دَفْعَة (ترمزى)

মিকদাদ থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলেন, আল্লাহর নিকট শহীদদের রয়েছে ছয়টি মর্যাদা। এর প্রথমটি হলো– শহীদদের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তিরমিযি)

৫. শহীদেরা বেহেশতে নিজেদের রোমাঞ্চকর স্থান চোখে না দেখে মরবে না। এটা একটি উঁচু মর্যাদা যে, জান্নাত না দেখে তারা পৃথিবী থেকে আসবে না। কিয়ামতের পূর্বে ইন্তেকালের সময় জান্নাত শুধু তারাই দেখবে এবং সে জন্য শাহাদাতের মৃত্যুর কষ্ট অনুভব হবে না।

وَيَرَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ

৬. তাদের ওপর কোন আজাব হবে না :

শহীদের দেহ মাটির জন্য হারাম। শত শত বছর মাটিতে থাকলেও শহীদদের লাশ অক্ষত ও জীবিত থাকবে। এর হাজার ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ القُبُوْر

৭. কিয়ামতের কঠিন বিপদ তাদেরকে স্পর্শ করবে না : কিয়ামতের ভয়াবহতা এতই কঠিন হবে যে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ পর্যন্ত বলতে থাকবেন নফসি নফসি। প্রচণ্ড সূর্যের দাবদাহে মগজগুলো টগবগ করতে থাকবে। গোটা কিয়ামতের মাঠে এর আওয়াজ উঠবে, কামড়াতে থাকবে নিজেদের হাত, এমন অবস্থায়ও শহীদরা আল্লাহর মেহমান হয়ে নিরাপদে থাকবেন।

وَيَامِنُ الفَزَعِ الأَكْبَرُ وَيُوْضَعُ عَلَى رَاسِهِ تَاجُ الوَقَارِ اليَاقُوْتِهِ فِيْهَا

"তারা থাকবে নিরাপদ ও আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে। তাদের মাথার ওপর সম্মানের তাজ থাকবে, সমগ্র পৃথিবী এর মূল্য বহন করতে পারবে না। তারা থাকবে বরের বেশে, হুরদের সাথে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠান সবাইকে চমকে দেবে-

قَالَ رَسُوْلُ الله صـ وَيُزَوَّجُ إِثْنَتَيْن وَسَبعِيْنَ زَوْجَةٌ مِنَ الحُوْرِ العِيْن

রাসূল (সা) বলেন, ৭০ জন সুনয়না হুরের সাথে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৮. শহীদরা সুপারিশকারী হবে : প্রত্যেক মানব সেদিন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হবে কিয়ামতের মাঠে। সেদিন শহীদদের আল্লাহতায়ালা শুধু ক্ষমা করে দেবেন তাই নয়, বরং তাদেরকে আত্মীয় গুনাহগারদের জন্য শাফায়াতের অনুমতি দিয়ে ধন্য করবেন।

www.pathagar.com

وَيُشَفَّعُ فِى سَبِعِيْنَ مِنْ أَقْرِبَائِه

শহীদগণ তাদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে ৭০ জন জাহান্নামবাসীকে সুপারিশ করে জান্নাতে দাখিলের অনুমতি পাবেন। (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)

উপরের কুরআন ও হাদিসের আলোকে শহীদদের সে মর্যাদা আলোচিত হয়েছে, নবীগণ ছাড়া আর কারও জন্য এত মর্যাদার উল্লেখ নেই।

শাহাদাতের তামান্না

নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু শাহাদাতের মর্যাদা লাভের দরওয়াজা আজও উন্মুক্ত রয়েছে। শাহাদাত লাভ করা আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্তের বিষয় কিন্তু শাহাদাতের আরজু হৃদয়ে পোষণ করা ইবাদাতের মধ্যে শামিল। ভালো কাজ করা একটি ইবাদাত। যে ক্বালবের মধ্যে ঈমান আছে জীবন্ত অবস্থায় সে হৃদয়ে থাকবে শাহাদাতের আরজু। মুনাফিকদের হৃদয়ে আল্লাহতায়ালার রাহে জীবন দেয়ার ও কুরবানির আবেগ কখনও আসবে না। ইমাম গাজ্জালী (রহ) বলেন, 'যে হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না সে হৃদয়ে নিফাক রয়েছে।' নবীজি (সা) শাহাদাতের সাথে একই মর্যাদাসম্পন্ন বলেছেন,

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صـ مَنْ سَأَلَ الله تَعَلى الشَّهَادَةُ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاء وإِنْ مَاتَ عَلى فِرَاشِهِ (مسلم ترمزى)

"মুহাম্মদ (সা) বলেন যে সত্যিকারভাবে ও খালেসভাবে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহতায়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন যদিও বিছানায় তার মৃত্যু হয়"। (মুসলিম)

ইমাম বুখারী হাদিস নিয়েছেন-

عَنْ أَبِى هُرْرَةَ رَضـ أَنَّ رَسُوْلُ الله قَالَ وَالذِّى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوَدَدْتُ أَنِّى لاَ أُقَاتِلُ فِى سَبِيْلِ الله فَاقْتَلُ ثُمَّ أُحيِىَ ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحِيِىَ ثُمَّ أُقْتَلُ (بخار

"আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারিম (সা) বলেন, 'আল্লাহতায়ালার কসম! যার হাতে আমার জীবন, আমার হৃদয় শুধু চায় আমি তাঁর রাহে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যাই আবার জীবিত হই আবার যুদ্ধে লিপ্ত হই, আবার শহীদ হই আবার জীবিত হই, যুদ্ধ করি ও শহীদ হই"। (বুখারী)

এ হাদিস স্পষ্টভাবে রাসূল (সা)-এর হৃদয়ে শাহাদাতের তামান্না কিভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ব্যক্ত হয়েছে। ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে আজ উম্মতের সাধারণ মানুষ নয়, জ্ঞানীদের হৃদয় থেকেও শাহাদাতের জজবা কিভাবে বিদায় নিলো! দুনিয়ার মায়া আর মরণের ভয় উম্মতের সব কিছুকে যেন কেড়ে নিল। হজরত উমর (রা) দুয়ার হাত তুলে বলতেন, হে প্রভু! আমাকে তোমার পথে শাহাদাত দাও আর রাসূলের (সা) মদিনাকে আমাদের শাহাদাতের ময়দান বানাও"।

www.pathagar.com

আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে নজর দিলে আতঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই। পৃথিবীব্যাপী চলছে মারণাস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির ভয়াবহ প্রতিযোগিতা। পরাশক্তির আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলো লাখ লাখ বছরে নির্মিত বিশ্বের বর্ণিল স্থাপত্য মানুষের কল-কোলাহল এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য একটি বোতামের ওপর অঙ্গুলির ভয়াবহ স্পর্শের অপেক্ষা করছে। এক দিকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অর্থ অস্ত্র বিনির্মাণে ব্যয় হচ্ছে আর কোটি মানুষের দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত, কোটি কোটি মানবশিশু পুষ্টিহীনতায় বিকলাঙ্গ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। অসংখ্য বনি আদম বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারবঞ্চিত হয়ে শূন্য ডিগ্রির নিচে হিমেল ঠাণ্ডায় মহাকাশের নীল চাদোয়ার নিচে খড় বিচালিতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আধুনিক সভ্যতার কুশপুত্তলিকা দাহ করছে। মানবতার আগামী প্রজন্ম প্রতিটি দেশে আজও ভয়াল সর্বনাশা নেশায় আক্রান্ত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বলেছিলেন, 'নেশা ও মাদকতার জন্য আজ বিশ্ব সভ্যতা শত শত টন পরমাণুর চেয়ে ভয়ঙ্কর'। এর ওপর রয়েছে বীভৎস যৌনাচার। যাকে আকাশসংস্কৃতির মাধ্যমে বিশ্বের প্রতিটি জনপদে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। মানবসভ্যতার সব কিছু জীবনের সুখ, শান্তি ও শেষকণা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ললিতকলা, সমাজ, পরিবার– এক কথায় সর্বস্ব যেন যৌনাচারের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সময়ের প্রতিটি মুহূর্তে মানববিপর্যয় সংঘটিত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীকে যদি একটি পাল্লায় উঠানো হয় আর নিক্তির অপর পাল্লায় উঠানো হয় একটি নিষ্পাপ মানবশিশুকে তবে সকলেই বলবে একটি মানবসন্তান পৃথিবীর চেয়ে বেশি ভারী ও দামি হবে। রাসূল (সা) বলেন, 'একটি মানব খুন করা সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস করার চেয়েও ভয়াবহ"। এমন কোন সময় যাচ্ছে না পৃথিবীর মাটি মানুষের রক্তে সিক্ত হচ্ছে না। শুধু ইরাকের ধ্বংসস্তূপে ১০ লাখ মানবশিশু নিহত হয়েছে। শক্তির দাপট, অস্ত্রের অহঙ্কার, হত্যার নেশায় যারা অন্য জাতির স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে জনগণকে তাদের গোলাম বানায়, হাজার বছরের সভ্যতা বিরান করে দেয়। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বিচারালয়ও সভ্যতার দাবিদার। মানবগোষ্ঠীও চুপ থাকবে। এভাবে কি মুসলিম মজলুমদের দুঃসহ জীবন কাটবে যুগের পর যুগ? না অসম্ভব, আমরা মুসলিম যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। আমরা পৃথিবীর চলমান দৃশ্যপট বদলে দিতে চাই। আমরা জুলুমের দীর্ঘ রাতের বুক চিড়ে আনতে চাই ইনসাফের সুবহে সাদিক, আমরা মানুষের মনগড়া আইনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আল্লাহতায়ালার অবতীর্ণ আখেরি বিধান। আমরা ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জুলুম-অবিচার, খুন-রক্ত, তামাক-নেশামুক্ত পৃথিবী সৃষ্টিতে অবদান রাখতে চাই। একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য একটি দীর্ঘ ও কণ্টকময় পথ অতিক্রম করতে হবে, একটি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হাঙ্গরপূর্ণ লোনা দরিয়া সাঁতরাতে হবে– ছায়াহীন, কূলহীন এক বিস্তীর্ণ তপ্তমরু পার হতে হবে। আর যারা এ পথেই চলতে চায় তাদের প্রতি পরামর্শ থাকবে–

www.pathagar.com

- কঠিন শপথ নাও আর পথ চলা শুরু কর, হয় পথের আখেরি মনজিলে পৌঁছবে নতুবা মরণের সাথে এ পথে দেখা হবে। সিদ্ধান্তহীন ও কাপুরুষদের জন্য এ পথে চলা অসম্ভব বিষয়।
- আধুনিক ও প্রযুক্তির জ্ঞান আর অহির ইলমে সমৃদ্ধ হতে হবে।
- চরিত্র থেকে পাপাচারের চিহ্ন তুলে ফেলতে হবে। বন্দেগি ছাড়া আল্লাহর সাথে বান্দাহর আর কোন সম্পর্ক নেই। শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে জুলুম থেকে বাঁচাতে হবে। মনে রাখতে হবে সীমালঙ্ঘনকারীর সাথে আল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।
- প্রতিযোগিতার বিশ্বে যোগ্যতাই বেঁচে থাকবে। জেনে নাও পৃথিবী যোগ্যতার কাছে বশীভূত। অযোগ্যদেরকে আল্লাহতায়ালা বিশ্ববাগানের দায়িত্ব দেবেন না। সততার সাথে যোগ্যতার মিলন ঘটাতে হবে।
- পৃথিবীকে যারা বদলিয়ে দিতে চায় তাদেরকে একসাগর রক্ত দিতে হবে। এ পথ কুরবানিরই পথ, এ পথ শাহাদাতের পথ। জমাট রক্ত থেকে আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেন। জাতির যুবকদেরকে শুধু রক্ত দিলে চলবে না বরং খুনের জমাট বেঁধে দিতে হবে। ভালো করে জেনে নাও পৃথিবী আবার খুনের পিপাসায় পিপাসার্ত। রক্তের জন্য পৃথিবী হাহাকার করছে। রক্তই বিপ্লব, রক্তই সমাধান। প্রিয় কবি মাহেরুল কাদেরীর দুটি কবিতার পঙক্তি দিয়ে লেখার ইতি টানতে চাই

" আমীরের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই সুলতানের,

পৃথিবীর প্রয়োজন তপ্ত খুনের।"

হে প্রভু! শাহাদাতের রোমাঞ্চকর মরণ আমাকে দাও যে মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে জীবনের খবর।

www.pathagar.com

শহীদেরা সত্যের সাক্ষ্য হয়ে থাকবে
সত্যের পথে চিরদিন তোমাকে আমাকে ডাকবে

শিবিরের শহীদদের
শাহাদাতের সংক্ষিপ্তসার

১৯৬৯ সালের ১৩ আগস্ট প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরাছাত্র আবদুল মালেক ইসলামবিদ্বেষী শক্তির হাতে টিএসসিতে আক্রান্ত হয়ে ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণ করার পর সমগ্র দেশ যখন শোক-দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত– তখন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি ফররুখ আহমদ উক্ত ভাষাতেই সেই শাহাদাতকে মোবারকবাদ জানিয়েছিলেন। শহীদ আবদুল মালেকের শাহাদাতের খবর যখন বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীকে জানানো হয় তখন তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'আবদুল মালেক এ দেশে ইসলামের পথে প্রথম শহীদ হতে পারে, কিন্তু শেষ নয়।' হয়েছেও তাই।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত বাংলাদেশ। মানুষ ভেবেছে আর পরাধীনতা নয়, আর পরাজয় নয়, নয় আর ভাঙ্গনের সুর; এবার গড়ার পালা, বিজয়ের অন্তহীন পথচলা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। তাইতো দেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলো কী করে হাজার কোটি টাকার অস্ত্র, খাদ্য, ধনসম্পদ ট্রাক বোঝাই হয়ে পাশের দেশ ভারতে চলে যাচ্ছে। কী করে আমাদের স্বাধীনতা জিম্মি হয়ে পড়ছে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতাকারী একটি কাপালিক শক্তির কাছে। কী করে দেশের যুব ও তরুণ সমাজ জড়িয়ে পড়ছে অপরাধ জগতের সাথে আর কী করে জন্ম নিচ্ছে নেশাগ্রস্ত, অস্ত্রসজ্জিত, হাইজ্যাক, রঙবাজি ও মাস্তানিতে ব্যাপৃত হতাশ যুবকদের এক অবক্ষয়ী প্রজন্ম। পিতার চোখে নেই ঘুম, মায়ের মুখের হাসি গেছে হারিয়ে, ফুরিয়ে গেছে বোনের বুকে লালিত আশা। কী হবে এই নতুন প্রজন্মের? কে এদের উদ্ধার করবে নিরাশার এই ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে?

www.pathagar.com

এই প্রেক্ষাপটেই ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বসে একদল চিন্তাশীল তরুণ গড়ে তোলেন বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের মুক্তিকামী কাফেলা 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির'। সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব পৃথিবীর এক চিরস্থায়ী বিধান। মিথ্যা কখনো সইতে পারে না সত্যকে; অসুন্দর কখনো মেনে নিতে পারে না সুন্দরকে। ছাত্রশিবিরের এই আলোকযাত্রাকেও তাই মেনে নিতে পারেনি বাংলাদেশের মিথ্যার ধ্বজাধারী সম্প্রদায়। তাইতো ১৯৭৭ সালে ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠিত হলে যথারীতি শুরু হলো সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সুন্দর-অসুন্দরের সংঘাত। আঘাত আর আক্রমণ আসতে লাগলো শিবিরকর্মীদের ওপর।

মুক্তিকামী ছাত্র-জনতার যে কাফেলাটি এলো পথহারা যুব-তরুণকে পথের দিশা দিতে, সেই কাফেলাটির বিরুদ্ধে একযোগে শুরু হলো অপপ্রচার, হুমকি, হামলা-মামলা, হত্যা ও সন্ত্রাসী বাধা প্রদান। শিবিরকর্মীরা হারাতে লাগলেন হাত, পা, চোখসহ শরীরের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শিবিরের কাফেলায় বাড়তে লাগল রগকাটা আহত তরুণের সংখ্যা। ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুন্দর চত্বর আর রাজপথ রঞ্জিত হলো ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের পবিত্র রক্তে। হযরত হামযার (রা) নেতৃত্বাধীন শহীদের কাফেলায় ১৯৮২ সালের ১১ মার্চ যুক্ত হলেন ছাত্রশিবিরের ৩ জন ভাই। সেই যে শুরু। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

১৯৮২ সালের ওই দিন এক সুন্দর সকালে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মতিহার চত্বরে শিবিরকর্মীদের ওপর পরিচালিত হলো এক নিষ্ঠুর আক্রমণ। সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে ও কোনো কারণ ছাড়াই অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হলো শিবিরের তিনজন কর্মীকে, আহত হলেন অনেকেই, যার একজন শহীদ হলেন কয়েকদিন পর ২৮ ডিসেম্বর।

সেদিনের বাতিল শক্তির সেই নৃশংসতা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। ইটের ওপর রেখে আরেকটি ইট দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয় শহীদ আইয়ুব আলীর মাথাটি। আজও কেউ জানে না আইয়ুব আলীর অপরাধ কী ছিল। কেনই বা তাকে এভাবে লাশ হয়ে ফিরে যেতে হলো কুষ্টিয়ার গ্রামে তার ক্রন্দনরত মায়ের কাছে!

শহীদ আবদুল মালেকের পথ বেয়ে চলে গেলেন সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব ও জব্বার। তারপরও কাফেলা থেমে থাকেনি, চলেছে দুর্নিবার। আর এ পথে চলতে গিয়ে শহীদদের তালিকা হয়েছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর, রক্তের স্রোতের ধারা হয়েছে আরও বলিষ্ঠ। দেখতে দেখতে শহীদের তালিকায় যুক্ত হলো ১৩৬ জন তরুণের হাসিমাখা মুখ। রচিত হলো এক অনুপম শহীদি মিছিল।

চট্টগ্রামের খুরশিদ আলম; চাঁপাইনবাবগঞ্জের আব্দুল মতিন, রাশিদুল হক, শীষ মুহাম্মদ, সেলিম, শাহাবুদ্দিন; চট্টগ্রামের মোস্তফা আল মোস্তাফিজ ১৯৮৫ সালে এই শহীদের

www.pathagar.com

তালিকায় যুক্ত হলেন। কুরআনের সম্মান রক্ষার জন্য সেদিন যে শহীদেরা প্রাণ দিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন স্কুলের ছোট ছোট সোনামণিরা যাদের জীবনের কোথাও পাপ এসে ক্লেদাক্ত করতে পারেনি।

'৮৬-র শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর, মাহফুজুল হক চৌধুরী, জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকীউল্লাহ রেখে গেছেন শাহাদাতের অত্যুজ্জ্বল নমুনা।

হাফেজ আব্দুর রহিম, স্কুলছাত্র আমীর হোসাইন, কারমাইকেল কলেজের ছাত্রনেতা আব্দুল আজিজ সেই কাফেলায় যোগ দিলেন পরের বছর। ১৯৮৮ সালে গৌরবগাথা রচনা করলেন শহীদ আইনুল হক, নাসিম উদ্দিন চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, আব্দুস সালাম আজাদ, আসলাম হোসাইন, আসগর আলী ও আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম। তারেকুল আলম, জসীম উদ্দিন মাহমুদ, শফিকুল ইসলাম, আফাজ উদ্দিন চৌধুরী, শিহাব উদ্দিন, জহির উদ্দিন মোহাম্মদ লিটন, খোরশেদ আলম, হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, আলী হোসেন, আব্দুল খালেক, মীর আনসার উল্লাহর মতো তরুণেরা মায়ের বুক খালি করে শহীদি মিছিলে যোগ দেন ১৯৮৯ সালে। স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়ে ১৯৯০-এর রক্তঝরা দিনগুলোতে দীনের জন্য বক্ষ পেতে দিয়ে চলে গেলেন শহীদ মোজাহের আলী ও শহীদ খলিলুর রহমান।

'৯১-তে এসে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন প্রিয় সাথী শেখ ফিরোজ মাহমুদ ও এ কে এম গোলাম ফারুক। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক জঘন্যতম অধ্যায় সূচনা হয় ১৯৯২ সালের ১৬ জানুয়ারি। দেশের সংবিধান, মানবীয় মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি চরম ধৃষ্টতা দেখিয়ে পরজীবী এক সন্ত্রাসীচক্র জন্ম দেয় তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আর তাদের দোসরদের হাতে একে একে ঝরে পড়েন শহীদ মুনসুর আলী, সাইজুদ্দীন ও আতিকুল ইসলাম দুলাল। আমাদের ছেড়ে চলে যান শহীদ আমিনুল ইসলাম বিমান, ইকবাল হোসেন, নজরুল করিম, আজিবর রহমান, সাইফুল ইসলাম ও সাইফুল ইসলাম মামুন।

১৯৯৩ সালে শহীদি মিছিলে যোগ হয় শিবিরের সর্বাধিক সংখ্যক নেতাকর্মীর নাম। এসএসসি'র ছাত্র কুতুব উদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সন্তান কাজী মোশাররফ হোসাইন ও মুহাম্মদ ইয়াহিয়ার সাথে যোগ দেন যশোরের মুস্তাফিজুর রহমান ও রবিউল ইসলাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিরোধীদের নির্মমতার শিকার হন তাঁরা। রংপুরের সাইফুল ইসলাম, নবম শ্রেণীর এতিম ছাত্র শেখ আমানুল্লাহ, চট্টগ্রামের ডা. মিজানুর রহমান মিজান ও বোরহান উদ্দিন, শামসুজ্জামান খান রেজা, কামরুজ্জামান আলম আর শেখ মোজাম্মেল হক মঞ্জুও যোগ দেন শহীদের সারিতে। ২০ সেপ্টেম্বর কলেজের মসজিদ চত্বরে কুপিয়ে ও পরে

www.pathagar.com

জবাই করে শহীদ করা হয় খুলনা বিএল কলেজের নির্বাচিত জিএস ছাত্রনেতা মুন্সি আবদুল হালিমকে। এই ঘটনার জের ধরে শাহাদাতবরণ করেন উক্ত কলেজের ছাত্র-সংসদের নবনির্বাচিত সাহিত্য সম্পাদক শেখ রহমত আলী।

১৯৯৪ সালে কাফেলার সারি থেকে শহীদি মিছিলে নাম লেখালেন শহীদ নূরুল আলম, মুহাম্মদ ইউসুফ, এস.এম কাওছার, জাফর আলম, কামরুল ইসলাম ও খুলনা বিএল কলেজের ভারপ্রাপ্ত জিএস আবুল কাশেম পাঠান। পরের বছর যে ১২ জন ভাই শিবিরের শহীদি কাফেলায় যোগ দিলেন তারা হলেন– চুয়াডাঙ্গার শহীদ মুস্তাফিজুর রহমান, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কক্সবাজারের খাইরুল ইসলাম, ফেনীর একরামুল হক, লালমনিরহাটের মঈনুল ইসলাম, চট্টগ্রামের আনোয়ার হোসাইন, যশোরের আখতারুল কবির, কামিলের ছাত্র লক্ষ্মীপুরের ফজলে এলাহী, সিলেটের আব্দুল করিম, ফেনীর আলাউদ্দিন, বরিশালের শওকত হোসেন তালুকদার ও মোমেনশাহীর মঞ্জুরুল কবির। শহীদ শাহ আলম, হাসান জহির ওলিয়ার, আব্দুল খালেক হামিদ, মুহাম্মদ ওয়াহিদ, এইচএসসি'র ছাত্র গোলাম জাকারিয়া ও শাহজাহান, জয়নাল আবেদীন আজাদ এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ব্রাশফায়ারে লাশ হয়ে যাওয়া আমিনুর রহমান ১৯৯৬ সালে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

১৯৯৭ সালে শহীদ হন ৩ জন ও '৯৮ সালে ৫ ভাই। ১৯৯৯ সালে শহীদ হন সিলেটের এনামুল হক দুদু, টাঙ্গাইলের যোবায়ের হোসাইন ও হাটহাজারীর মহিবুল করিম সিদ্দিকী। একই বছর ১৭ আগস্ট ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা হাতুড়ি দিয়ে নির্দয়ভাবে আঘাতে শহীদ করে দশম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী আহমদ যায়েদকে। লক্ষ্মীপুরের কামাল হোসাইন ও মাহমুদুল হাসান, চট্টগ্রামের আনসার উল্লাহ্ তালুকদার ও রহিম উদ্দিন, সাতক্ষীরার আলী মোস্তফা এবং সিলেটের আব্দুল মুনিম বেলাল বছরের শেষের দিকে যোগ দেন শহীদের কাফেলায়। চট্টগ্রামের শহীদ সালাহ্ উদ্দিন, খাইরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম সবুজ ২০০০ সালে রক্ত দিয়ে শহীদি খাতায় নাম লেখান।

শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের স্বাভাবিক ঘটনা। এই আন্দোলনের গতিকে বেগবান করতে শাহাদাতের নজরানা পেশ করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই শাহাদাতের ধারা সে কারণে অব্যাহত থেকেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০১ সালে শহীদ হন চাঁপাইনবাবগঞ্জের এইচএসসি ফলপ্রার্থী আব্দুস শাকুর, রাজশাহীর জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরার রফিকুল ইসলাম, কুমিল্লার নবম শ্রেণীর ছাত্র ইব্রাহীম চৌধুরী মঞ্জুর ও নোয়াখালীর এইচএসসি ফলপ্রার্থী নিজাম উদ্দিন। স্কুলের শিক্ষকদের সাথে খারাপ আচরণ ও ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় মৌলভীবাজারের দশম শ্রেণীর ছাত্র বেলাল হোসেন এবং পাবনার আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক শাহাদাত বরণ

www.pathagar.com

করেন ২০০২ সালে। ২০০৩ সালে মেধা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তির পক্ষে মত প্রকাশ করায় কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শফিকুর রহমান শিমুল এবং কলেজ মসজিদে নামাজরত অবস্থায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে মৌলভীবাজারের আলমাছ মিয়া শহীদ হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে অতর্কিত হামলা করে হাতুড়ি ও রড দিয়ে মাথা থেঁতলে দিলে দীর্ঘ তিন মাস ঢাকায় হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে ২০০৪ সালের ২৪ এপ্রিল শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন বগুড়ার সাইফুদ্দিন।

বাতিল শক্তির নির্মমতার আরেক শিকার এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিবিরকর্মী শহীদ রেজবুল হক সরকার প্লাবন। গাইবান্ধার পলাশবাড়ীর সন্তান রেজবুল হক প্লাবন তার চমৎকার রেজাল্ট শুনে যেতে পারেননি। তার আগেই উপর্যুপরি অস্ত্রের আঘাতে পুরো মাথা ও শরীর থেঁতলে শহীদ করে দেয়া হয় তাঁকে। তারিখটা হচ্ছে ২০০৫ সালের ১৫ জুন। একই বছর শহীদ হন মোমেনশাহীর রায়হান খন্দকার ও সিলেটের শোয়েব আহমদ দুলাল।

বাংলাদেশের ইতিহাসে পৈশাচিকতার চরম নজির স্থাপিত হয় ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর। সারা বিশ্ব সেদিন হতবাক হয়ে গিয়েছিল মানবতার বিরুদ্ধে নির্মম পাশবিকতার করুণ দৃশ্য অবলোকন করে। রাজধানী ঢাকার পল্টনের রাস্তায় সাপ মারার মতো পিটিয়ে মানুষ হত্যা করে লাশের উপর নৃত্য কেবল নরপশুদের পক্ষেই শোভা পায়। চারদলীয় জোট সরকারের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত অনুষ্ঠানে নেতাসর্বস্ব ১৪ দলের মানবরূপী হায়েনাদের লগি-বৈঠা ও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয়াবহ আক্রমণে শিবিরের ২ জন নেতা শাহাদাত বরণ করেন। তারা হলেন– শহীদ মুজাহিদুল ইসলাম ও হাফেজ গোলাম কিবরিয়া শিপন। একই ঘটনার জের ধরে হায়েনাদের শিকারে পরিণত হন কুড়িগ্রামের রফিকুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জের আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল, কুমিল্লার মুহাম্মদ শাহজাহান ও পল্টনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ঢাকার সবুজবাগের সাইফুল্লাহ মুহাম্মদ মাসুম। বছরের মাঝামাঝি সময়ে অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করায় ১৭ জুন শহীদ হন সীতাকুন্ডের শাফায়েত উল্লাহ ভূঁইয়া।

মাঝের দুই বছর অর্থাৎ ২০০৭ ও ২০০৮ সাল শাহাদাতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও ২০০৯ সালে নীল নকশার নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী সমর্থিত মহাজোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নির্মমতার শিকার হলেন দুইজন ভাই। ৯ মার্চ অপহরণের পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে অমানুষিক অত্যাচারের পর ট্রেনের নিচে ফেলে দিয়ে শরীর থেকে পা দু'টো বিচ্ছিন্ন করে শহীদ করা হয় জামালপুরের মেধাবী ছাত্র হাফেজ রমজান আলীকে। ১১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শহীদ দিবসের র‍্যালিতে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। ১৩ মার্চ বহিরাগত সন্ত্রাসী ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় উন্মত্ত ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শিবির সেক্রেটারি

www.pathagar.com

শরীফুজ্জামান নোমানীকে রামদার আঘাতে মাথা দ্বিখণ্ডিত ও ডান হাতের আঙুল কেটে হত্যা করা হয়। ২০১০ সালে এসে শহীদের সারিতে যোগ হলো আরও তিনটি নাম। ৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ে নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে প্রাণ দেন গণিত শেষ বর্ষের দরিদ্র ছাত্র কথিত ছাত্রলীগ কর্মী ফারুক হোসেন। সরকার দলের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য এর দায় চাপানো হলো চির মজলুম ছাত্রশিবিরের ওপর। ব্যস, মাত্র ২ দিনের ব্যবধানে লাশে পরিণত হন আমাদের প্রিয় দুই ভাই। চাঁপাইনবাবগঞ্জে বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে অবস্থানরত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্র পিতামাতার একমাত্র সন্তান হাফিজুর রহমান শাহীনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের মেধাবী ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে জবাই করে ছাত্রলীগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক মেধাবী ছাত্র শিবির নেতা হারুনুর রশীদ কায়সারকে শাটল ট্রেন থেকে অপহরণ করে জবাই করে ফেলে দেয়া হয়।

এরই মাধ্যমে হযরত হামযার (রা) শহীদি কাফেলায় ছাত্রশিবিরের ১৩৬ জন সংযুক্ত হলেন। ঘাতকরা খড়গহস্ত হয়ে শেষ করতে চেয়েছে ইসলামের সাহসী সৈনিক তৈরির কারখানা ইসলামী ছাত্রশিবির নামক বিশাল কাফেলাকে। কিন্তু মৃত্যু যাদের প্রিয় ঠিকানা, তাদেরকে কি কেউ কখনো পরাস্ত করতে পেরেছে? পারেনি বদরে, ওহুদে, হোনায়নে, তাবুকে কিংবা সিন্ধুতে এবং বাংলার এই সবুজ জমিনেও। কাফেলার সারি কেবল বেড়েই চলেছে আর বেড়ে চলেছে বাতিল শক্তির মর্মযাতনা ও গাত্রদাহ। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, শাহাদাতের এই নজরানার দরুন বাংলার জমিন অনেক উর্বর হয়েছে, আরো উর্বর হবে এবং এই পথ বেয়েই একদিন ইসলামী বিল্লবের সোনালি সূর্য উদিত হবে বাংলাদেশের পূর্ব দিগন্তে। কিন্তু কী অপরাধ ছিল শাহাদাত বরণকারী প্রিয় ভাইদের? না, ছিল না কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ কিংবা স্বার্থ সংঘাত। "তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল যে তাঁরা মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলেন যিনি স্বপ্রশংসিত।" জীবন্ত শহীদের সারিও কম দীর্ঘ নয় এই শহীদি কাফেলার। হাত, পা, চোখসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হারিয়ে এখনও দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন অনেকে। তবুও তাঁরা এতটুকু ব্যথিত নন, নন মর্মাহত।

প্রায় প্রতিটি শাহাদাত ও সন্ত্রাসী ঘটনার পর বিভিন্ন সময়ে বুলেটিন, প্রচারপত্র ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। অবশেষে ১৯৯২ সালে সকল শহীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্মৃতিসমূহ একত্রিত করে প্রকাশ করা হয় 'রক্তাক্ত জনপদ' নামক একটি পুস্তিকা। এখন শহীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাই সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুনরায় একটি গ্রন্থ প্রকাশের দাবি উত্থাপিত হলে প্রথম ৩০ জন ভাইয়ের শাহাদাতের

www.pathagar.com

ঘটনা নিয়ে প্রকাশিত হলো 'স্মৃতি অমলিন' নামক এই পুস্তকটি। আশা করি এই বইটি আমাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের এক অনবদ্য দলিল হিসেবে টিকে থেকে ইতিহাসবিস্মৃত প্রজন্মের চেতনাকে আরো শাণিত করবে, তাদেরকে জাগিয়ে তুলবে নতুন প্রেরণায়। ৩০ জন শহীদের শাহাদাতের ঘটনাপ্রবাহের সাথে অসংখ্য সন্ত্রাস ও নির্যাতনের ঘটনাপ্রবাহ এতে এসেছে। তাদের জীবনের অসংখ্য চিত্রের মাঝ থেকে সামান্যই এখানে আনা সম্ভব হয়েছে। আরো বিস্তারিত গ্রন্থবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করছি।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বসে এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে সন্ত্রাসের এই ধারা সহজে দূরীভূত হবার নয়। আর ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনের পথে সন্ত্রাস থাকবেই। আর সন্ত্রাস থাকলেই ঝরবে আরো বহু শহীদের লাশ। আল্লাহ আমাদের সমস্ত শ্রমকে কবুল করুন, আমাদের সকল শহীদকে শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিন এবং আগামী প্রজন্মকে এই বই থেকে সন্ত্রাসবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

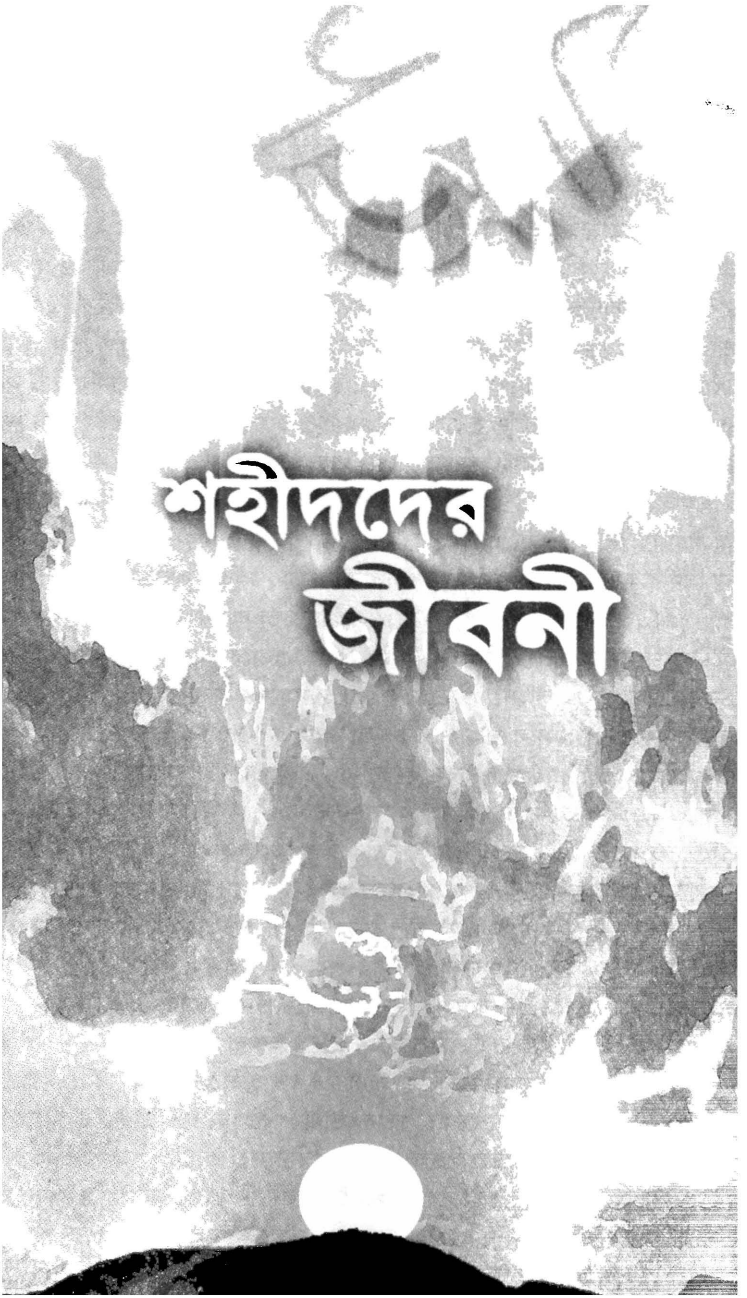

www.pathagar.com

স্মৃতিতে অমলিন

আমাদের শহীদেরা

ইসলামী আন্দোলনে শাহাদাত কোনো নতুন বিষয় নয়। মূলত শাহাদাত ইসলামী আন্দোলনের একটি স্বাভাবিক ও চলমান ধারা। মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই এই ধারার সূচনা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্য একান্ত কর্তব্য। এ সংক্রান্ত আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে– "আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত তথা খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয্-যারিয়াত : ৫৬) এই খিলাফতের দায়িত্বকে আঞ্জাম দিতে গিয়ে যুগে যুগে অসংখ্য মানুষ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন। এই শাহাদাত থেকে বাদ যাননি স্বয়ং নবী-রাসূলরাও। তাঁদেরকে করাত দিয়ে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে, লোহার চিরুনি দিয়ে শরীর আঁচড়িয়ে হাড় ও গোশত আলাদা করা হয়েছে। মানবতার মুক্তিদূত রাসূল (সা)-এর সময়ে হযরত সুমাইয়া (রা)-কে তাঁর লজ্জাস্থানে বর্শার আঘাত হেনে শহীদ করা হয়েছে। খুবায়েব-খাব্বাব (রা)সহ অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম শাহাদাত বরণ করে ধন্য হয়েছেন। শহীদের সর্দার হযরত হামযা (রা)কে শহীদ করে তাঁর পবিত্র কলিজা চিবিয়ে খেয়েছে বাতিলের পূজারীরা। স্বয়ং রাসূলে পাক (সা)ও শহীদি মৃত্যু কামনা করতেন।

ইসলামী আন্দোলনকে সম্মুখে অগ্রসর করতে গিয়ে এভাবে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেছেন অগণিত মর্দে মুজাহিদ। কেউ কেউ তো হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জুকেও নিজের গলায় বরণ করে নিয়েছেন। আসলে শাহাদাতের মৃত্যু পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে শহীদ হিসেবে কবুল করেন না। একান্ত প্রিয়জনদেরকেই তিনি শহীদের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের পথে শহীদের সংখ্যাও কম নয়। শহীদ আবদুল মালেক এ দেশের ছাত্র-জনতার পক্ষ থেকে হামযার (রা) শহীদি মিছিলে নাম লেখানো প্রথম শহীদ। এরপর শহীদের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। তথাপি কাফেলা এতটুকু থমকে দাঁড়ায়নি, বাতিলের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পিছপা হননি কাফেলার সৈনিকেরা। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর এই স্বল্পতম সময়ে ১৩৬ জন ভাই শাহাদাত বরণ করেছেন এটা ঠিক, আপাতদৃষ্টিতে সংখ্যাটাও নেয়াত বেশি না হলেও কম না। এ মিছিলে আরও অনেক ভাই শরিক হবেন এটাও আমরা বিশ্বাস করি।

এখানে পর্যায়ক্রমে শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, শাহাদাতের পর বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া, গর্ভধারিণী মা ও শ্রদ্ধেয় পিতার ভাষ্য, শাহাদাতের প্রেক্ষাপট আলোচিত হয়েছে। সব কয়টি শাহাদাতের প্রেক্ষাপট ও শহীদদের জীবনী পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আমাদের শহীদেরা সকলেই ছিলেন নিষ্পাপ, অনুপম ও অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী, মানবকল্যাণী, বিদ্যানুরাগী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রত্যাশী তথা আপাদমস্তক খোদার রঙে রঞ্জিত একেকজন মর্দে মুজাহিদ।

www.pathagar.com

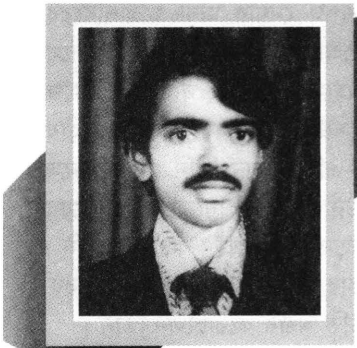

০১

শহীদ সাব্বির আহমদ

সব ধরনের জুলুম ও নিপীড়ন থেকে মানুষের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করে চলছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। শত বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে যারা নিরলস নিত্যদিন কাজ করে চলছে, যারা এগিয়ে চলছে আন্দোলন-সংগ্রামে, অত্যাচার-নির্যাতন, জেল-জুলুম ও জীবনদান যাদের নিত্য সঙ্গী, অপরিসীম ত্যাগ আর কুরবানির বিনিময়ে যারা কাঙ্ক্ষিত অর্জনের পথে এগোচ্ছে নিত্যদিন; তাদেরই একজন শহীদ সাব্বির আহমদ।

ব্যক্তিগত পরিচয়

মো: সাব্বির আহমদ। সোনালী ব্যাংকের সাবেক নাইট গার্ড মো: জামিল খানের ছয় সন্তানের মধ্যে সবার বড় ছিলেন শহীদ সাব্বির আহমদ। রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার অন্তর্গত উপশহরে আবাসিক এলাকায় তাদের বাড়িটি ছিল এ/২২ নম্বর। পুরাতন ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বাড়িতে বসবাসরত পরিবারে সাব্বির ছিলেন তখন ১৮ বছরের পরিশ্রমী আর প্রাণবন্ত তরুণ।

শিক্ষাজীবন

পরিবারের দারিদ্র্যের মধ্যেও যেহেতু তিনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং অর্থকড়ির যোগান দিতে কলমের কালি তৈরির প্রকল্পসহ প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবসা করতেন। নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই বহন করতেন শহীদ। দৈনিক সর্বোচ্চ দু'তিন ঘণ্টা সময় পেতেন পড়াশোনার জন্য। তারপরও কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৭৯ সালে।

সাংগঠনিক জীবন

আল্লাহর ঘোষণা, "জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ মুমিনদের জান ও মালকে খরিদ করে নিয়েছেন।" (সূরা তাওবা : ১১১) এই ঘোষণা নতমস্তকে মেনে নিয়ে আল্লাহর পথে

www.pathagar.com

নিজের জান ও সম্পদকে বিকিয়ে দেয়ার চূড়ান্ত শপথ নেয়ার জন্য ছাত্রশিবিরের পতাকাতলে আসেন সাব্বির আহমদ। ইসলামী ছাত্রআন্দোলনে যোগ দেয়ার সাথে সাথে তিনি নিজেকে গড়ে তোলেন আদর্শবান ছাত্র হিসেবে, এবং দাওয়াতী কাজে নিজেকে সক্রিয় করেন। নিজের মেধা, মননশীলতা, সচ্চরিত্র অবলম্বন করে প্রাণপ্রিয় সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে যান তিনি। পর্যায়ক্রমে সংগঠনের কর্মী, সাথী অতঃপর সদস্যপ্রার্থীর স্তরে উন্নীত করেন নিজেকে। মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁকে সদস্য হিসাবে চূড়ান্ত শপথ গ্রহণ করতে দেয়নি। উপশহর এলাকার দায়িত্বশীল থাকার সময় এলাকার শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মাঝে অত্যন্ত মিষ্টভাষী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অনেক শাহাদাতের সাক্ষী হয়ে আছে। মতিহার চত্বরে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনে প্রাণ ও সহায়-সম্পত্তির নজরানা পেশ করেছেন অনেক শহীদ। ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি এই কাফেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮২ সালের ১১ মার্চ বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের ইতিহাসে প্রথম শহীদ হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন শহীদ সাব্বির আহমদ, মতিহার চত্বরে। হামযা, জাফর, যায়েদ, রাওয়াহা (রা) যে মিছিল শুরু করেছিলেন– বাংলাদেশে সেই শহীদি মিছিলে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৩৬ জন শহীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদ সাব্বির আহমদ।

১১ মার্চ, ১৯৮২। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আগের দিন ১০ মার্চ, বুধবার। সেদিন থেকেই মূলত শিবিরের এই কর্মসূচিকে বানচালের একটি হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে উদীয়মান শক্তি হিসেবে শিবিরকে সহ্য করতে পারল না বাতিলপন্থীরা। ১১ তারিখের অনুষ্ঠানের প্রচারের কাজে ব্যস্ত শিবিরকর্মীদের ওপর হঠাৎ করে চড়াও হলো ছাত্র ইউনিয়নের একদল দুষ্কৃতকারী। শিবিরকর্মীদের হাত থেকে প্রচারপত্র কেড়ে নিলো। প্রচারকার্য বন্ধ করার জন্য বল প্রয়োগ করতে লাগলো। কিন্তু ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন শিবিরকর্মীরা। এতে আহতও হলেন কয়েকজন।

১১ মার্চ সকাল থেকেই নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য জোর প্রস্তুতি চলছিল। প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম চত্বরে নবাগতদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মিলনস্থল। অনুষ্ঠান উপভোগ করতে আসে শহর-গ্রাম থেকে আবাল-বৃদ্ধ-যুবক সবাই। হাজার হাজার জনতার এই মিলনস্থলে সমবেত হয়ে নিজেকে ধন্য করতে এসেছিলেন শহীদ সাব্বির আহমদ। অনুষ্ঠানস্থলের অদূরে শহীদ মিনারে শিবিরের কর্মসূচির সাথে একই সময়ে একটি সাংঘর্ষিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল দুষ্কৃতকারীরা। তারা লাঠি, রামদা, বল্লম, হকিস্টিক ও রড নিয়ে জমায়েত হয়েছিলো। কেবল শিবিরের প্রোগ্রাম বানচালের জন্যই এ কর্মসূচি। পূর্বপরিকল্পিতভাবে তথাকথিত ছাত্র পরিষদের ব্যানারে এ সমাবেশের আয়োজন করেছিল ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (ফ–চু), ছাত্রলীগ (মু–হা) বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যরা। ছাত্র ইউনিয়নের

www.pathagar.com

নেতৃত্বে তারা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বারবার গোলযোগ বাধাতে চেষ্টা করে। প্রতিবারই শিবিরকর্মীরা তাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। এরমধ্যে বাইরে থেকে তারা কয়েকটি বাস বোঝাই করে পাঁচ-ছয়শত সশস্ত্র সন্ত্রাসী এনে শিবিরকর্মীদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে ছিল রামদা, ভোজালি, ছোরা, বল্লম, হকিস্টিক ও লোহার রড। হিংস্র হায়েনার মত তারা শিবিরকর্মীদের ওপর অতর্কিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এসময় শহীদ সাব্বির আহমদকে বহনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের গাড়ি প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে পৌঁছে। তিনি গাড়ি থেকে নামা মাত্রই ছাত্র ইউনিয়নের সশস্ত্র ক্যাডাররা তাঁকে দেখে ফেলে। মুহূর্তের মধ্যেই ছুরি, বল্লম, রামদা, ভোজালির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে সাব্বির আহমদের পুরো শরীর। একই সাথে অন্যান্য শিবিরকর্মীদের ওপর বৃষ্টির মতো ইট ছুঁড়তে শুরু করে তারা। আত্মরক্ষার জন্য শিবিরকর্মীরা এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন। কিন্তু পৈশাচিক উন্মত্ততায় মেতে ওঠা নরঘাতকরা নিরস্ত না হয়ে কর্মীদের পিছু ধাওয়া করে নির্দয়ভাবে মারতে থাকে। অনেক শিবিরকর্মী আত্মরক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের (বিএনসিসি) অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ঘাতকদের সেখানে ঢুকতে সাহায্য করেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিরস্ত্র কর্মীদের বেধড়ক পেটানো ও ছুরিকাঘাত করা হয়। একটি ইটের ওপর রেখে আর একটি ইট দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় শিবিরকর্মীর মাথা। পৈশাচিক বর্বরতার শিকার শিবিরকর্মীদের রক্তে বিএনসিসি ক্যান্টিনের মেঝে, চেয়ার, টেবিল, দেয়াল সব কিছু লালে লাল হয়ে যায়। ঘটনার কয়েকদিন পরও সেখানে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ শিবিরকর্মীদের ত্যাগের মহিমাকে জানান দিচ্ছিলো।

এতবড় একটি ঘটনা ঘটলো, অর্ধশতাধিক শিবিরকর্মী আহত হলো কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো তারপরও। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় কাছাকাছি থেকেও পুলিশ সেদিন দর্শকের ভূমিকায় ছিলো।

সকাল ১১টায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সাব্বির আহমদকে। শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এ পৈশাচিক বর্বরতার খবর। বিষাদের ছায়া নেমে এলো রাজশাহীবাসীর মধ্যে। দলে দলে ছাত্র, শুভানুধ্যায়ী, সাধারণ মানুষ হাসপাতালের দিকে ছুটে চললেন। সকাল সাড়ে ১১টায় হাসপাতালে কান্নার রোল উঠলো।

সবাইকে খুশি করে, আজানের ধ্বনিতে ধ্বনিত হয়ে কোনো এক শুভক্ষণে জন্ম নেয়া সাব্বির আজ আর্তনাদ আর কান্নার মৃদু হাহাকারে চিরবিদায় নিয়েছেন। খবর পেয়ে পিতা ছুটে আসেন আহত ছেলেকে দেখতে। কিন্তু এসে নিজের চোখে যা দেখলেন তিনি, তা সইতে পারলেন না। তাঁর দুচোখ বেয়ে নামলো অশ্রুধারা। স্নেহের বড় ছেলে তাঁর শহীদ হয়েছেন। আর কোনোদিন ছেলে তাঁকে 'আব্বা' বলে ডাক দেবে না মা শুনবে না 'মা' ডাক। ছোট ভাই-বোনেরা পাবে না স্নেহ আর ভালোবাসা। সহকর্মীরা পাবে না তার সাহচর্য।

www.pathagar.com

শহীদ সাব্বির যেমন নিজে হয়েছেন ধন্য শাহাদাত বরণ করে, তেমনি এই জমিনের জন্য রেখে গেছেন এক অনুকরণীয় নজির। সূর্য উদিত হয় প্রতিদিনের ন্যায়, কোনো কোনো দিন এমনও আছে রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল আর রৌদ্র তাপদগ্ধ দুপুরের পর দিনের শেষে বিকেল এসে সৃষ্টি হয় অমাবস্যার রাত। কিন্তু অমাবস্যার ঘন কালো রাতও পোহায়। অতঃপর দিনের আলোয় চারদিক আবার আলোকিত হয়। কোনো কোনো জীবনও এরকম দিন আর রাত্রির মত। স্বীয় প্রতিভাগুণে গুণান্বিত এসব মানুষ অনুরাগীদের আকৃষ্ট করেন, হয়ে ওঠেন আলোচনার বিষয়বস্তু, স্বীকৃত হয় তাঁদের প্রতিভা। রক্তের স্রোতধারার উৎস শহীদ সাব্বিরের আত্মা শান্তি পাবে একটি সফল ইসলামী বিপ্লব সাধনের মধ্য দিয়ে, যখন দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর আইন কানুনের পাবন্দ করবে। তাই ধুয়ে যাক সকল কালিমা, সফল হোক শহীদ সাব্বিরের রক্ত।

জানাজা ও দাফন

শহীদের গর্বিত পিতা মো: জামিল খান নিজেই পুত্রের জানাজা নামাজের ইমামতি করেন। হাত ওঠান আল্লাহর দরবারে। শহীদ পুত্রের কবুলিয়াতের এবং আহত কর্মীদের সুস্থতার জন্য দোয়া করলেন দুই চোখের পানি ছেড়ে। পরে নগরীর টিকাপাড়া গোরস্থানে চিরদিনের জন্য তাঁকে দাফন করা হয়।

পিতার অনুভূতি

অশ্রুসিক্ত পিতা মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, এমন ছেলের পিতা হওয়ার গৌরবে আমি তোমার দরবারে শোকর আদায় করছি। আমার ছেলের শাহাদাত কবুল করে নাও।"

অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়

কৈশোরে আল্লাহর রাসূল (সা) যেমন সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় 'হিলফুল ফুজুল' নামক ক্লাব গঠন করে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন, সেই রাসূলের (সা) আদর্শের অনুসারী শহীদ সাব্বিরও উপশহরের সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত 'অনুসন্ধান' ক্লাবের সদস্য হয়ে সমাজসেবায় ভূমিকা রাখেন। সদা চঞ্চল ও পরিপাটি কিশোর শহীদ শুধু আদর্শবান ছাত্র নয়, একজন খেলোয়াড় ও সংগঠক হিসাবেও অনেক পুরস্কার অর্জন করেন।

সমাজের কারো সাথে কোনো বিষয় নিয়ে সামান্যতম কোনো কথা কাটাকাটি করেননি তিনি। তবে সত্য প্রতিষ্ঠার সৈনিক হিসেবে ন্যায়ের উচ্চারণে অত্যন্ত দৃঢ় ছিলেন। শহীদ সাব্বির অন্যের উপকার করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, অন্যের সেবা করে আনন্দ পেতেন তিনি। আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করতেই পছন্দ করতেন শহীদ।

শহীদ সাব্বির নিজের যা কিছু ছিলো অর্থকড়ি-সহায় সম্পত্তি; সবকিছু কাজে লাগিয়ে দ্বীনের দাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন আজীবন। বায়তুলমাল থেকে খরচ করার মত খাত থাকা সত্ত্বেও– শুধু বায়তুলমালের কঠোর হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে– সেই অনুভূতি থেকে খরচ করেননি। নেতৃত্বের আনুগত্যে তিনি আন্তরিক ছিলেন। জীবনের শেষ দিনটিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয়েছিল যে সকাল ন'টা চল্লিশের গাড়িতে

www.pathagar.com

ক্যাম্পাসে যেতে হবে। বাড়ির সব জরুরি কাজ শেষ করে খেতে বসে দেখলেন মা এখনো রুটি ভাজা শেষ করতে পারেননি। তাড়াহুড়ো করে চুলোর ওপর থেকে দুটো রুটি খেয়ে ক্যাম্পাসে রওনা দেন। সাব্বির জানতেন না এটাই আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়ার সর্বশেষ রিযিক। শহীদ সাব্বির দ্বীনের দাওয়াতী কাজসহ অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিয়ে যেটুকু অবসর পেতেন তা কুরআন তিলাওয়াত আর যিকির করে কাটাতেন। যারা আল্লাহর দাসত্ব কবুল করেছে তারা যিকিরের মধ্য দিয়েই তাদের সময় কাটান।

এক নজরে শহীদ সাব্বির আহমদ

নাম : মো: সাব্বির আহমদ
পিতার নাম : মো: জামিল খান
সাংগঠনিক মান : সদস্যপ্রার্থী
জীবনের লক্ষ্য : ইঞ্জিনিয়ার হওয়া
আহত হওয়ার স্থান : রাবি'র প্রশাসনিক ভবনের সামনে (জোহার মাজারের সাথে)
শহীদ হওয়ার স্থান : ঘটনাস্থল
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (ক-চু), ছাত্রলীগ (মু-হা), ছাত্রমৈত্রী
অস্ত্রের ধরন : ছুরি, লাঠি, বল্লম, হকিস্টিক, রড ইত্যাদি
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মার্চ, ১৯৮২
স্থায়ী ঠিকানা : রাজশাহী উপশহর, ডাক- সেনানিবাস, থানা- বোয়ালিয়া, জেলা- রাজশাহী
ভাই-বোন : ৬ জন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান: সবার বড়
পিতার পেশা : সোনালী ব্যাংকের সাবেক নাইট গার্ড।

www.pathagar.com

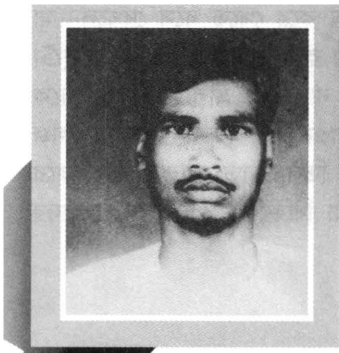

০২

শহীদ আব্দুল হামিদ

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে। শাশ্বত সত্য ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আল্লাহর একান্ত প্রিয় নির্ভীক সিপাহসালারগণ যুগ যুগ ধরে সদা-সর্বদা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। অপরদিকে মিথ্যার ধারক-বাহক বলে পরিচিত যারা, সত্য যাদের অন্তরে তীরের ন্যায় বিঁধে, তারা সব সময়ই এই শাশ্বত সত্যের টুঁটি চেপে ধরে রাখতে চেয়েছে। নিভিয়ে দিতে চেয়েছে আল্লাহর দ্বীনের উজ্জ্বল আলোর বিচ্ছুরণ।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাসূলের (সা) যুগে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাস অনন্য। সেই ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায় একদিকে যেমন উত্তাল সাগরের মতো প্রতিবন্ধকতার অন্যদিকে নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং বঞ্চিত মানুষের পক্ষ থেকে অনন্য প্রতিরোধের। এই ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল হযরত সুমাইয়া (রা)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে। পরবর্তীতে কালের সন্ধিক্ষণে যুগ থেকে যুগান্তরে মহান রাব্বুল আলামিনের অগুনতি অকুতোভয় সৈনিক শাহাদাতের রক্তপিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের ধারাকে গৌরবোজ্জ্বল করে রেখেছেন। শহীদ আব্দুল হামিদ ছিলেন পরম করুণাময়ের এমন এক অকুতোভয় সৈনিক, যিনি শাহাদাতের স্বর্ণসিঁড়ি বেয়ে জান্নাতের ফুল হয়ে মহান রাব্বুল আলামিনের বাগিচায় ফুটে রয়েছেন। আমরা জানি বাগানের মালিক তার প্রয়োজনে বাগান থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ফুলটি পছন্দ করে তুলে নেন। মহান আল্লাহও তাঁর দুনিয়ার বাগানের মধ্য থেকে তাঁর পছন্দমত শ্রেষ্ঠ ফুল হিসেবে শহীদ আব্দুল হামিদ ভাইকে উঠিয়ে নিয়েছেন।

একজন আব্দুল হামিদের বেড়ে ওঠা

ঠাকুরগাঁও জেলা সদরের সৈয়দপুর নামক নিভৃত পল্লীতে আবির্ভাব ঘটেছিল শহীদ আব্দুল হামিদের। পিতা নাসির উদ্দিন আর মাতা হামিদা বেগমের একান্ত স্নেহ ভালোবাসায় গড়ে উঠছিলেন ধীরে ধীরে। পরিবারে সাত ভাই-বোনের মাঝে তাঁর

www.pathagar.com

অবস্থান ছিল সবার বড়। তাই শহীদ আব্দুল হামিদকে নিয়ে পিতা-মাতার চোখে-মুখে ছিল একরাশ সোনালি স্বপ্ন।

বাবা-মায়ের সেই স্বপ্নসাধ বুকে নিয়েই পাঠশালায় পাড়ি জমিয়েছিলেন শহীদ আব্দুল হামিদ। লেখাপড়া শিখবে, চাকরি করবে, বড় হয়ে পিতা-মাতার মুখে হাসি ফোটাবে এমন একটি আশার ভেলায় চড়ে সামনের পানে ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন কিশোর আব্দুল হামিদ। দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও সে আশায় বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি তাঁর। সীমাহীন প্রতিকূলতার মাঝেও স্বপ্নের তরী বেয়ে এলাকার দানারহাট মাদ্রাসা থেকে দাখিল এবং জয়পুর আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে আলিম, ফাজিল ও কামিল পাস করেন। একই সাথে তিনি জয়পুর কলেজ থেকে এইচএসসি পাসও করেন। তাঁর জ্ঞান আহরণের অদম্যস্পৃহা এখানেই থেমে থাকেনি। তাই উচ্চশিক্ষার জগতে পাড়ি জমাতে আসেন রাজশাহীতে। শুরু হয় নতুন জীবনের এক নবঅধ্যায়ের। ভর্তি হলেন রাজশাহী সরকারি কলেজের আরবি বিভাগে।

বন্ধুর পথের যাত্রী হলেন আব্দুল হামিদ

পূর্ব থেকেই ইসলামী আন্দোলনের প্রতি শহীদ আব্দুল হামিদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ছিল সীমাহীন। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সংগ্রামী কাফেলায় নিজেকে শরিক করেন। তিনি জানতেন এ পথে রয়েছে চরম প্রতিবন্ধকতা। রয়েছে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ। তবুও "ইসলামী আন্দোলন ঈমানের অপরিহার্য দাবি" ঈমানের এ দাবিকে মেটাতে সব কিছু কুরবানি করার মানসিকতা নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিপ্লবী কাফেলায়। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভোগ-বিলাসের মায়া-মমতা জড়ানো এ পৃথিবীর চোরাবালিতে না ডুবে মহান রাব্বুল আলামিনের রাস্তায় নিজের জীবন কুরবানি করার মধ্যেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সফলতা। আর সে জন্যই রাব্বুল আলামিন তাঁর এ অব্যক্ত আকুতি কবুল করে নিয়ে তাঁকে জান্নাতের বাগানে স্থান করে দিয়েছেন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিবেশীর সেবায় আব্দুল হামিদ

শহীদ আব্দুল হামিদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন এক প্রতিবাদীকণ্ঠ। এলাকার কোনো মানুষকে কোনো অন্যায় করতে দেখলে বলিষ্ঠকণ্ঠে প্রতিবাদ করতেন এবং অন্যায় থেকে দূরে থাকার পরমার্শ দিতেন। চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবন সাজিয়েছিলেন এক অনন্য আদর্শ হিসেবে। প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে শহীদ আব্দুল হামিদ ছিলেন সর্বদা সচেতন। সেজন্য প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা গরিব ছিল তাদেরকে সামর্থ্যানুযায়ী টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। রোগ-শোক, বিপদাপদে সব সময় খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করতেন এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কার্পণ্য করতেন না।

www.pathagar.com

ইসলামী আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক শহীদ আব্দুল হামিদ

শহীদ আব্দুল হামিদ ইসলামী আদর্শের উজ্জ্বল প্রতীক হিসেবে তাঁর প্রাত্যহিক আচরণ, চালচলন, কথাবার্তায় ইসলামের সুমহান শান্তির অকপট দীপ্তিতে ভাস্বর ছিল। ছোটবেলা থেকেই শহীদ আব্দুল হামিদ মহান প্রভুর কাছে সঁপে দিয়েছিলেন নিজেকে। ইসলামী অনুশাসনের প্রতি প্রবল ঝোঁক ও আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে শৈশব থেকেই। আদর্শ মুমিনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি হিসাবে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই নিয়মিত নামাজ পড়তেন। শুধু তাই নয়, বাড়ির সবাইকে এবং পাড়া-প্রতিবেশী ও সহপাঠীদের সবাইকে নামাজ পড়ার জন্য আহ্বান জানাতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর চোখে-মুখে ছিল ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সোনালি স্বপ্ন। সে জন্য ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন জায়গায় তিনি বক্তব্য রাখতেন।

ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণকর্মী শহীদ আব্দুল হামিদ ইসলামের জন্য কাজ করে সব সময় মানসিক প্রশান্তি লাভ করতেন। কৈশোরেই তিনি ইসলামী জলসার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা সংগ্রহ করতেন। গ্রামের মানুষকে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য গ্রামে ইবতেদায়ী মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখনও সে মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসার নাম সৈয়দপুর শহীদিয়া মাদ্রাসা। তাঁর স্মৃতিতে সৈয়দপুরে একটি শহীদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শহীদ আব্দুল হামিদ স্মৃতি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে তাঁর জীবন ছিল সামগ্রিকভাবেই প্রশ্নহীন। স্বাভাবিক চাহিদা হিসেবে যখন যা জুটতো তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন, এক্ষেত্রে কখনো বাড়াবাড়ি করেননি। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন পছন্দ করতেন। উন্নত ও মননশীল রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে চলাফেরা করার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁর কক্ষকে এবং পড়ার টেবিল সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতেন। বাড়িতে তিনি ফল-ফুলের গাছ লাগিয়ে বাড়ির সৌন্দর্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। এ ব্যাপারে পাড়া-প্রতিবেশীকেও উদ্বুদ্ধ করতেন। আল্লাহর একান্ত বান্দা হিসেবে শহীদ আব্দুল হামিদ ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার মাধ্যমেই তাঁর চরিত্রকে উন্নত ও মাধুর্যপূর্ণ করে তুলেছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি সব সময় পায়জামা-পাঞ্জাবি ব্যবহার করতেন। জীবনে কোনো দিন দাড়ি কাটেননি। বলা যায় যে, তাগুতি সমাজের ছোঁয়া তাঁকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি। সেজন্য এলাকার সুধীজন ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছোট ভাইদের প্রতি তাগিদ দেয়া ছিল তাঁর নিত্যনতুন ঘটনা। সৈয়দপুর ছিল চোর-ডাকাতের ভয়ে ভীত একটি এলাকা। আব্দুল হামিদ দুর্দান্ত সাহসিকতার সাথে চোর-ডাকাত থেকে নিজ গ্রামকে মুক্ত রাখার চেষ্টা চালান। ছোট ভাইদের ঘুমপাড়িয়ে সবার পরে তিনি ঘুমাতেন। ইসলামী আন্দোলনের জন্য তাঁর আত্মত্যাগ সমাজ, তাঁর পরিবার ও পিতা-মাতার গর্ব হিসেবে মর্যাদা পেয়েছেন। তাঁর শাহাদাতের পর তাঁর কথা যখনই তাঁর পিতার মনে পড়ত তখনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতেন। এর মাত্র তিন বছর ব্যবধানে

www.pathagar.com

সেই পিতাও পরপারে পাড়ি জমান। শহীদের মেজ ভাই একবার তাঁর আব্বাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং কথা হয়েছিল। তাঁর আব্বা বলেছিলেন, 'আমি তোমার বড় ভাইয়ের জন্যই কবরে খুব শান্তিতে আছি। শহীদের পিতা হিসেবে মহান রাব্বুল আলামিন তাঁকে সম্মানিত করেছেন, এ সুরত তাঁরই ইঙ্গিত বহন করে।'

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯৮২ সালের ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার। সত্য আদর্শের ঝাণ্ডাবাহী সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত সংবর্ধনার আয়োজন করতে যাচ্ছিল। নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ইসলামী আন্দোলনের সুমহান দাওয়াত তুলে ধরে ইসলামী আন্দোলনকে এ ক্যাম্পাসে তথা রাজশাহীতে আরো বেগবান করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। আগের দিন বুধবার থেকেই শুরু হয়েছিল প্রচার ও অন্যান্য আয়োজন। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ধ্বজাধারী বলে পরিচিত জাসদ-মৈত্রী, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা শিবিরের এ নবীন বরণ বানচাল করার এক হীন ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। প্রচারকার্যে আগের দিন ছাত্র ইউনিয়নের দুষ্কৃতকারী হেলালের নেতৃত্বে বাধা প্রদান করা হয়। তারা নিরীহ শিবিরকর্মীদের হাত থেকে দস্যুর মতো প্রচারপত্র কেড়ে নেয় ও প্রচারকার্য চালাতে নিষেধ করে। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের স্বার্থেই শিবিরকর্মীরা ঘটনা সম্পূর্ণ এড়িয়ে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। তাঁরা ধৈর্য আর সহনশীলতার পরিচয় দিলেও বর্বরতায় নেশাগ্রস্ত খুনিরা থেমে থাকেনি। সন্ত্রাসীরা শিবিরের কর্মসূচিকে শুধু বানচালই নয় বরং শিবিরের রক্তে মতিহারকে রঞ্জিত করার নীলনকশা এঁটে বসল।

নবাগত সংবর্ধনার দিন সকাল থেকেই প্রোগ্রামের প্রস্তুতি চলছিল। শত শত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শিবিরকর্মী চারদিক থেকে ছুটে আসছে প্রোগ্রামস্থলে। ছাত্রশিবির আজ তাদের আদর্শের কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র, জনতা, শিক্ষক ও কর্মচারীর কর্ণকুহরে পৌঁছাবে।

এমনই একটি সুযোগের অপেক্ষা করছিল সন্ত্রাসীরা। একদিকে ছাত্র-জনতার ঢল নামছে প্রোগ্রামস্থলে আর ঠিক তার বিপরীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে অবস্থান করছে সশস্ত্র অবস্থায় দুর্বৃত্তরা। ঘটনার দিন হিংস্র এ হায়েনাদের প্রস্তুতি ছিল রীতিমতো যুদ্ধাবস্থার। হাতে তাদের রামদা, বল্লম, লাঠি ও হকিস্টিক। তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। শিবিরের প্রোগ্রাম তারা হতে দেবে না। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (ফ. চু.), ছাত্রলীগ (যু. গ.) বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীসহ অন্যান্য সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত সংগ্রাম পরিষদ ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করে সংঘর্ষ বাঁধানোর চেষ্টা করতে লাগল। তাদের শত উস্কানি সত্ত্বেও শিবিরকর্মীরা সেদিন অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ইসলামপ্রিয় সাথীরা প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন সকল প্রকার হৈ-হাঙ্গামা পরিহার করে প্রোগ্রাম সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে। কিন্তু চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। সন্ত্রাসীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আজ মতিহার চত্বরকে সত্যের

www.pathagar.com

আলোকবাহী নিরীহ শিবিরকর্মীদের রক্তে রঞ্জিত করবে। এক ফুঁৎকারেই নিভিয়ে দেবে সত্যের আলোকবাহী মশাল।

কী ঘটেছিল সেদিন

সেদিন সকালেই মতিহার চত্বরে শত শত নবাগত শিক্ষার্থী হাজির হয়েছিল। শুরু হচ্ছিল নবাগতদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। ইতোমধ্যেই বাইরে থেকে কয়েকটি বাস বোঝাই করে পাঁচ-ছয়শত বহিরাগত গুণ্ডা এসে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল। যখন সন্ত্রাসীরা বুঝতে পারলো তাদের হৈ-হাঙ্গামার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে, তখন তারা হিংস্র হায়েনার ন্যায় কালক্ষেপণ না করে যৌথভাবে প্রথমে কেন্দ্রীয় মসজিদের কাছে উপস্থিত নিরীহ শিবিরকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পরবর্তীতে আবার প্রোগ্রাম স্থলে। সন্ত্রাসীরা শিবিরকর্মীদেরকে চারপাশ থেকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরল। খুনের উন্মত্ততায় রামদা, বল্লম, লোহার রড, ছোরা হাতে সন্ত্রাসীরা দৌড়ে চলল প্রোগ্রামস্থলে। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় চারদিক থেকে ঘেরাও করে নিরস্ত্র শিবিরকর্মীদের ওপর পৈশাচিক আক্রমণ চালাল। প্রোগ্রাম পণ্ড হলো। গোটা ক্যাম্পাসে শুরু হলো মাতম। মতিহারের সবুজ চত্বর শিবিরকর্মীদের রক্তে রঙিন হয়ে উঠল। গগনবিদারি চিৎকার করে অনেকেই প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটে চলল দিগ্বিদিক।

শহীদি মিছিলে শরিক হলেন আব্দুল হামিদ

শিবিরকর্মীদের ওপর চারদিক থেকে ইট-পাথর বৃষ্টির মতো পড়তে লাগল। আত্মরক্ষার জন্য অনেকেই মেইন গেটের কাছে বিএনসিসি ভবনে ঢুকে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু নরঘাতকরা তাতেও ক্ষান্ত হয়নি। সন্ত্রাসীরা বিএনসিসি ক্যান্টিনে আশ্রয়গ্রহণকারী শিবিরকর্মীদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে রাখে। একপর্যায়ে সন্ত্রাসীরা দরজা ভাঙতে চাইলে আব্দুল হামিদ ভাই বলেন, 'এটা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, ভাঙার দরকার নেই, আমিই খুলে দিচ্ছি।' এক এক করে টেনে-হিঁচড়ে বের করে চেঙ্গিসীয় ও হালাকু খানের কায়দায় নৃশংসভাবে হামলা চালায় পিশাচরা। বেধড়ক ছুরিকাঘাত, লোহার রড আর হকিস্টিকের আঘাতে গোটা কক্ষ নিরস্ত্র-নিরীহ শিবিরকর্মীর রক্তে ভিজে গেল। দয়া হলো না তাদের দিলে যে, কেন মারছি এদের! এরাও তো আমাদের মতো মানুষ। এদের আসলে কী অপরাধ! পাষণ্ডরা গোটা বিএনসিসি অফিস কসাইখানায় পরিণত করল। রক্তের ছোপ টেবিল-চেয়ার, মেঝে ও দেয়ালে লাগল। তারা সেখানে শহীদ আব্দুল হামিদ ভাইকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিয়ে অবর্ণনীয়ভাবে মাথা, নাক ও মুখে একের পর এক আঘাত করতে থাকে আর বলতে থাকে, বল শালা! আর শিবির করবি কি না? শিবির না করলে তোকে ছেড়ে দেব। খুনিদের কথা শুনে আব্দুল হামিদ বলেছিলেন, **'আমি যে সত্য পেয়েছি, আমি যে আলো পেয়েছি, ইসলামের পথ পেয়েছি, তা থেকে আমি দূরে থাকতে পারব না।'** এমতাবস্থায় হাত দিয়ে মাথা ঠেকাতে গেলে তাঁর সম্পূর্ণ হাত নিজের রক্তেই রঞ্জিত হয়ে যায়। এ অবস্থাতেই আব্দুল হামিদ মৃত্যুর পূর্বে শেষ অবলম্বন হিসেবে বিএনসিসি'র দেয়াল হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি হায়েনাদের উপর্যুপরি আক্রমণের শিকার

www.pathagar.com

হয়ে সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লে সন্ত্রাসীরা ইটের ওপর মাথা রেখে আরেকটি ইটের আঘাতে তার মাথা চূর্ণ করে দেয়। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাত ৯টায় হাসপাতাল থেকে ঘোষণা এল আহত আব্দুল হামিদ এই নশ্বর জগতের সব মায়ামমতা ত্যাগ করে শহীদের মিছিলে শামিল হয়েছেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন সকল কর্মী আর শুভাকাঙ্ক্ষী। আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে পড়ল তাদের কান্নায়। প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল সবার প্রিয় ব্যক্তি আব্দুল হামিদকে হারিয়ে।

শোকার্ত হৃদয়ে বিদায় দেয়া হলো শহীদ আব্দুল হামিদকে

শহীদ হওয়ার পরদিন ১২ মার্চ, শুক্রবার শত সহস্র শোকার্ত মানুষ রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দানে উপস্থিত হলেন শহীদ আব্দুল হামিদকে এক নজর দেখে চিরবিদায় জানানোর জন্য। সহস্র মানুষের উপস্থিতিতে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হলো। চোখের পানিতে, শোকার্ত হৃদয়ে শহীদ আব্দুল হামিদকে চিরদিনের জন্য কবরে শায়িত করা হলো। জানাজার আগে শোকার্ত কর্মী ও জনগণের উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন শিবিরের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের। আহত হওয়ার সংবাদ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছায় রাত এগারটায়। পরদিন মামা ও মেজ ভাই শহীদকে দেখতে রাজশাহী যান। তাঁকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে, এ সংবাদ নিয়ে তাঁরা গ্রামে ফেরেন। বাড়িতে লাশ পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। দিনটি শুক্রবার হওয়ায় দর্শনার্থীদের ভিড় এত বেশি ছিল যে জুমার নামাজ আদায় করে শেষবারের মতো তাঁর দ্যুতিময় মুখটি দেখতে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাঁর সুনাম সুখ্যাতি কী পরিমাণ ছড়িয়ে পড়েছিল তা এ অবস্থা থেকে সহজেই অনুমেয়। বেলা চারটার দিকে শহীদকে নিয়ে যাওয়া হয় কবরস্থানে। পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শুরু হলো প্রতিবাদের ঝড়

এ রকম আদিম হিংস্রতা আর অন্যায়ের প্রতিবাদে ফেটেপড়া রাজশাহীর আপামর ছাত্র-জনতা বিকেলের দিকে মিছিল বের করলেন। শাহাদাতের এ খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। এদিন দেশব্যাপী পালন করা হলো প্রতিবাদ দিবস। মসজিদে মসজিদে শহীদের মাগফিরাত কামনায় অনুষ্ঠিত হলো দোয়ার মাহফিল। দেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে বাদ জুমা অনুষ্ঠিত হলো গায়েবানা জানাজা। হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার এক বিশাল প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো। ঢাকার রাজপথে শুরু হলো প্রতিবাদী ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল। শ্লোগান উঠতে থাকল চট্টগ্রামসহ দেশের বড় বড় শহরের বিশাল মিছিল থেকে। চারদিক থেকে শুরু হলো প্রতিবাদ আর বিক্ষোভের এক প্রবল ঝড়।

বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়া

একই ঘটনায় একে একে তিনজন ভাই শাহাদাত বরণ করলেন, ঝরে গেল তিনটি ফুটন্ত ফুল। ১৩ মার্চ তারিখের পত্রপত্রিকায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রায় সব ক'টি রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবী মহল বিবৃতি দিলেন। অধিকাংশ

www.pathagar.com

পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হলো এ নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা উল্লেখ করে। পত্রিকার পাতায়, মিছিলে, প্রতিবাদ সভায় সর্বত্র হত্যাকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে দায়ী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মোসলেম হুদার অপসারণের দাবি ওঠে। ঘটনার দিন এ ব্যক্তির একটি মাত্র আদেশের অভাবে পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারেনি, বাধা দিতে পারেনি দুষ্কৃতিকারীদের।

আজও স্বপ্ন দেখেন শহীদের মা

শহীদের মা হামিদা বেগমের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তার সাথে তো আমার প্রায়ই কথা হয়।' একদিন বাড়ির পাশের গাছের ডাল ভেঙে হামিদা বেগমের পায়ে পড়লে পা ফুলে যায়। ব্যথায় কষ্ট পেতে থাকেন। ঠিক সে সময় শহীদ আব্দুল হামিদ এসে বললেন, 'মা, এভাবে কষ্ট করছেন কেন?' ঘটনা জেনে তিনি পায়ে তিনটি ফুঁ দেন। পরদিন থেকে পা পূর্বের ন্যায় সুস্থ হয়ে যায়। এভাবেই আরেক দিন স্বপ্নে এসে তাঁর প্রিয় বাবা কতদিন আগে মারা গেছে এবং ভাইদের কে কী অবস্থায় আছে তা জানতে চান।

ঠিক এভাবেই একদিন স্বপ্নে মাকে নানীর বাড়ি বেড়িয়ে নিয়ে আসেন। মায়ের শারীরিক খোঁজ-খবরের সাথে সাথে আত্মীয়-স্বজনদের কে বেঁচে আছে আর কে মারা গেছে তা জানতে চান। এমনিভাবে আরো একদিন স্বপ্নে আব্দুল হামিদ এলে মা তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তিনি বললেন, আমি ভালো আছি। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

আরেকদিন তাঁর মা স্বপ্ন দেখলেন– বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে বেশ কয়েকজন যুবক যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে আব্দুল হামিদও রয়েছেন।

শহীদের মা হামিদা বেগম তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে আরোও বলেন, বড় ছেলে আব্দুল হামিদের কথা মনে পড়লে এখনো খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কত আদরের ছেলে ছিল সে! ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আমি নিজের ছেলের মতো মনে করি। তাদের প্রতি আমার অনুরোধ, আব্দুল হামিদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ তারা সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে নিতে যেন আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়।

শাহাদাতের পূর্বে শহীদের কথা

গুণ্ডাবাহিনী যখন তাঁকে উপর্যুপরি আঘাত করছিল আর বলছিল, বল শালা আর শিবির করবি কি না, শিবির না করলে তোকে ছেড়ে দেব। তখন খুনিদের কথা শুনে শহীদ আব্দুল হামিদ বলেছিলেন, 'আমি যে সত্য পেয়েছি, আমি যে আলো পেয়েছি, ইসলামের পথ পেয়েছি, তা থেকে আমি দূরে থাকতে পারবো না।'

সন্তানহারা পিতা-মাতার অবস্থা

শাহাদাতের পূর্বে তাঁর পিতা-মাতা দু'জনই সুস্থভাবে, সুখে শান্তিতে জীবনযাপন করছিলেন। পুত্রশোককে ভুলতে না পেরে তিন বছর পর শহীদের শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব নাসির উদ্দিন ইন্তেকাল করেন। আর জনমদুঃখী মাতা হামিদা বেগম সন্তানহারা ব্যথা

www.pathagar.com

নিয়ে এখনো দুঃসহ জীবনযাপন করছেন।

শহীদের ছোট ভাই, শিক্ষক ও প্রতিবেশীর প্রতিক্রিয়া

ছোট ভাই ফয়জুর রহমান বলেন, আব্দুল হামিদের উত্তরসূরিদের নিকট আশা করি তারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করবে। এভাবেই ঢাকাসহ সারাদেশে ইসলামের সুশীতল বাতাস বইবে। প্রতিকূল সংস্কৃতি বিরাজমান থাকায় কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক পরামর্শ দেন। ভাইয়ের কথা মনে পড়লে ইসলামের পথে তিনি শহীদ হয়েছেন মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দেন।

আব্দুল হামিদের মাদ্রাসার শিক্ষক আবুল হুদা মোহাম্মদ আবদুল হাদী বলেন, সে খুব ভাল ছিল। তাঁর আচার-আচরণ, শিক্ষকদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল অতুলনীয়। জুনিয়র-সিনিয়র সবার সাথে তাঁর আচরণ ছিল অনুকরণীয়। সে তো শাহাদাৎ বরণ করেছে।

প্রতিবেশী শফিউর রহমান বলেন, সে খুব ভালো ছেলে ছিল। আচার-আচরণ, মানুষের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল চমৎকার। তাঁর মেজ ভাই, ছোট ভাই, পাড়া-প্রতিবেশীদের একটাই মাত্র প্রত্যাশা, শহীদ আব্দুল হামিদের উত্তরসূরিরা যেন তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে যথাযথ প্রচেষ্টা চালায়।

এক নজরে শহীদ আব্দুল হামিদ

নাম : মো: আব্দুল হামিদ
পিতার নাম : মো: নাসির উদ্দিন
মাতার নাম : মোছাম্মাৎ হামিদা বেগম
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ লেখাপড়া : আরবিতে অনার্স, রাজশাহী সরকারি কলেজ, রাজশাহী
জীবনের লক্ষ্য : অধ্যাপনা
অস্ত্রের ধরন : ইট, রড, হকিস্টিক, দা ও কুড়াল
যাদের আঘাতে শহীদ : জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মার্চ, ১৯৮২
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- সৈয়দপুর, ডাক- দানারহাট, থানা- ঠাকুরগাঁও, জেলা- ঠাকুরগাঁও
ভাই-বোন : ৭ জন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়
বাড়ির মোট সদস্য : ১০ জন (শাহাদাতের সময়)
পিতা : মৃত
মাতা : জীবিত, পেশা : গৃহিণী

www.pathagar.com

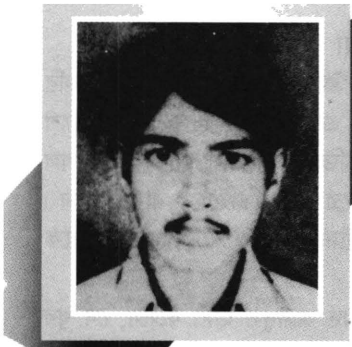

০৩

শহীদ আইয়ুব আলী

পদ্মাবিধৌত হযরত শাহ মখদুম (রহ)-এর পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের এক অনন্য লীলাভূমি। এই শহরে অনুকূল পরিবেশের দরুন বেশ কতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রাজশাহী সরকারি কলেজ অন্যতম। জীবনে বড় হওয়ার এক পরম স্পৃহা নিয়ে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হন মেধাবী ছাত্র আইয়ুব আলী। কিন্তু বড় হয়ে আলো ফোটানোর আগেই বাতিলের হামলায় নিভে যায় তাঁর জীবনপ্রদীপ।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শহীদ আইয়ুব আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার ডাউকি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহাম্মদ আইজুদ্দিন। আট ভাই-বোনের মধ্যে আইয়ুব আলী ছিলেন সবার বড়।

শিক্ষাজীবন

শহীদ আইয়ুব আলীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাদেমাজু স্কুলে। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রাইমারি শিক্ষা শেষ করে তাঁকে আলমডাঙ্গা পাইলট হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এসএসসি পরীক্ষার সময় অসুখ থাকার দরুন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন তিনি। এসএসসি পাস করার পর তিনি আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। অতঃপর রাজশাহী কলেজে উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। শাহাদাতের সময় তিনি এ কলেজেরই ছাত্র ছিলেন।

ব্যক্তিজীবনে শহীদ আইয়ুব আলী

ছোট্টকাল থেকেই আইয়ুব আলী ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও অমায়িক। ছোটবেলার একটি ঘটনা– আইয়ুব আলীর বয়স তখন মাত্র আড়াই বছর। মায়ের সঙ্গে বেড়াতে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন নানার বাড়ি। বায়না ধরেছিলেন আখ খাবেন। উপেক্ষা করতে পারলেন না মা। দেখিয়ে দিলেন তাঁর নানার আখক্ষেত। জমির কাছেই তাঁর ছোট নানা বসা ছিলেন। আইয়ুব আলী আখ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু আখ নিতে গিয়ে যা ঘটলো তার বর্ণনা করেন তাঁর নানা : 'ও আইয়ুবের মা, তোমার আইয়ুব আখ আনতে মাঠে গেছে। আমি ওকে আখ দিতেই সে বলল, আমি আমার নানার জমির আখ নেব। বাধ্য হয়ে ভাইয়ের জমি থেকে আখ দিলাম।' আনুগত্যশীল আইয়ুব কেন খাবে পরের জমির আখ? মনে হয় শহীদেরা এমনই নিষ্পাপ থাকে প্রভুর তত্ত্বাবধানে। শহীদ জননী তাঁর শাহাদাতের পর স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'সেই শাসনের পর থেকে আইয়ুব কেন, তাঁর কোনো ভাই-ই আজ পর্যন্ত পরের জিনিস না বলে স্পর্শ করা শেখেনি।'

সংগঠনে আগমন

ছোটবেলা থেকেই আইয়ুব আলী ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন। আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজে অধ্যয়নকালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের পতাকাতলে আসেন। সংগঠনে যোগ দেয়ার পর থেকেই তিনি নিয়মিত কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন করতেন। ছাত্রদের ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত দিতেন। পরিবার ইসলামী আন্দোলনের অনুকূলে না থাকলেও শহীদ আইয়ুব আলী ইসলামী আদর্শের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি কাজ তিনি একাগ্রচিত্তে পালন করার চেষ্টা করতেন। শাহাদাতকালে তিনি সংগঠনের সাথী ছিলেন।

শাহাদাতের ইচ্ছা পোষণ

শহীদ আইয়ুব আলী ইসলামী আন্দোলনের কাজে নিজেকে যখন সম্পৃক্ত করেছেন তখনও তাঁর পরিবার নামাজ-কালাম ঠিকমত পড়তেন না। একদিন পাশের বাড়ির মকবুল হোসেন মুন্সী তাঁর পিতাকে এসে বলল, 'আইয়ুব যে পথে নেমেছে তাতে ওকে ঠেকিয়ে না রাখতে পারলে তো মুশকিল! কারণ চারদিকে বিরোধিতা।' এরই প্রেক্ষিতে আইয়ুবের পিতা ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তুমি তো এপথে নেমেছ। কিন্তু কবে যে তোমাকে মেরে ফেলে!' তখন আইয়ুব বললেন, 'আল্লাহর পথে এসে মরাও ভালো। আপনি লেখাপড়া শেখাতে পারেন কিন্তু মৃত্যু তো ঠেকাতে পারেন না।'

অন্য একদিন শহীদ আইয়ুব আলী তাঁর পিতাকে বলেছিলেন, 'মানুষের মত মানুষ হয়ে আমাদের দুনিয়া থেকে যাওয়া উচিত।' তাঁর কথা শুনে পিতা বললেন, 'আমরা তো মানুষই, আবার কী রকম মানুষ হতে বলছো?' পিতার কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, 'যে মানুষ মারা গেলে সবাই কাঁদে আর সে হাসে।'

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১১ মার্চ ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আগের দিন ছিল ১০ মার্চ, বুধবার। সেদিন থেকেই শিবিরের কর্মসূচিকে বানচাল করার হীন ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল রক্তপিপাসু হায়েনারা। ইসলামী শক্তি শিবিরকে কখনই সহ্য করতে পারেনি বাতিলপন্থীরা। ওইদিন (১১ মার্চ) সকাল থেকেই নবাগত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের

www.pathagar.com

জন্য জোর প্রস্তুতি চলছিলো। আর এ অনুষ্ঠানস্থলের অদূরেই শহীদ মিনারে লক্ষ্য করা গেল একটি জমায়েত, যাদের হাতে ছিল লাঠি-সোটা, রামদা, বল্লম, হকিস্টিক ও রড। শিবিরের কর্মসূচিকে বানচাল করার হীন ষড়যন্ত্রে পূর্বপরিকল্পিতভাবে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (ফ-চু), ছাত্রলীগ (মু-হা), বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নসহ অন্যরা তথাকথিত সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে এক সমাবেশের আয়োজন করে। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে তারা ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বারবার গোলযোগ বাধাতে চেষ্টা করে। প্রতিবারই শিবিরকর্মীরা তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। ইতোমধ্যে বাইরে থেকে তারা কয়েকটি বাস বোঝাই করে পাঁচ-ছয় শত সশস্ত্র গুণ্ডা এনে সংবর্ধনাস্থল চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। তাদের হাতে ছিল রামদা, ভোজালি, ছোরা, বল্লম, হকিস্টিক ও লোহার রড। হিংস্র হায়েনারা অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে শিবিরকর্মীদের ওপর। আদিম উন্মত্ততায় শিবিরকর্মীদের নির্মমভাবে ছুরি, বল্লম, রামদা, ভোজালির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে। শুরু হয় তাদের ওপর ইট পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ। আত্মরক্ষার জন্য শিবিরকর্মীরা এদিক সেদিক ছুটতে থাকেন। কিন্তু পৈশাচিক উন্মত্ততায় মেতে ওঠা নরঘাতকরা তাতেও নিরস্ত না হয়ে পিছু ধাওয়া করে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে শিবিরকর্মীদেরকে।

আত্মরক্ষার জন্য অনেকে বিএনসিসি-এর অফিসে ঢুকে। কিন্তু সেখানেও তারা বাঁচতে পারেনি। কিছু শিক্ষক তাদেরকে দেখিয়ে দেয়। জোর করে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে সশস্ত্র ঘাতকরা। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিরস্ত্র কর্মীদেরকে বেধরক পেটানো ও ছুরিকাঘাত করা হয়। ইটের ওপর রেখে ইটের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয় শিবিরকর্মীর মাথা। আহত হয় অর্ধশতাধিক শিবিরকর্মী। নির্বাক প্রশাসনের অনুমতির অভাবে দায়িত্বরত থাকা সত্ত্বেও বাধা দেয়নি পুলিশ। সকাল ১১টায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় আইয়ুব, সাব্বির, মামুনসহ আহত শিবিরকর্মীদের।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অচেতন অবস্থায় নিয়ে আসা আইয়ুব আলীর মুখ হকিস্টিক আর রডের আঘাতে ফুলে এমন হয়ে গেল যে তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর পেটেও ছিল ছুরির আঘাত। শুক্রবার বিকেলে পুত্রের আহত হওয়ার সংবাদ শুনে কুষ্টিয়ার আলমডাঙ্গা থেকে ছুটে এলেন তাঁর পিতা আইজ উদ্দিন। আইয়ুবের অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। অনেক কষ্টে তাকে সরিয়ে নেয়া হল। শোকাহত পিতার কণ্ঠে চিৎকার, 'কী অপরাধ করেছিল আমার ছেলে? আমি ওর মাকে গিয়ে কী বলব? ওর মা তো এ খবর শুনে বাঁচবে না!' রাত ১০টা ৪০ মিনিটে হাসপাতাল থেকে ঘোষণা এল আইয়ুব শাহাদাত বরণ করেছে। তাঁর পিতা আইজ উদ্দিন তখন শহরের অন্য প্রান্তে। তাঁকে ঘিরে রাখা লোকদের কাছে জানতে চাচ্ছিলেন তাঁর ছেলের আঘাত খুব বেশি কি না? তখনও তিনি জানেন না তাঁর বড় ছেলে আইয়ুব আলী আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন, পা বাড়িয়েছেন বেহেশতের পথে, পান করেছেন শাহাদাতের অমিয় সুধা।

শাহাদাতের পর শহীদের মাতা-পিতার প্রতিক্রিয়া

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এসে শহীদ আইয়ুবের অবস্থা দেখে ডুকরে কেঁদে ফেলেন তাঁর পিতা। শোকাহত পিতার কণ্ঠে চিৎকার উঠলো- কী অপরাধ ছিল আমার ছেলের? আমি ওর মাকে গিয়ে কী বলব? ওর মা তো এ খবর শুনে বাঁচবে না!

www.pathagar.com

প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টিতে আইয়ুব

তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো: মোজাম্মেল হক বলেন, আইয়ুব ছিল খুবই মেধাবী ও বিনম্র ছাত্র। সে সকলের সাথে ভালো ব্যবহার করত। আমার সকল ছাত্রকে যদি একটি গোলাপের বাগানের সাথে তুলনা করা হয়, তবে সে বাগানের সেরা গোলাপ ছিল আইয়ুব আলী।

বিভিন্ন মহলের প্রতিক্রিয়া

১৩ তারিখ পত্রপত্রিকায় এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রায় সব কটি রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও বুদ্ধিজীবী মহল বিবৃতি দিয়েছিল। সম্পাদকীয় লেখা হলো নারকীয় হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা উল্লেখ করে। পত্রিকার পাতায়, মিছিলে, প্রতিবাদ সভায় সর্বত্র হত্যাকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে দায়ী রাবি'র ভিসি'র অপসারণ ও যারা এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বর্বর পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছে তাদের শাস্তির দাবি উঠলো, দাবি উঠলো 'খুনিদের ফাঁসি চাই'। দায়সারা গোছের একটি শাস্তি হয়েছিলও বটে কিন্তু আদালতের সেই শাস্তি আর কার্যকর হয়নি।

চেতনায় চির অম্লান শহীদ আইয়ুব আলী

প্রতিবছর ফিরে আসে ১১ মার্চ। সেই সাথে ফিরে আসে আইয়ুব আলীর শাহাদাতের কথা। দেশের তৌহিদী জনতার মনের পর্দায় ভেসে থাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্তে রঞ্জিত মতিহার চত্বর। কাফেলার সৈনিকগণ এই শাহাদাত থেকে শিক্ষা নেয় সামনে এগিয়ে যাওয়ার, থমকে না দাঁড়ানোর। শহীদদের রক্ত রঞ্জিত পথ ধরেই এগিয়ে যাবে এ শহীদি কাফেলা। এটাই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

একনজরে শহীদ আইয়ুব আলী

পিতার নাম : আইজ উদ্দিন মুন্সী
মাতার নাম : পরিজন নেছা বিবি
ভাই-বোন : ৪ ভাই, ৪ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়
ঠিকানা : গ্রাম+পোস্ট- ডাউকি, থানা- আলমডাঙ্গা, জেলা- চুয়াডাঙ্গা
সাংগঠনিক মান : সাথী
সর্বশেষ পড়াশোনা : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ, অনার্স পরীক্ষার্থী
আহত হওয়ার স্থান : বিএনসিসি ভবন, রাবি
আঘাতের ধরন : ইট, ছুরি, রড, রামদা বল্লম ও লাঠি দ্বারা আঘাত
শাহাদাতের তারিখ : ১২ মার্চ, ১৯৮২; রাত ১০:৪৫ মিনিট
শাহাদাতের স্থান : রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগ

www.pathagar.com

০৪

শহীদ আব্দুল জব্বার

এ দুনিয়ার বুকে আল্লাহর কালিমাকে বিজয়ী করার জন্য যুগে যুগে কিছু মানুষ নিজেদের প্রাণ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ার ছোট্ট এই দেশ বাংলাদেশেও এমন মানুষেরা ছিলেন, আছেন। শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কিছু ত্যাগী প্রাণ সবুজ-শ্যামল এই জমিনে ইসলামের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শহীদ আব্দুল জব্বার এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চতুর্থ শহীদ।

ব্যক্তিগত পরিচয় ও শিক্ষাজীবন

তিনি নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার চকময়রাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মো: জমির উদ্দিন। আব্দুল জব্বারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ জন, তার মধ্যে ভাই-বোন ছিল ৬ জন। ভাই-বোনদের মাঝে তিনি ছিলেন সবার বড়। তিনি চকময়রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন চকময়রাম উচ্চবিদ্যালয় থেকে। এরপর নওগাঁ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। তারপর তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। শাহাদাতের সময়ে তিনি রসায়ন বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক মানের দিক দিয়ে তিনি একজন কর্মী ছিলেন।

১৯৮২ সালের ১১ মার্চ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ দিনটি হতে পারতো একটি প্রাণোচ্ছল দিন। এ দিন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাগত ছাত্রদের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল। সংবর্ধনায় যোগদানের জন্য নবাগত ছাত্রদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। নবীন ছাত্রদের হৃদয়ের মণিকোঠায় ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের বিজয় মেনে নেয়ার মতো পাত্র ছিল না ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রী ও ছাত্র ইউনিয়নের দুর্বৃত্তরা। কিন্তু নৈতিক শক্তি ও জনসমর্থনে দুর্বল এসব সংগঠন আদর্শিকভাবে ছাত্রশিবিরের মোকাবেলা করতে সাহস পাচ্ছিল

www.pathagar.com

না। ওদিকে বসে থাকার মতো ধৈর্যও তাদের ছিল না। মরণ কামড় বসাতে হবে ছাত্রশিবিরের ওপর। তাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালায় ছাত্রশিবিরের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। মুহূর্তের মধ্যে হাসি আর আনন্দের পরিবর্তে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয় পুরো ক্যাম্পাস। গুলি, বোমা, চাপাতি প্রভৃতি দিয়ে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর চললো সভ্যতার নৃশংসতম বর্বরতা। মুহূর্তেই থেমে গেল কয়েকটি তাজা প্রাণ। সেদিন দুর্বৃত্তদের আক্রমণের শিকার হয়ে অনেকে দীর্ঘদিন যাবৎ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের মেধাবী ছাত্র আব্দুল জব্বার তাঁদের একজন। ১১ মার্চ, ১৯৮২; ছাত্রলীগ, ছাত্র মৈত্রীর সন্ত্রাসীরা তাঁর বুকের পাঁজরগুলো মর্মান্তিকভাবে থেঁতলে দেয়। অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করালেও পৃথিবীতে এমন কোনো চিকিৎসক ছিলেন না যিনি তাঁকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ করে দিতে পারেন।

দেশের প্রখ্যাত সব চিকিৎসক ব্যর্থ হলেন আব্দুল জব্বারের চিকিৎসায়। আহত আব্দুল জব্বার অসহ্য ব্যথার দরুন পরবর্তীতে আর কোনো পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। শেষে মায়ের ছেলে মায়ের কোলেই প্রত্যাবর্তন করেন। আল্লাহর কাছে যাঁর জন্য উত্তম আবাসস্থলের ব্যবস্থা রয়েছে, ক্ষণিকের এই পৃথিবীর মায়া তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। তেমনি আব্দুল জব্বারকেও ধরে রাখা যায়নি। মায়ের স্নেহ, বাবার ভালোবাসা, পরিবারের বন্ধন, জগতের মায়া সব কিছু ছিন্ন করে ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২ সালে আব্দুল জব্বার পৌঁছে যান তাঁর পরম প্রভুর দরবারে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)।

সাংগঠনিক জীবন

শহীদ আব্দুল জব্বার ছেলেবেলায় সংগঠনের সাথে পরিচিত ছিলেন না। তিনি নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজে থাকাকালে আওয়ামী ছাত্রলীগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন এবং নামাজের প্রতি খুবই যত্নশীল ছিলেন। শহীদ আব্দুল জব্বারের আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল সেটা বোঝা যেত তাঁর উঠা-বসা ও চলাফেরার মাধ্যমে। নামাজ অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন এবং মসজিদে অবস্থান করতেন। বিভিন্ন সময়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যেত। যদিও তিনি তখন আওয়ামী ছাত্রলীগের সমর্থক ছিলন। তিনি সব সময় সমাজের দুস্থ মানুষের কথা বলতেন এবং বেশ চিন্তাভাবনা করতেন আর বলতেন, এই সমাজ পরিবর্তনের জন্য একদল কর্মীবাহিনীর দরকার যারা করতে পারে এই সমাজের পরিবর্তন। তিনি প্রায়ই একটি প্রবাদ বলতেন, 'পৃথিবীটা বড় কঠিন, পৃথিবীকে জানা খুব কষ্ট এবং পৃথিবীর মানুষকে চেনা খুব কঠিন।'

শহীদ আব্দুল জব্বার ১৯৮০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি রানীনগর হামিদ বাড়ির একটি মেসে অবস্থান করতেন। পরবর্তীতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আব্দুল খালেকের আহবানে আমীর আলী হলের ১১৭ নম্বর কক্ষে তাঁর বন্ধুর সাথে অবস্থান করতে থাকেন। তাঁর বন্ধু পূর্বেই সংগঠনের দাওয়াত পেয়ে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছায়াতলে চলে আসেন। শহীদ আব্দুল জব্বার বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

ভর্তি অবস্থায়ও প্রথমদিকে ছাত্রলীগের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধু আব্দুল খালেক সংগঠনের সাথে জড়িত হলেও তাদের মাঝে সম্পর্কের তেমন কোনো অবনতি হয়নি। আব্দুল খালেকের রুমে থাকা অবস্থায় কোনো দিন তিনি তাঁকে শিবিরের কথা বলেননি। হলে আসার পর অন্য কর্মীদের ব্যবহারের ফলে শিবিরের পতাকাতলে আসেন আব্দুল জব্বার। তারপর তিনি বলতেন, 'আমি অনেক আগে থেকে এ ধরনের সংগঠনের কথা চিন্তা করতাম, যারা পারবে সমাজের কুসংস্কারপূর্ণ কাঠামোর পরিবর্তন করে একটি আদর্শবাদী নতুন সমাজ গড়তে। শিবিরের ভেতর এ ধরনের গুণাবলিসম্পন্ন কর্মীবাহিনী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।' যে ছেলেটি এতদিন শিবিরের কথা শুনতে পারতেন না, সে-ই বলতে লাগলেন– এতদিন শিবির থেকে দূরে থেকে বড় ভুল করেছি। সংগঠনে আসার পর থেকে তিনি এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সবার চোখে তিনি অনুপ্রেরণার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কয়েক মাসের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি সবার সাথে বন্ধুসুলভ ভালোবাসা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর মাঝে যে বৈশিষ্ট্যটি বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেটা হচ্ছে নেতৃত্বের প্রতি চরম আনুগত্য ও পরস্পরের প্রতি উদার ও বন্ধুত্বসুলভ আচরণ। তিনি সংগঠন এবং সংগঠনের ভাইদের এত ভালোবাসতেন যে, তাঁর ব্যবহারের মাধ্যমে তা ফুটে উঠত। তবে সেটা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই অকালে ঝরে পড়লেন তিনি। ১৯৮২ সালের ১১ মার্চ একদল উগ্র ও রক্তপিপাসু কুচক্রীমহলের হাতে গুরুতর আহত হন। এই অবস্থায় তিনি প্রায় দশ মাস চরম যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটান। দশ মাসের মধ্যে তিনি প্রায় নয় মাস হলে ছিলেন এবং একমাস মাত্র বাড়িতে ছিলেন। বুকে গুরুতর আঘাত লাগার কারণে চলাফেরা করতে পারতেন না। প্রায় সময় বিছানায় শুয়ে থাকতেন। এ অবস্থায়ও তিনি বাড়ি যাননি, বাড়ি যাওয়ার কথা বললে বলতেন যে, 'বাড়িতে আমার ভালো লাগে না, সংগঠনের ভাইদের দেখে শান্তি পাই।' তাঁর এ কথায় বোঝা যায় সংগঠন এবং সংগঠনের ভাইয়েরা তাঁর কাছে কত আপন ছিল।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

আজও চোখে পানি চলে আসে সেই দিনটির কথা ভেবে। দিনটি হল ১১ মার্চ, ১৯৮২। এ দিনটি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইতিহাসে এক রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। সারাদেশে ছাত্রশিবিরের ওপর ইসলামবিরোধী শক্তি কম-বেশি যতটুকু আক্রমণ বা চড়াও হয়েছিল তাতে শাহাদাতের মত এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। সেইদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামবিদ্বেষী হায়েনাদের আঘাতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের চারজন ভাই শাহাদাত বরণ করেন। তাঁরা হলেন– শহীদ সাব্বির আহমদ, শহীদ আব্দুল হামিদ, শহীদ আইয়ুব আলী ও শহীদ আব্দুল জব্বার। মার্ক্সবাদ আর কমিউনিজমের নামে রাজনীতির কেন্দ্র ছিল রাজশাহীর মতিহার চত্বর। সত্য আদর্শের পতাকাবাহী সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশের অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাদের কার্যক্রম শুরু করেছিল

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালের পর থেকেই। বাতিল আদর্শবাদী শক্তি চেয়েছিল ইসলামের এই পতাকাবাহীদের চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে। কিন্তু তারা জানত না এ দল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা) আদর্শের দল। এ দলকে কোনোদিন থামানো যাবে না। ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নবাগত সংবর্ধনা। আগে থেকেই এ অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য প্রচারকার্য চলছে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়নের দুষ্কৃতিকারীরা হেলালের নেতৃত্বে বাধা দেয় এবং প্রচারপত্র কেড়ে নেয়। প্রোগ্রামকে বাস্তবায়ন করার স্বার্থে শিবিরকর্মীরা ঘটনা সম্পূর্ণ এড়িয়ে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। কিন্তু দুষ্কৃতিকারীরা তাদের ষড়যন্ত্র থেকে পিছু হটেনি বরং শিবিরের রক্তে মতিহারকে রঞ্জিত করার নীলনকশা করে। নবাগত সংবর্ধনার দিন সকাল থেকেই শত শত সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিবিরকর্মী প্রোগ্রাম স্থলে ছুটে আসে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আজ পৌঁছাবে তাদের আদর্শের কথা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-জনতা, শিক্ষক ও কর্মচারীর কর্ণকুহরে। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীসহ অন্যান্য সংগঠনের সমন্বয়ে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করতে থাকে এবং সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা চালাতে থাকে। তবুও শিবিরকর্মীরা সকল হাঙ্গামা এড়িয়ে সুষ্ঠুভাবে তাদের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে থাকেন। ইতোমধ্যেই কয়েকটি বাস বোঝাই করে পাঁচ-ছয় শত বহিরাগত গুণ্ডা এসে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করল। কাল বিলম্ব না করে, যৌথভাবে সন্ত্রাসীরা প্রথমে কেন্দ্রীয় মসজিদের গেটের সামনে উপস্থিত শিবিরকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। পরবর্তীতে তারা প্রোগ্রামস্থলের দিকে এগোতে থাকে। প্রোগ্রামস্থল তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং নিরস্ত্র শিবিরকর্মীদের ওপর সশস্ত্র ক্যাডাররা নির্মমভাবে আক্রমণ চালায়। প্রোগ্রাম পণ্ড হল এবং গোটা ক্যাম্পাসে মাতম উঠল। মতিহারের সবুজ চত্বর ভিজলো শিবিরকর্মীদের তাজা রক্তে। অনেকেই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছুটে চললেন চারদিকে। কেউ কেউ আত্মরক্ষার জন্য মেইন গেটের কাছে বিএনসিসি ভবনে ঢুকে পড়লেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করেও তাঁরা নরপশুদের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারলেন না। নরপশুরা দরজা ভেঙ্গে বিএনসিসি ভবনের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং বেধড়ক ছুরিকাঘাত, লোহার রড আর হকিস্টিক দিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পাষণ্ডরা গোটা বিএনসিসি অফিস কসাইখানায় পরিণত করল। রক্তের ছোপ টেবিল, চেয়ার, মেঝে এবং দেয়ালে লাগল। মাথার নিচে ইট রেখে আরেকটা ইট দিয়ে শিবিরনেতা আব্দুল হামিদের মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। আহত হলেন শিবিরের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী। পুলিশ প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ছিল। কিন্তু 'কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেই' এই অজুহাতে তারা হামলাকারীদের প্রতিহত করতে আসেনি। এ হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হন সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব ও জব্বার ভাই। তাঁদেরকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই লোমহর্ষক ঘটনার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আহতদের আত্মীয়-

www.pathagar.com

স্বজন হাসপাতালে এসে ভিড় জমায়। এদিকে সাব্বির, হামিদ, আইয়ুব হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। অন্য আহত ভাইয়েরা অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। কিন্তু আব্দুল জব্বার তখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। তিনি সামান্য হাঁটাহাঁটি ও প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারলেও সর্বদা ক্ষত স্থানের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে থাকতেন। কিন্তু এভাবে আর কতকাল? তিনি আর বেশি দিন পৃথিবীর বুকে অবস্থান করলেন না। অবশেষে দীর্ঘ ১০ মাস যন্ত্রণা ভোগের পর ২৮ ডিসেম্বর তাঁর নিজ বাড়িতে ১১টা ৪০ মিনিটে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন এবং মহান পালনকর্তার সান্নিধ্যে হাজির হলেন। জান্নাতের পথে পা রাখলেন শহীদ আব্দুল জব্বার।

শহীদ আব্দুল জব্বারের আহত অবস্থার একটি স্মরণীয় ঘটনা

আহত অবস্থায় হলে থাকাকালে তাঁর বন্ধু আব্দুল খালেক তাঁর দেখাশোনা করতেন। একদিন তাঁর বন্ধু সংগঠনের কাজে বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি রুমে এসে দেখেন আব্দুল জব্বার রুমে নেই। রুমের এক বড় ভাইকে জিজ্ঞাসা করা হলো আব্দুল জব্বার কোথায়? তিনি জবাব দিলেন– আব্দুল জব্বারকে কিছুক্ষণ আগে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তাঁর বুকের ব্যথার কারণে চলাফেরা করতে পারত না, তাই সবাই উদ্বিগ্ন। বন্ধু খালেক ও আরো কয়েকজনে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কোথাও তাঁকে পাওয়া যায়নি। তখন রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। তারা খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে মসজিদে গেলেন এবং দেখতে পেলেন অন্ধকারের ভেতর মসজিদের এককোণে দুই হাত তুলে বসে ক্রন্দন করছেন তিনি। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছেন এই বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তো অপরাধ করিনি, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি, কেন তারা আমার এ অবস্থা করলো? না, আমার অপরাধ আমি ঈমান এনেছি এবং ইসলামী সংগঠনের সাথে যুক্ত হয়েছি। হে আল্লাহ! তুমি এই সংগঠনকে শক্তিশালী কর। তুমি এই জমিনে তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করে দাও এটাই আমার কামনা আর এটাই বাসনা।' এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় তিনি দ্বীনকে কতটা ভালোভাবে বুঝেছিলেন এবং দ্বীনের প্রতি তাঁর কতটা ভালোবাসা।

আর একদিনের ঘটনা– শহীদ আব্দুল জব্বার বুকের ব্যথায় ছটফট করছেন, তখন তাঁকে তাঁর বন্ধু বললেন, তোর খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না? তখন তিনি উত্তর দেন, কষ্ট নারে কষ্ট না, এই তো আমার আত্মতৃপ্তি। আমার আত্মতৃপ্তি এই জন্য যে, আমি মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। ইসলামের দুশমনরা আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এতো আমার চাওয়া, এতো আমার পাওয়া। শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য, তাইতো আমার কামনা, আমার বাসনা ছিল। এইভাবে কঠিন যন্ত্রণার মাঝে জীবন অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু কোনো দিন তাঁর মাঝে কোনো হতাশা দেখা যায়নি। শহীদ আব্দুল জব্বার ভাই সকল ইসলামী কর্মী ভাইয়ের আদর্শের প্রতীক হয়ে আছেন।

জানাজা ও দাফন

পরিবারের আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল আব্দুল জব্বারের বিয়োগব্যথায় চকময়রামের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে রাজশাহী ও

www.pathagar.com

নওগাঁর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শহীদের সাথীরা এবং শোকাভিভূত জনতা শহীদের বাড়িতে এসে ভিড় করে। সেখানে জানাজা নামাজ শেষে চকময়রামপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে আব্দুল জব্বারকে দাফন করা হয়।

শহীদ হওয়ার পূর্বে তাঁর স্মরণীয় বাণী

ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিক শহীদ আব্দুল মালেক সমাজের পরিবর্তন নিয়ে ভাবতেন। অন্যায় এবং কুসংস্কারপূর্ণ সমাজকে কিভাবে পরিবর্তন করা যায় সেই ভাবনায়-ই লিপ্ত থাকতেন। আর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল তারুণ্যনির্ভর দল বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরই এ ঘুণে ধরা সমাজে পরিবর্তন আনতে পারবে। শহীদ আব্দুল জব্বার কবি নজরুলের "আমার যাবার সময় হলো দাও বিদায়....." এই গানটি বেশি গাইতেন। বন্ধুরা তাঁকে এই গান গাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, 'আর কতদিন বাঁচবো! কখন যে ঝরে পড়ব কেউ জানে না।'

পারিবারিক কাজে সহযোগিতায় আব্দুল জব্বার

শহীদ আব্দুল জব্বারের পরিবারের প্রধান পেশা ছিল কৃষি। তিনি পড়াশোনায় যেমন নিয়মিত ছিলেন, তেমনি পরিবারের সকল কাজে সাহায্য করতেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি এলে নিজ হাতে শাক-সবজির চাষ করতেন। পারিবারিক কৃষিকাজে কৃষকদের সাথে কাজ করতেন, আর প্রচুর মাছ ধরতেন।

ছোট ভাইয়ের উদ্দেশ্যে শহীদ আব্দুল জব্বারের চিঠি

Dear জাফর,

স্নেহাশীষ রইলো। আশা করি তোমরা ভালোই আছো। তোমাদের ভর্তির নোটিশ রাবি দিয়েছে। তুমি তোমার কাগজপত্র তৈরি করে এবং টাকা-পয়সা নিয়ে আসবে অথবা খুব তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবে। আর তুমি যে বিষয়ে ভর্তি হইবে তা ঠিক করিয়া আসিও। ৫-১২-১৯৮১ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত জমা দেয়ার শেষ তারিখ। এই মাসের মধ্যে জমা দিলে বেশি বেগ পাইতে হইবে না। আর জিলু কোথায় এবং কী বিভাগে ভর্তি হইতেছে জানাইও। আর বাড়িতে থেকে তোমার পড়ার প্রতি মন আসে না তাই না? ভালো করে পড়িও এবং এই বৎসর প্রতিযোগিতা হইবে। জাহানারার পড়ার প্রতি তুমি নজর রাখিও। তার পড়াশুনা কেমন হচ্ছে এবং জাহাঙ্গীরের পরীক্ষা কবে? দৈনিক বার্তায় এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এই সংবাদ রাশিদুলকে দিবে কেমন? আমি আমার একটা Friend-এর নিকট আমীর আলী হলের ১১৭ নম্বর রুমে অবস্থান করছি। আমার এই ঠিকানায় পত্র পাঠাইও। আবাদ এবং বাড়ির পরিবেশ কেমন জানাইও। মা-আব্বা এবং স্যারকে আমার সালাম দিবে এবং ছোটদের প্রতি রইলো স্নেহাশীষ। সবার প্রতি রহিল সালাম। দোয়া কামনা করে শেষ করছি।

ইতি

মো: আ: জব্বার

১১৭, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাবি

(বি:দ্র: আমার জন্য এই মাসে টাকা না পাঠাইলে পত্র পাওয়া মাত্র টাকা পাঠাইও।

www.pathagar.com

পরীক্ষার জন্য ডিজাইন এবং জামা তৈরি করা হইতেছে না। জাহানারার একটা বড় এবং ভালো সাইজের কামিসের মাপ পাঠাও। নানী কেমন আছে জানাইও।)

শাহাদাতের পর শহীদের পিতার প্রতিক্রিয়া

শহীদ আব্দুল জব্বারের পিতা মো: জমির উদ্দিন ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও আল্লাহভীরু মানুষ। তাই তিনি পুত্রকে হারিয়ে ধৈর্যহীন না হয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, 'আমার ছেলে ইসলামের পথে শহীদ হয়েছে এতে আমার কোন দুঃখ নেই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।' পরবর্তীতে শোকাহত বাবা পুত্রশোকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি প্যারালাইজড হয়ে যান। অবশেষে পুত্রশোকে তিনিও পরলোকগমন করেন।

মায়ের প্রতিক্রিয়া

বড় ছেলের শাহাদাত বরণের সাথে সাথে শহীদ জননী সকিনা বিবি কান্না শুরু করে দেন। অনেক কষ্টে তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করেন তিনি যেন তাঁকে একজন শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন।

ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া

শহীদ আব্দুল জব্বারের ছোট ভাই জিল্লুর রহমান বলেন, সংগঠনের নেতাকর্মীরা যেন ইসলামী আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ থাকে। এমন কোনো কাজ করা ঠিক নয় যা সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ন করবে।

দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর আগে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে হেরা গুহায় যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছিল, সেই জ্যোতিকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য সেইদিন থেকেই অপচেষ্টা চলছে। কিন্তু ইসলামের ত্যাগী কিছু সৈনিকের কারণে সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এতে প্রাণ দিতে হয়েছে অনেককেই। শহীদ আব্দুল জব্বার তাঁদের অন্যতম। তিনি ইসলামের জন্য প্রাণ দিয়ে আমাদের অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়ে আছেন। আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক উৎসাহ পেতে পারি।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ আব্দুল জব্বার

নাম : মো: আব্দুল জব্বার
পিতার নাম : মো: জমির উদ্দিন
মায়ের নাম : সকিনা বিবি
পড়াশোনা : রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জীবনের লক্ষ্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া
সাংগঠনিক মান : কর্মী
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- চকময়রাম, ডাকঘর- ধামইরহাট, থানা- ধামইরহাট, জেলা- নওগাঁ
শাহাদাতের পূর্বে অবস্থান : ১১৭, সৈয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আহত হওয়ার স্থান : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের অজুখানা
আঘাতের ধরন : ইট, ছুরি, রড ও হকিস্টিক
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ (ক–চু), ছাত্রলীগ (মু–হা), ছাত্র মৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন
আহত হওয়ার তারিখ : ১১ মার্চ, ১৯৮২
শহীদ হওয়ার তারিখ : ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮২
শাহাদাতের স্থান ও সময় : নিজ বাড়িতে, ১১টা ৪০ মিনিটে
ভাই-বোন : ৮ জন
ভাইবোনদের মাঝে অবস্থান : বড়
পরিবারের মোট সদস্য : ১০ জন

www.pathagar.com

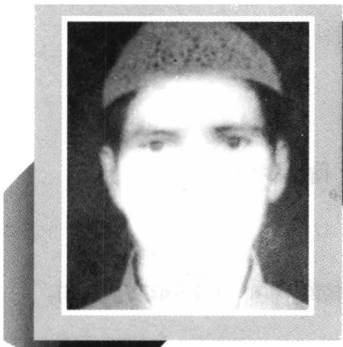

০৫

শহীদ খুরশীদ আলম

চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে ফটিকছড়ি, নাজিরহাটের প্রতিটি মানুষ আজও আওয়ামী সন্ত্রাসের ভয়াবহতার কথা স্মরণ হলেই শিউরে ওঠেন। খুন, ডাকাতি, অপহরণ, নারীর সম্ভ্রমহানি, বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি লোমহর্ষক কর্মকাণ্ড এই জনপদে ছিল নিত্যদিনের তুচ্ছ ঘটনা। শান্তির এই জনপদকে আওয়ামী সন্ত্রাস মৃত্যুপুরীতে পরিণত করেছিল। ছেলেহারা মা, ভাইহারা বোন, সন্তানহারা পিতার করুণ আহাজারি এই জনপদের আকাশ-বাতাসকে ভারী করে রেখেছে। '৮৫ থেকে '৯১ পর্যন্ত শুধু এ দু'এলাকায় ইসলামী ছাত্রশিবির ও জামায়াতের ১৭ জন নেতাকর্মী খুন হয়েছেন। আর এ বাকশালী চক্রের সন্ত্রাসের শিকার হয়ে যিনি প্রথম শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন, তিনি হলেন শহীদ খুরশীদ আলম।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

শহীদ খুরশীদ আলম চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার ধলই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইসলাম মাস্টার এবং মা মরিয়ম খাতুন।

সেদিন যা ঘটেছিল

শাহাদাতের সময় শহীদ খুরশীদ আলম হাটহাজারী থানার কাটিরহাট মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। রেওয়াজ অনুযায়ী প্রত্যেক বছরের ন্যায় সেবারও পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) দিবসের মাহফিল আয়োজন করা হয়েছিল হাটহাজারী থানার ফরহাদাবাদ হাইস্কুল ময়দানে। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বায়তুশ শরফের পীর মাওলানা আব্দুল জব্বার। কিন্তু সন্ত্রাস যাদের রক্তের সাথে মিশে আছে তাদের নিকট এ মাহফিল ছিল পীড়াদায়ক। পীর সাহেবও রক্ষা পেলেন না আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে। পীর সাহেব মাহফিলের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম শহর থেকে কাটিরহাটে পৌঁছলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গাড়ি থামিয়ে গতিরোধ করে। দুষ্কৃতিকারীরা পীর সাহেবকে হত্যার চেষ্টা চালায়। আল্লাহর রহমতে লোকজনের হস্তক্ষেপে জীবনে রক্ষা পেয়ে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন তিনি।

শাহাদাতের ঘটনা

পীর সাহেবের রক্ষা পাওয়া মেনে নিতে পারেনি আওয়ামী-ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। খুনের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তারা। সে সময় শিবিরকর্মী খুরশীদ আলম কাটিরহাট থেকে মনিয়া পুকুরস্থ বাড়ি থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। খুরশীদ আলমকে দেখে খুনের নেশা

www.pathagar.com

চেপে বসে সন্ত্রাসীদের মাথায়। হায়েনার দল কাপুরুষোচিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। উপর্যুপরি ছুরি ও লাঠির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় নিরপরাধ খুরশীদের দেহকে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন খুরশীদ। এতেও থেমে থাকেনি পাষণ্ডরা। নরপিশাচরা খুরশীদের জিহ্বা টেনে বের করে উল্লাসে মেতে উঠে। এমনকি খুনিচক্র তাঁর লজ্জাস্থান ইটের আঘাতে থেঁতলে দেয়। এরপর তাঁকে মৃত ভেবে রাস্তার পাশে জমিতে ফেলে রেখে সরে পড়ে। এলাকার লোকজন ছুটে এসে রক্তাক্ত নিস্তেজ খুরশীদকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করেন খুরশীদের জ্ঞান ফিরাবার। শিবিরকর্মীরা নিজেদের রক্ত দিয়ে প্রিয় ভাইটিকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসেন। কিন্তু না, ক্ষণিকের পৃথিবীর মায়া পেছনে ফেলে রাত ২টা ১৫ মিনিটে খুরশীদ পৌঁছে যান তাঁর প্রিয় রবের সান্নিধ্যে (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

খুরশীদ আলম ভাই আর নেই। আর কোনোদিন তিনি আসবেন না এই পৃথিবীতে, কিন্তু থেমে থাকেনি খুনিরা। এরপর থেকে একের পর এক খুন করে চলছে উন্মাদের মতো। কিন্তু তারা জানে না খুরশীদ আলম যে পথের সূচনা করে গেলেন সে পথের পথিকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলবে এটাই স্বাভাবিক। খুন আর সন্ত্রাস সে গতিকে থামাতে পারবে না কখনো।

শহীদ খুরশীদ আলমের মায়ের বক্তব্য

'আমার ছেলে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও খুনিরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁর একটাই অপরাধ ছিল– সে নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, দ্বীনি ইলম শিক্ষা করত। আমি জানি না আমার ছেলের খুনিদের সঠিক বিচার দুনিয়ায় হবে কি না। কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সঠিক বিচার পাবই। আমি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, যেন খুনিদের হাতে আমার মতো আর কোনো মায়ের বুক খালি না হয়।'

এক নজরে শহীদ খুরশীদ আলম

নাম : মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
পিতা : মো: ইসলাম মাস্টার
পরিবারের মোট সদস্য : ৭
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : আলিম পরীক্ষার্থী
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : কাটিরহাট এম. আই সিনিয়র মাদ্রাসা
জীবনের লক্ষ্য : জামায়াত-শিবিরকে ভালোবেসে, এ সংগঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা
আহত হওয়ার স্থান : শাহাজাহান শাহের মাজার গেটের দক্ষিণে, সোনাইবুকল, বাদামতল, হাটহাজারী
আঘাতের ধরন : জিহ্বা কেটে ফেলা, দা, ছুরি, কিরিচ দিয়ে শরীরে বিভিন্ন অংশে মারাত্মক আঘাত
শাহাদাতের স্থান : কাটিরহাট
শাহাদাতের তারিখ ও সময় : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫; রাত ২টা ১০ মিনিট
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রসেনা, (সেনা ও ছাত্রলীগের তৈয়র চক্র) যৌথভাবে
শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

www.pathagar.com

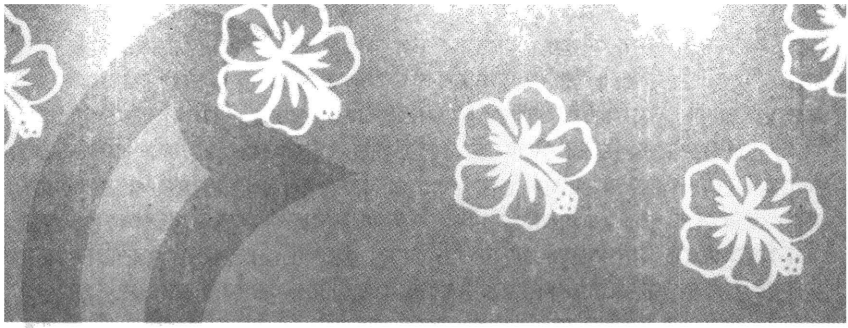

আল কুরআনের সমাবেশের ৫ শহীদ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্টের ধৃষ্টতামূলক সিদ্ধান্তের কারণে মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা ১৯৮৫ সালের ১১ মে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সে সমাবেশে যোগ দিতে চারদিক থেকে লোকেদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়।

১১ মে, ১৯৮৫; চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঈদগাহ : সমাবেশের প্রেক্ষাপট

কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয় কুরআন বাজেয়াপ্ত করার জন্য। অভিযোগে বলা হয় কুরআনের অনেক আয়াতে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে দেয়ার কথা আছে। কলকাতা হাইকোর্ট মামলাটি গ্রহণ করে। এ খবর শুনে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানরা কুরআন বাজেয়াপ্ত করার অপমানজনক উদ্যোগে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বাংলাদেশের তৌহিদী জনতাও বিক্ষোভে-বিক্ষোভে সারাদেশ উত্তাল করে তোলেন। সারা দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মত চাঁপাইনবাবগঞ্জের মুসলমানরাও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। প্রতিবাদ জানানো ছাড়া উপায় নেই। চাঁপাইনবাবগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জনাব হোসাইন আহমেদ সাহেব ডাক দিলেন প্রতিবাদ সভার।

যা ঘটেছিল সেদিন

সমাবেশের ৩ ঘণ্টা আগে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সভা উদ্যোক্তাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। চাপ প্রয়োগ করে সভা বাতিলের জন্য কাগজে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করলেন। বেলা তখন ১১টা, সভা শুরু হওয়ার আর বাকি ৩ ঘণ্টা। সরকারি মাইকে ঘোষণা আসতে লাগল সভা বাতিলের। দু'তিন ঘণ্টায় আর কতটুকু খবর ছড়াতে পারবে সরকার। নবাবগঞ্জের আশপাশ, শিবগঞ্জ, গোদাগাড়ী, কানসাটসহ বিশ-ত্রিশ মাইল দূরের লোকজন পূর্বেই এ সভার দাওয়াত পেয়েছিল, তারা সবাই প্রস্তুতি নিয়েছে সভায় যোগদানের।

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট সময়ে মিছিলে-মিছিলে ছেয়ে গেল সভাস্থল। পুলিশ সুপারের পক্ষে আদেশ দেয়া ছিল সহজ কাজ। কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ঠেকানো এত সহজ কাজ ছিল না। সরকারি মাইকিং-এর হলো উল্টো প্রতিক্রিয়া, শহর আর আশপাশ এলাকা থেকেও ততক্ষণে কয়েক হাজার মুসলমান এসে ঈদগাহ ময়দানে সমবেত হয়েছেন। তাছাড়া ছিল দূর-দূরান্ত থেকে আসা আরো হাজার হাজার মানুষ। এদের রুখতে পারে সে শক্তি কোথায়? জনতার এ সমাবেশের খবর পেয়ে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান মোল্লার নেতৃত্বে ছুটে এলো পুলিশ। পুলিশের এক কথা, এখনই ময়দান খালি করে সবাইকে চলে যেতে হবে। কুরআনপ্রেমিক জনতা কুরআনের অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা প্রকাশের একটু সুযোগ চাইল। সভা আহ্বানকারী আলেমগণ এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমরা উপস্থিত জনতাকে সভা না করার ঘোষণাটি জানিয়ে দেই, আর একটু দোয়া করে চলে যাই। পাষণ্ড ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা তাও সইতে পারলো না। দম্ভ করে চেঁচিয়ে বলল, এ মুহূর্তেই এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। নইলে গুলির আদেশ দেবো, শালা মৌলবাদীদের সাফ করে দেবো। উত্তেজিত আবেগাকুল জনতা চলে গেলেন না, তারা জানিয়ে দিলেন, গুলির ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করা মানেই আল কুরআনের অপমান। আমরা এ স্থান ত্যাগ করবো না।

কুখ্যাত কর্তাব্যক্তিটি নির্দেশ দিলেন গুলি চালানোর। কোন্ অপরাধে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়া হল? তা কেউ জানে না, বিনা উস্কানিতে এক নাগাড়ে গুলি চললো পনের মিনিট। গুলিতে একজন ঢলে পড়তে না পড়তেই আরেকজন শিকার হতে লাগল। জনতা দিগ্বিদিক ছুটতে লাগল। ছুটন্ত লোকজনের পিছু ধাওয়া করে শহরের অভ্যন্তরেও গুলি চালাতে থাকে খুনিরা। টুপি, পাঞ্জাবি আর দাড়ি দেখলেই নির্মমভাবে তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। যেন ভারতে নিরীহ মুসলিমরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আক্রান্ত হয়েছে– এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো চাঁপাইনবাবগঞ্জে!

www.pathagar.com

০৬

শহীদ আবদুল মতিন

আল কুরআনের সাথে মুমিনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কোনো প্রকার লোভ-লালসা, হুমকি, ষড়যন্ত্র এই সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারে না। শহীদ আবদুল মতিন এমনই এক মুমিন। প্রতিবেশী দেশ ভারতে 'সাম্প্রদায়িক ও ভারত-বিরোধী বক্তব্যের দায়ে' আল-কুরআন বাজেয়াপ্ত করার আদেশ চেয়ে দায়ের করা একটি মামলা গ্রহণ করেন আদালত। আদালতের এমন সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি এই বাংলাদেশ থেকে। এবং বাংলাদেশের কুরআনবিরোধী, মানবতাবিরোধীদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। সে সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন শহীদ আবদুল মতিন।

পরিচিতি

চাঁপাইনবাবগঞ্জের দ্বারিয়াপুর গ্রামে ১৯৬৯ সালে এক ধার্মিক পরিবারে শহীদ আবদুল মতিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নূর মোহাম্মদ আর মায়ের নাম মোসাম্মাৎ মাজেদা বেগম। শহীদ আবদুল মতিনরা ছিলেন সাত ভাই এক বোন। ভাইদের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল ষষ্ঠতম।

শিক্ষাজীবন

শহীদ আবদুল মতিনের শিক্ষাজীবনের হাতে খড়ি হয় পরিবারে। এরপর তাঁকে দ্বারিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। এখান থেকে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পাস করেন। পরে তাঁকে কাশিমপুর এ.কে ফজলুল হক উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন। স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আবদুল মতিনের প্রাণোচ্ছল পদচারণা ছিল। তিনি খুব সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে পারতেন। স্কুলের শিক্ষকরা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন।

সাংগঠনিক জীবন

ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁর ভগ্নিপতির দাওয়াতের মাধ্যমে তিনি সংগঠনের পতাকাতলে আসেন। অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি সংগঠনের কর্মী পর্যায়ে উন্নীত হন। শাহাদাতের সময় তিনি সংগঠনের 'সাথী প্রার্থী' ছিলেন।

www.pathagar.com

জীবনযাত্রা

আজীবন শান্তশিষ্ট ও ধর্মানুরাগী শহীদ কখনো সালাত আদায়ের কথা ভুলে যাননি। আজানের সময় হলে বন্ধু মাহফুজ ও মতিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত কার আগে কে আজান দেবে। মা যে আদেশ দিতেন তা একবাক্যে মেনে নিতেন। প্রতিবেশীর বিপদ-আপদে ছুটে যেতেন সবার আগে।

শাহাদাত

আবদুল মতিন সেদিন মিছিলের অগ্রভাগেই ছিলেন। পুলিশের হুমকি-ধমকিতেও কিশোর আবদুল মতিন ভয় পাননি। ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাননি। কুরআনের মর্যাদা রক্ষার শপথ নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন যিনি প্রথম আঘাত পেয়েছিলেন তিনি হলেন কিশোর আবদুল মতিন। গুলিবিদ্ধ আবদুল মতিনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন। শহীদের আন্দোলনের আরো ৪ জন সহযোদ্ধা ছাড়াও এই হামলায় তৌহিদি জনতার মধ্য থেকেও তিনজন শহীদ হন। তারা হলেন– শহীদ আলতাফুর রহমান (কৃষক), শহীদ মোখতার হোসেন (রিকশাচালক) ও শহীদ নজরুল ইসলাম (রেল শ্রমিক)। এ শহীদি ঘটনা প্রমাণ করে, কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় সেদিন ছাত্রশিবিরের সাথে সাধারণ জনগণও তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল।

জানাজা ও দাফন

শহীদ আবদুল মতিনের একাধিক নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ নিজ গ্রামে নামাজে জানাজা শেষে বাড়ির অদূরে নির্জন কবরগাহে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। শহীদ আবদুল মতিন চলে গেছেন না-ফেরার দেশে। আজ পৃথিবীতে কুরআনের অপমান হলে আবদুল মতিন আসবেন না সত্য, তবে তিনি যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সে পথে চলে জীবন দেয়ার মত মানুষের আজ অভাব নেই এই বাংলাদেশে।

শহীদের মায়ের প্রতিক্রিয়া

শহীদ হওয়ার পর শহীদের মা 'আল্লাহর দেয়া জীবন তিনি তাঁর নিজের পথে নিয়ে গেছেন' বলে ধৈর্য ধারণ করেন। নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াত করে তাঁর শাহাদাত কবুলের জন্য আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করেন। এখনও ১১ মে এলে কলিজার টুকরোকে ভুলে যেতে কষ্ট হয় মা মোছাম্মাৎ মাজেদা খাতুনের। তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করেন আর ছেলের জন্য দায়া করেন।

www.pathagar.com

এক নজরে শহীদ আবদুল মতিন

নাম : আবদুল মতিন

মাতার নাম : মোসাম্মাৎ মাজেদা বেগম

পিতার নাম : নূর মোহাম্মদ

সাংগঠনিক মান : সাথী প্রার্থী

সর্বশেষ পড়াশোনা : দশম শ্রেণী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : কাশিমপুর এ.কে ফজলুল হক উচ্চবিদ্যালয়

শখ : ছোট ছেলেদের নিয়ে সংগঠন করা

আহত হওয়ার স্থান : ঈদগাহের দক্ষিণ গেট

শহীদ হওয়ার স্থান : রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

যাদের আঘাতে শহীদ : পুলিশের গুলিতে

আঘাতের ধরন : গুলি

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মে, ১৯৮৫

স্থায়ী ঠিকানা : দ্বারিয়াপুর, চৌহদ্দিটোলা, নবাবগঞ্জ

ভাই-বোন : ৭ ভাই, ১ বোন

ভাইদের মধ্যে অবস্থান : ৬ষ্ঠ

www.pathagar.com

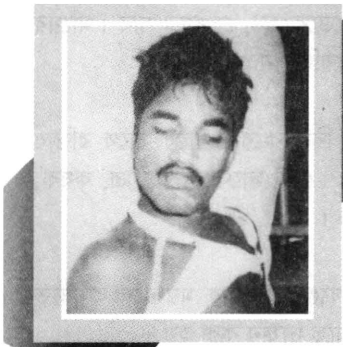

০৭

শহীদ রাশিদুল হক রশিদ

পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে এ যাবৎ অসংখ্য মানুষ দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাতে প্রবেশ করেছে। তাদের মধ্যে যাঁরা আখিরাতের জবাবদিহির ব্যাপারে সচেতন ছিলেন, তাঁরা দুনিয়াকে ফুলশয্যা হিসেবে গ্রহণ করেননি। বরং এমন কিছু নজির রেখে গেছেন যা পরবর্তী মানুষের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে। তেমনই এক নজির হচ্ছেন শহীদ রাশিদুল হক। ১১ মে, ১৯৮৫ কুরআনের সম্মান রক্ষার্থে নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে গেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের মাটিতে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শহীদ রাশিদুল হকের পৈতৃক নিবাস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নামোশঙ্করবাটিতে। সেখানে তিনি ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম রফিকুন্নেছা, পিতার নাম মো: তৈমুর রহমান, ভাইবোনের সংখ্যা ৭ জন। ৫ ভাইয়ের মধ্যে তাঁর অবস্থান তৃতীয়।

শিক্ষাজীবন

শহীদ রাশিদুল হক শাহাদাতের সময়ে নামোশঙ্করবাটি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

সংগঠনে আগমন

শহীদ রাশিদুল হক ছোটকাল থেকে অত্যন্ত বিনয়ী ও মার্জিত স্বভাবের ছিলেন। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। ইসলামী মাহফিল ও জলসায় তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল। নামোশঙ্করবাটি উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন। শাহাদাতকালীন সময়ে তিনি সংগঠনের কর্মী ছিলেন।

শহীদ হওয়ার ইচ্ছা

শহীদ রাশিদুল হক সর্বদা হওয়ার শহীদ ইচ্ছা পোষণ করতেন। একবার তিনি তাঁর মাকে বললেন, মা আমার জন্য দোয়া কর। আমার যেন সাধারণ মৃত্যু না হয়। আল্লাহ যেন আমাকে শহীদি মৃত্যু দেন। শহীদ হওয়ার দিন তিনি তাঁর মাকে বললেন, ভারতে

www.pathagar.com

কুরআন বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে হুজুররা সমাবেশ ডেকেছেন, সেখানে যাব। মায়ের জোর অনুরোধেই শুধু হালকা খাবার খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন।

যেভাবে শহীদ হলেন

পুলিশের ছোড়া গুলি এসে রাশিদুল হকের তলপেট বিদ্ধ করে। সাথে সাথে রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়েন রাশিদুল হক। শহীদ হলেন তিনি। সেই সাথে তরুণ ছাত্র, কৃষক, দিনমজুরসহ মোট ৮ জন লোক শাহাদাত বরণ করেন।

জানাজা ও দাফন

শহীদ রাশিদুল হকের নামাজে জানাজা চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে নামোশঙ্করবাটি গ্রামে নিজ বাড়ির কাছে দাফন করা হয়।

জীবনচিত্র

ব্যক্তিজীবনে শহীদ রাশিদুল হক বন্ধুবৎসল ছিলেন। হৃদয়ের উদারতা আর কণ্ঠের সুমিষ্টতা দিয়ে নিমিষেই যে কাউকেই আপন করে নিতে পারতেন। তাঁর শরীরের গঠন লম্বা-চওড়া, সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি। পোশাকের ব্যাপারে কোনো জাঁকজমক, বিলাসিতা তাঁর মধ্যে ছিল না।

এক নজরে শহীদ রাশিদুল হক

নাম : রাশিদুল হক
মাতার নাম : রফিকুন্নেছা
পিতার নাম : মো: তৈমুর রহমান
জন্ম : ১৯৬৯ সাল
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : দশম শ্রেণী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : নামোশঙ্করহাট উচ্চবিদ্যালয়
আহত হওয়ার স্থান : ঈদগাহের পশ্চিম দিকে
শহীদ হওয়ার স্থান : রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন : পুলিশের গুলি
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মে, ১৯৮৫
স্থায়ী ঠিকানা : নামোশঙ্করবাটি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ভাই-বোন : ৫ ভাই, ২ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : তৃতীয়
যাদের আঘাতে শহীদ : পুলিশ

www.pathagar.com

০৮

শহীদ শীষ মোহাম্মদ

পৃথিবীতে যাঁরা আল কুরআনকে ভালোবাসেন, কুরআন আল্লাহর যে বাণী ধারণ করে, সেই বাণীকে দুনিয়ার জমিনে কায়েম করতে চেষ্টা করেন, তাঁদের জন্য আল্লাহ সর্বোচ্চ প্রতিদান বরাদ্দ করে রেখেছেন। শহীদ শীষ মোহাম্মদও তেমনি একজন– আল্লাহ যাঁকে সর্বোচ্চ প্রতিদান দিয়েছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

শহীদ শীষ মোহাম্মদ ১৯৭০ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার শাহবাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম রেফুন বেগম, বাবার নাম আলহাজ্ব ইসারুদ্দিন মোল্লা। তাঁরা ছিলেন ৫ ভাই ও ৩ বোন। ভাইদের মধ্যে শহীদ শীষ মোহাম্মদ ছিলেন দ্বিতীয়।

শিক্ষাজীবন

শহীদের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি শুরু হয় পরিবারের মধ্যে। এরপর ত্যাঁকে ধোবরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়। এখানে তিনি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পরে নবাবগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখানে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করাকালে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

সাংগঠনিক জীবন

১৯৮৩ সালের এক পড়ন্ত বসন্তের বিকেলে শহরতলির নোয়াগোলা মহল্লার মসজিদে তাঁর পরিচয় ঘটে সংগঠনের সাথে, শিবিরের এক দাওয়াতী অনুষ্ঠানে। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান মেহমানের অনুপ্রেরণায় তিনি সংগঠনে আসার প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি সেই মেহমানকে বলেছিলেন, 'আমাকে তো এর আগে এভাবে ইসলামের কথা কেউ বলেনি, আপনি যখন বললেন, তখন আজকে থেকেই কর্মী হওয়ার কাজ শুরু করব ইনশাআল্লাহ।'

www.pathagar.com

যেভাবে শহীদ হলেন

শীষ মোহাম্মদের বুকের মাঝখানটায় বুলেট বিদ্ধ হয়। ঈদগাহের সামনের রাস্তায় শীষ মোহাম্মদকে মারাত্মকভাবে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, তিনি বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। অবশেষে ঘটনার পরদিন তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

জানাজা ও দাফন

শহীদ শীষ মোহাম্মদের জানাজার নামাজ তাঁর নিজ গ্রাম শাহবাজপুরে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে নিজ গ্রামের আমবাগানে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের ঘটনা নিঃসন্দেহে শহীদদের জীবনের এক বড় পাওয়া। আল্লাহতায়ালা স্বয়ং শহীদদের প্রতিদান দেবেন। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আল্লাহর প্রিয় বান্দারাই এই সৌভাগ্যের ভাগীদার হন। যাঁরা আল্লাহর পথে শহীদ তাঁরা কখনোই মৃত্যুবরণ করেন না বরং তাঁরা মানুষের হৃদয়ে যুগ যুগ ধরে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন।

একনজরে শহীদ শীষ মোহাম্মদ

নাম : শহীদ শীষ মোহাম্মদ
মায়ের নাম : রেফুন বেগম
বাবার নাম : মো: ইসারুদ্দীন মোল্লা
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : নবম শ্রেণী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : নবাবগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা
আহত হওয়ার স্থান : রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১২ মে, ১৯৮৫
যাদের আঘাতে শহীদ : পুলিশ
আঘাতের ধরন ও স্থান : বুলেট, বুকে সামনের দিক থেকে
স্থায়ী ঠিকানা : সন্ন্যাসী, সাহবাজপুর, কানসাট, শিবগঞ্জ
ভাই-বোন : ৭ ভাই, ৩ বোন
ভাইদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়

www.pathagar.com

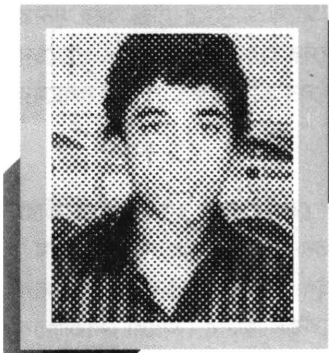

০৯

শহীদ মুহাম্মদ সেলিম

দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'মানুষ'। সেই মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম একজন– শহীদ মুহাম্মদ সেলিম– যিনি আল-কুরআনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জান কুরবানি করেছিলেন মানুষের মুক্তির জন্য।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মহানন্দা নদীর তীরঘেঁষা চাঁপাইনবাবগঞ্জের আরামবাগ গ্রামে বাংলাদেশের আর দশটি সাধারণ পরিবারের মতো একটিতে ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ। তাঁর পুরো নাম মোহাম্মদ সেলিম রেজা। মায়ের নাম কুলসুম বেগম, বাবার নাম মোজাম্মেল হক। ৬ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

শিক্ষাজীবন

গ্রামের মক্তব দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনের শুরু। পাঁচ বছর বয়সে তাঁকে আইজারপুর সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হয়। পরে তিনি শংকরবাটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। মেধাবী ছাত্র সেলিম ক্লাসের প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতেন।

ব্যক্তিজীবন

একজন চরিত্রবান মেধাবী ছাত্র হওয়ায় প্রধান শিক্ষক থেকে শুরু করে সকল শিক্ষক সেলিমকে খুব স্নেহ করতেন। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সেলিমের বুকে ছিল অসীম সাহস। মানুষের বিপদে বন্ধু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বিপদগ্রস্ত মানুষের হাহাকার তাঁকে ব্যথিত করে তুলতো। শরীর স্বাস্থ্যের ভালোমত যত্ন নিতেন। একজন ফুটবলার হিসেবে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। স্কুলের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। তিনি পড়াশোনা ও খেলাধুলার পাশাপাশি ধর্মীয় কাজের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ছিলেন।

সংগঠনে আগমন

কুরআন-হাদিসের আলোচনায় একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন শহীদ মুহাম্মদ সেলিম। এমনই এক আলোচনা সভা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শহীদি কাফেলার সহযাত্রী হন। নিজেকে

www.pathagar.com

কর্মী পর্যায়ে উন্নীত করেন। আশপাশের শিক্ষার্থীদের মাঝে মানুষের মুক্তি আর সুন্দর জীবনের দাওয়াত দিতে থাকেন। শোষক আর শাসকদের হাতে তিনি লাঞ্ছিত হয়েছেন বারবার, কিন্তু ভেঙ্গে পড়েননি। রাসূল (সা)-এর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন।

শাহাদাত বরণ

"যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হয় তাঁদেরকে তোমরা মৃত বল না, বরং তাঁরা জীবিত"– সেই জীবনের জন্য অপেক্ষা করতেন শহীদ মুহাম্মদ সেলিম। চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানুষ যে মিছিলে আওয়াজ তুলেছিল মানুষের মুক্তির সনদ– আল কুরআনের অবমাননার বিরুদ্ধে– সেই মিছিলে তিনিও একজন ছিলেন। আরো সৌভাগ্যের কথা– অমানুষদের গুলি আস্ফালনকে রুখে দিয়েছিলেন নিজের জীবন দিয়ে।

শহীদের মায়ের প্রতিক্রিয়া

শহীদ সেলিমের শাহাদাতের পর তাঁর মা নিজেকে একজন শহীদের মা হিসেবে পেশ করতে পেরে গৌরবান্বিত মনে করেন।

একনজরে শহীদ মোহাম্মদ সেলিম

নাম : মোহাম্মদ সেলিম
মায়ের নাম : কুলসুম বেগম
বাবার নাম : মোজাম্মেল হক
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : ৮ম শ্রেণী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : শংকরবাটি উচ্চবিদ্যালয়
আহত হওয়ার স্থান : ঈদগাহের সামনের রাস্তায়
শহীদ হওয়ার স্থান : ঈদগাহের সামনে রাস্তায়
আঘাতের ধরন ও স্থান : গুলি, পেটে ও হাতে
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মে, ১৯৮৫
স্থায়ী ঠিকানা : আরামবাগ, রাজারামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
ভাই-বোন : ৬ ভাই, ১ বোন
ভাই-বোনের মাঝে অবস্থান: দ্বিতীয়

www.pathagar.com

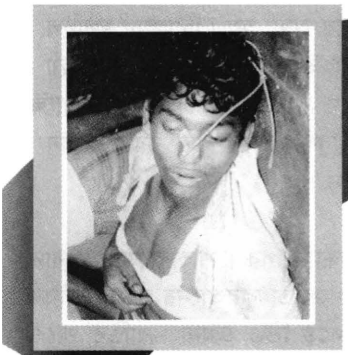

১০

শহীদ শাহাবুদ্দিন

ভাগ্যবানদের মিছিলের এক সাহসী সৈনিক শহীদ শাহাবুদ্দীন। কুরাআনের ভালোবাসায় জীবন বিলানো দুঃসাহসী এক কিশোরের নাম– শহীদ শাহাবুদ্দীন।

জন্মপরিচয়

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার রাজারামপুর গ্রামে ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ শাহাবুদ্দীন। তাঁর মা মোসাম্মৎ সপুরা বেগম ও বাবা নূর মোহাম্মদ মণ্ডল। ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ ।

শিক্ষাজীবন

নিজ গ্রামের রাজারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাস করে সবে মাত্র হরিপুর ১ নং উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন শাহীদ শাহাবুদ্দীন। শাহাদাতের সময় তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন

হরিপুর উচ্চবিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই ছাত্রশিবিরের দাওয়াত পান শহীদ শাহাবুদ্দীন। আল-কুরআনের সমাজ কায়েম ও নানা ধরনের শোষণ থেকে মুক্ত সমাজ গড়ার, খোদার পথে নিজের সব বিলিয়ে দিয়ে কুরআানের রঙে নিজের জীবন রাঙাবার দাওয়াত তিনি আনন্দের সাথে কবুল করেছিলেন। সংগঠনের 'সমর্থক' ছিলেন তিনি।

যেভাবে শহীদ হলেন

পুলিশের গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। অনেকখানি গোশত ছিঁড়ে বের হয়ে যায় বুলেটটা। তারপরও পিছু হটেননি শহীদ। ডানাভাঙ্গা আহত পাখির মতো আহত পা নিয়েই পুলিশের হামলার প্রতিবাদে শ্লোগানমুখর থাকেন। কিছুক্ষণ পর আরেকটি গুলি এসে লাগে তাঁর পেটে। ঈদগাহ ময়দানের সবুজ ঘাসগুলো লাল হয়ে যায় শাহাবুদ্দীনের রক্তে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। লুটিয়ে পড়েন জমিনে। রাজশাহী মেডিক্যালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। অপারেশন করে পেট থেকে গুলি বের

www.pathagar.com

করা হয়। ২০ দিন পর কিছুটা সুস্থ হলে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। চিকিৎসা চলছিল। আরো ১০ দিন পর মঙ্গলবার রাতে হঠাৎ পেটের আহত স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হয়। ক্রমান্বয়ে ব্যথা বাড়তে থাকে। অবস্থা খারাপ দেখে রাতেই রাজশাহী মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাত একটার সময় শাহাবুদ্দীন শাহাদাত বরণ করেন। কুরআনপ্রেমিক কিশোর তাঁর বন্ধুর দরবারে পৌঁছে যান।

জানাজা ও দাফন

শহীদের লাশ মেডিক্যাল থেকে বাড়িতে আসে সন্ধ্যার পর। শাহাদাতের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সর্বস্তরের জনতা কুরআনের জন্যই জীবন দেয়া এই শহীদের জান্নাতি চেহারা এক নজর দেখতে ভিড় জমায়। বাড়ির পাশে স্থানীয় গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। গভীর রাতে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে উপস্থিতি ছিলেন আশাতীত মানুষ। যেন এক জনসমুদ্র। জানাজায় ইমামতি করেন অত্র অঞ্চলের প্রাচীন আলেম নবাবগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন মুদাররিস মাওলানা মোহাম্মদ মূসা। শহীদের বাড়ি সংলগ্ন জুমা মসজিদের সেই ইমামও ছিলেন– যাঁর জ্বালাময়ী খুতবা শহীদ শাহাবুদ্দীনের মনে কুরআনের জন্য জীবন দেয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল।

আল্লাহতায়ালা তাঁর খুব প্রিয় বান্দাদেরই শহীদ হিসেবে কবুল করে নেন। শহীদ শাহাবুদ্দীনও সেই প্রিয় বেলাল, খাব্বাব, খোবায়েবদের তালিকায় নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। আল কুরআন চিরদিন অবিকৃত থেকে আমাদের সত্যের পথে হাতছানি দিয়ে ডেকে যাবে। আর যাঁরা কুরআনের মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিলেন তাঁরা প্রেরণার উৎস হয়ে কুরআনের প্রেমিক পাঠকদের মনে সত্যের দিশা দিয়ে যাবেন বারে বারে। শহীদ শাহাবুদ্দীনও তেমনি অমর হয়ে থাকবেন কুরআনপ্রেমিক জনতার অন্তরের অলিন্দে।

শাহাদতের পর মায়ের প্রতিক্রিয়া

শাহাদাতের সংবাদ মায়ের নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, 'তোমার দেয়া প্রাণ তুমি নিয়ে গেছ খোদা, আমার কোনো আফসোস নেই। তোমার কাছে আমার এটুকু ফরিয়াদ সে যেন জান্নাতে হাসান-হুসাইনের সাথে থাকে।'

মায়ের বক্তব্য

শহীদের মা মোসাম্মাৎ সফুরা বেগম বলেন, 'সেদিন ছোট বলে আমি তাকে মিছিলে যোগ না দেয়ার জন্য বললাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি সম্মতি দিলাম।'

শিক্ষকের মন্তব্য

শহীদ শাহাবুদ্দীনের শিক্ষক মো: ইসরাঈল হোসেন বলেন, 'সেদিন আমি সমাবেশে যোগ দিতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম এবং বেশ কয়েকজন ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে সৌভাগ্যবান ছিল শহীদ শাহাবুদ্দীন। সে অনেক সুবোধ ছাত্র ছিল।'

কুরআনপ্রেমী এই শহীদরা নিজেদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করলেন সত্যের জয় সুনিশ্চিত। আজ কুরআন আমাদের মাঝে অবিকৃত অবস্থায় আছে। তেমনি এই শহীদরাও থাকবেন আমাদের হৃদয়ের মাঝে। ভবিষ্যৎ বংশধররা তা থেকে কল্যাণকর শিক্ষা নেবে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ শাহাবুদ্দীন

নাম : শহীদ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দীন

মায়ের নাম : মোসাম্মাৎ সফুরা বেগম

বাবার নাম : নুর মোহাম্মদ মণ্ডল

স্থায়ী ঠিকানা : আরামবাগ, রাজারামপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ভাই-বোন : ৫ ভাই, ২ বোন

ভাইদের-বোনদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়

সাংগঠনিক মান : কর্মী

সর্বশেষ পড়াশোনা : ষষ্ঠ শ্রেণী

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ১ নং হরিপুর উচ্চবিদ্যালয়

আহত হওয়ার স্থান : চাঁপাইনবাবগঞ্জের ঈদগাহের সামনে রাস্তার ওপর

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ জুন, ১৯৮৫, ঘটনার ১ মাস পর

আঘাতের ধরন ও স্থান : গুলি; পায়ে, পেটে ও হাতে

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১১ মে, ১৯৮৫

www.pathagar.com

১১

শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ

একজন আলেমে দ্বীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ। তাই বাইন্যাজান সিটি হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগ পেয়ে এসএসসিতে উত্তীর্ণ হবার পর স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভর্তি হন চট্টগ্রামের হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসায়। কিন্তু ঘাতকেরা তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। ১৯৮৫ সালের ১১ ডিসেম্বর হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসায় এক নিষ্ঠুর হামলায় শাহাদাত বরণ করেন শিবিরনেতা মোস্তফা আল মোস্তাফিজ।

সাংগঠনিক জীবন

নেত্রকোনার আটপাড়া থানার বাইন্যাজান গ্রামের শরিয়ত আলীর সুপ্রিয় সন্তান মোস্তাফিজ। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা লাভের পাশাপাশি ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। ফলে সহজেই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইসলাম কায়েমের দীপ্ত সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির। অল্প সময়ের ব্যবধানে নিজেকে শপথের 'সাথী' হিসেবে গড়ে তোলেন।

অপ্রিয় সত্য কথা

ইসলামের সোনালি ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর সারা জীবন ইসলামী সমাজ বিনির্মাণে ব্যয় করেছেন। অথচ দেশের অন্যতম প্রধান এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (হাটহাজারী দারুল উলুম মাদ্রাসা) ইসলামী আন্দোলনের কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মোস্তফা আল মোস্তাফিজ ইসলামী আন্দোলনের কাজ করে যাচ্ছিলেন একাগ্রচিত্তে। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কাছে ইসলামী জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায়। তাঁর দাওয়াত ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে লাগল। বৈরী পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে জানার পর বিরূপ আচরণ করে সে সকল ছাত্রদের প্রতি।

www.pathagar.com

শাস্তিস্বরূপ অনেককে বহিষ্কার করে এবং আরো অনেককে বহিষ্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ অন্যায় ও অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেখানকার ছাত্ররা প্রতিবাদী হয়।

যেভাবে শহীদ হন

ছাত্ররা কর্তৃপক্ষের গোঁড়ামির প্রতিবাদ করলে কিছু শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়। এমনকি 'পাগলা ঘণ্টা' বাজিয়ে দা, কিরিচ, রড, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবাদকারী ছাত্রদের ওপর নৃশংস আক্রমণ চালানো হয়। এ ঘটনায় আহত হন অনেকে। এই বর্বরতার শিকার হয়ে মোস্তফা আল মোস্তাফিজ শাহাদাত বরণ করেন।

আলেমে দ্বীন হওয়ার মানসে ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ। পাষণ্ডদের আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক 'আলেমে দ্বীন' হতে পারেননি। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ হতে পেরেছেন নিঃসন্দেহে। বর্বর শিক্ষকরা জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেও মানুষের মুক্তির আন্দোলনে নিজেদের আলোকিত করতে পারেননি। পেরেছেন মোস্তাফিজ, যদিও বয়স ও প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায় ছিলেন তাঁদের তুলনায় অনেক কম।

শোকাহত বাবার মৃত্যু

পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার পাত্র ছিলেন শহীদ মোস্তাফিজ। মোস্তাফিজের শাহাদাতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন বৃদ্ধ পিতা শরিয়ত আলী। পুত্রশোক ভুলতে তিনি বাড়ি ছেড়ে এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতেন। একসময় তিনিও পুত্রের নিকট চলে যান।

একনজরে শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ

নাম : মোস্তফা আল মোস্তাফিজ

মায়ের নাম : মালেকা বেগম

বাবার নাম : শরীয়ত আলী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বাইন্যাজান, থানা- আটপাড়া, জেলা- নেত্রকোনা

ভাই-বোন : ১ ভাই, ১ বোন

সাংগঠনিক মান : সাথী

আহত হওয়ার স্থান : হাটহাজারী মাদ্রাসা

আঘাতের ধরন : দা, কিরিচ, রড ও লাঠি

কাদের আঘাতে শহীদ : শিক্ষক

শাহাদাতের তারিখ : ১১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

শাহাদাতের স্থান : হাটহাজারী মাদ্রাসা

www.pathagar.com

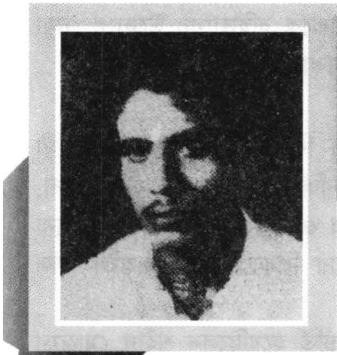

১২

শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর

নাজিরহাট-ফটিকছড়ি এলাকার প্রথম শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর। ফটিকছড়ি থানার বাবুনগর গ্রামের সাজেদা বেগম ও আবুল হাশেম চৌধুরীর সন্তান। তিনি ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন।

শিক্ষাজীবন

মেধাবী ছাত্র সেলিম জাহাঙ্গীর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে সচেতন ছাত্র ছিলেন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পাওয়ার পাশাপাশি এসএসসি পরীক্ষায় ৪টি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। নাজিরহাট কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর একই কলেজে ডিগ্রিতে ভর্তি হন। শাহাদাত বরণকালীন সময়ে তিনি বি.এ পরীক্ষার্থী ছিলেন।

অতুলনীয় দাওয়াতী চরিত্র

আল্লাহর পথের তেজোদীপ্ত কাফেলার এ সৈনিক শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের জন্য যেমন ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ, তেমনি অকুতোভয়। শিশু-কিশোর, সমবয়সী যুবকদের আল্লাহর পথের দিকে আহ্বানই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। সদা বন্ধু-বৎসল, মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটি রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও সবার কাছে পরিচিত ও গ্রহণীয় ছিলেন। কারণ তাঁর সদাতৎপর চলাফেরা, সাংস্কৃতিক কার্যাবলিতে সংশ্লিষ্টতা এবং সব সহপাঠীর উপকারে তাঁর অকৃত্রিম উদ্যোগ তাঁকে ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখদের শীর্ষে আসীন করেছিল। পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনের কাজের ব্যাপারে ছিলেন একেবারেই নিবেদিতপ্রাণ এবং আপসহীন। তাঁর এই সুন্দর ও মহৎ গুণাবলি এবং কার্যাবলিগুলো সহ্য হয়নি রক্তপিপাসু ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের।

শাহাদাতবরণ

উত্তর চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ "নাজিরহাট ডিগ্রি কলেজ"– ইসলামী ছাত্রশিবিরের জন্মের এক বছর কাল যেতে না যেতেই শুরু হয় ইসলামী আন্দোলনের

www.pathagar.com

কাজ। ছাত্রশিবিরের দাওয়াতী তৎপরতার ফলে ছাত্ররা আসতে থাকে এ কাফেলার সাথে। অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে থাকে ইসলামী আন্দোলনের শিশু বৃক্ষটি। ইসলামী আন্দোলনের এই তৎপরতা সঙ্গত কারণেই সহ্য করতে পারেনি দেশ ও মানুষের শত্রু রক্তলোলুপ ছাত্রলীগ।

১৯৮০ সালে নাজিরহাট বাজার ইসলামী ছাত্রশিবিরের অফিসে প্রকাশ্য দিবালোকে অগ্নিসংযোগ করে, কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্য পুড়িয়ে ফেলে তারা। কিন্তু তাতে শহীদি কাফেলার যাত্রা থেমে থাকেনি। শত্রু-মিত্র নির্বশেষে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে সবাই দেখল যে, শত বাধা-বিপত্তির মুখেও ক্রমান্বয়ে ছাত্রশিবির হয়ে উঠছে এক জনপ্রিয় আন্দোলনের নাম। এবার তারা ভিন্ন পথ ধরল। হত্যা আর সন্ত্রাসের চরমতম পথ। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ১১ আগস্ট তারা একটি মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলের এক পর্যায়ে বিনা উস্কানিতে সশস্ত্র অবস্থায় ক্লাসে ঢুকে শিবিরকর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা। এ সময় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শিবিরকর্মী জমির উদ্দিন জোহরের নামাজের জন্য অজু করছিলেন, মুজিববাদী ছাত্রলীগের বাহিনী তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে পুকুরে ফেলে দেয়। আর একজন ছাত্রকে আক্রমণ করার সময় তাকে রক্ষা করতে কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এগিয়ে এলে ছাত্রলীগ তাঁকেও লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সম্মানিত কলেজ শিক্ষকবৃন্দ কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে। এ ঘটনার পরও ছাত্রলীগ বিভিন্নভাবে ছাত্রশিবিরের কর্মীদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে।

২০ ডিসেম্বর, ১৯৮৫। ছাত্রশিবিরের নাজিরহাট শহর শাখার সভাপতি শামছুল আলম বাহাদুরকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় তারা। ২১ ডিসেম্বর বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রশিবিরের কর্মী নাসির উদ্দীনকে মারাত্মকভাবে আহত করে। সূর্য উদিত হলো ২৬ ডিসেম্বরের। কলেজ খোলার দিন আজ। একই দিনে এইচএসসি নির্বাচনী পরীক্ষাও শুরু। ছাত্রলীগের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে এবং নিরাপত্তার অভাবে অনেক ছাত্রশিবির কর্মী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এমন অবস্থার পরও যাঁরা সাহস সঞ্চয় করে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাঁরা ৩১ ডিসেম্বর পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসার সময় ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসী গ্রুপ– শাহজাহান, রশিদ, হেলাল ও শওকত চক্র পরিকল্পিত হামলা চালায়। এতে শিবিরনেতা সেলিম জাহাঙ্গীর, শওকত উল্লাহ, দিদার ও সফিসহ বেশ কয়েকজন ছুরিকাহত হন। এদের মধ্যে আল্লাহর পথের সাহসী সৈনিক সেলিম জাহাঙ্গীর ও শওকত উল্লাহ ছুরিকাহত হওয়ার পরও সে স্থান এক হাতে চেপে ধরে অপর হাত উঁচু করে কলেজ ক্যাম্পাসে স্লোগান দিয়েছিলেন– নারায়ে তাকবির/আল্লাহু আকবর, ইসলামী ছাত্রশিবির/জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী/আমরা সবাই মরতে রাজি, রক্তের বন্যায়/ভেসে যাবে অন্যায়, বিপ্লব বিপ্লব/ইসলামী বিপ্লব।

www.pathagar.com

আহত হওয়ার পর স্থানীয় হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ডাক্তার তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন। বেবিট্যাক্সিযোগে তাঁদেরকে হাসপাতালে নেয়ার পথে খুনি ছাত্রলীগ চক্র ফরহাদাবাদ নুরআলী মিয়ার হাটে ব্যারিকেড দিয়ে ট্যাক্সি থামিয়ে আহতদের ওপর পুনরায় হামলা করে। খুনের নেশায় উন্মত্ত রক্তখেকো আওয়ামী ও ছাত্রলীগের গুণ্ডাবাহিনী রামদা ও কিরিচ দিয়ে হাত ও পায়ের শিরা ও রগ কেটে দেয় এবং সেলিম জাহাঙ্গীরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ব্যান্ডেজ তুলে নিয়ে ক্ষতস্থানে পুনরায় ছোরা ঢুকিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। যার ফলে সেলিম জাহাঙ্গীরের প্লীহা, ফুসফুস ও যকৃত ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। ডাক্তারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেলিমকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। শিবিরকর্মীরা প্রিয় নেতাকে বাঁচানোর জন্য একের পর এক রক্ত দিতে থাকে। দুইবার অপারেশন ও প্রচুর রক্ত দেয়ার পরও কোনো ফল হলো না। হাসপাতালে চারদিন ছিলেন তিনি। তারপর ১৯৮৬ সালের ৪ জুন বেলা ১১টায় তিনি শাহাদাত বরণ করেন এবং তাঁর বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে যান।

শহীদের বিদায়

সেলিম জাহাঙ্গীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পর শত শত শোকার্ত সাথী ও আত্মীয় স্বজনের আর্তনাদে সেদিন হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। দুপুর বেলায় লালদীঘি ময়দানের বিশাল জানাজার নামাজ অনুষ্ঠানের পর শহীদের কফিন নিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আবু তাহেরসহ শিবিরের নেতাকর্মীরা ফটিকছড়ির বাবু নগরে শহীদের নিজ বাড়িতে যান। সেখানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে পুনরায় জানাজার নামাজের পর বাড়ির সম্মুখস্থ মসজিদসংলগ্ন পুকুরের পশ্চিম প্রান্তে তাঁকে দাফন করা হয়।

পিতার বক্তব্য

'আমার ছেলে ইসলামের জন্য জীবন দিয়েছে। আমার কোনো আফসোস নেই। ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীরা সবাই আমার ছেলে। আপনারা ইসলামের জন্য কুরবানি আর লড়াই অব্যাহত রাখবেন। সেলিম জাহাঙ্গীরের মৃত্যুতে ইসলামী আন্দোলনের কাজ থেমে থাকবে না বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাবে এ আন্দোলনের কাজ। আপনারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করুন। কাপুরুষের মত মৃত্যুবরণ করে লাভ নেই, শাহাদতের মৃত্যুই হচ্ছে উৎকৃষ্ট পথ।'

শহীদের মায়ের প্রত্যাশা

শহীদ হওয়ার পর তাঁর মা বলেন, 'যে ইসলাম ও ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আমার কলিজার টুকরা জীবন দিয়েছে, সে ইসলাম সেই শিবির যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। শিবিরের দায়িত্বশীলরা যেন আরও দায়িত্ববান হয়ে আমার পুত্র ও অন্যান্য শহীদদের রক্তদানকে সার্থক করে। শহীদের মা হিসেবে আমি গর্ব করি।'

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর

নাম : সেলিম জাহাঙ্গীর

মায়ের নাম : সাজেদা বেগম

বাবার নাম : আবুল হাশেম চৌধুরী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- বাবু নগর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম

ভাই-বোন : ৫ ভাই, ২ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : তৃতীয়

পরিবারের মোট সদস্য : ৯ জন

সাংগঠনিক মান : কর্মী

পড়াশোনা : বি.এ দ্বিতীয় বর্ষ

কৃতিত্ব : এসএসসি ৪টি লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ, অষ্টম এবং পঞ্চম শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ

আহত হওয়ার স্থান : ফটিকছড়ি ডিগ্রি কলেজ ক্যাম্পাস

আঘাতের ধরন : বুকের বাম পাশে ছুরির আঘাত। অতঃপর কিরিচ ও রামদা দ্বারা রগ ও শিরা কর্তন

যাদের আঘাতে শহীদ : রক্তপিপাসু ছাত্রলীগ

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

শাহাদাতের তারিখ : ৪ জানুয়ারি, ১৯৮৬

www.pathagar.com

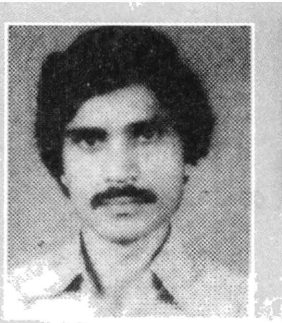

১৩

শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী

মানুষের ইতিহাস– সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। যুগে যুগে সত্য প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাঁরা ভূমিকা পালন করেছেন তাঁরা ত্যাগ ও কুরবানির মাধ্যমেই সফল হয়েছেন। সেই ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে মিথ্যার কবল থেকে মুক্ত করতে শাহাদাতের নজরানা পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার তৎকালীন সভাপতি শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার ছদাহা ইউনিয়নের খোর্দ্দবেতছিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ২ এপ্রিল, ১৯৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ। তাঁর মায়ের নাম মোসাম্মৎ মনিরা বেগম ও বাবার নাম মাওলানা আব্দুর রহিম চৌধুরী। শহীদের পিতা স্থানীয় মসজিদের ইমাম, স্বনামধন্য শিক্ষক এবং টানা চৌদ্দ বছর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ৬ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে শহীদ ছিলেন পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান।

ছেলেবেলা

বিদ্যাৎসাহী ও আদর্শবাদী মা-বাবার স্নেহে গ্রামের বাড়িতেই শহীদের বাল্যকাল কাটে। শিশুকাল থেকেই তিনি স্বভাবে ছিলেন শান্ত আর মন-মননে ছিলেন সৃজনশীল। ৯ বছর বয়সে তিনি 'বেবিট্যাক্সি' দেখে দেখে বাড়িতে নিজে যোগাড়যন্ত্র করে যন্ত্রচালিত তিন চাকার গাড়ি বানিয়েছিলেন, যেটি দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক কাজে লেগে ছিল। শাহাদাতের প্রায় দেড় বছর পূর্বে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। শাহাদাতকালে তিনি পুণ্যবতী স্ত্রী হানিয়ারা চৌধুরী এবং ৬ মাসের শিশুসন্তান জিয়াউল হক চৌধুরীকে রেখে যান।

www.pathagar.com

শিক্ষাজীবন

পদুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাহফুজের লেখাপড়া শুরু হয়। এরপর দক্ষিণ সাতকানিয়া জি.বি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম হতে ১৯৬৯ সালে এসএসসি (বিজ্ঞান) এবং সাতকানিয়া ডিগ্রি কলেজ থেকে ১৯৭১ সালে এইচএসসি (বিজ্ঞান) পাস করেন। তারপর স্নাতক পর্যায়ে পড়ালেখার জন্য সাতকানিয়া ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি চট্টগ্রাম পটিয়া কলেজ হতে ১৯৭৭ সালে বিএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

লেখাপড়ার অদম্য আগ্রহ ছিল শহীদ মাহফুজের। বিএসসি পাস করার পর ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি নেয়ার কথা চিন্তা করে ১৯৮২-৮৩ সেশনে ভর্তি হন চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পুরকৌশল বিভাগে। শাহাদাতের পূর্বে তিনি ছিলেন বিআইটির ২য় বর্ষের এবং সাউথ হলের (বর্তমানে শহীদ মোহাম্মদ শাহ হল) ২২২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র।

শিক্ষকতা

ছাত্র অবস্থা থেকেই শহীদ মাহফুজ শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সাতকানিয়া মাহমুদুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম আবদুস সোবহান রাহাত আলী উচ্চবিদ্যালয়, দৌলতপুর উচ্চবিদ্যালয়, পটিয়া। চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উচ্চবিদ্যালয় প্রকৃতি এবং একই সাথে তিনি চট্টগ্রাম ইমাম গাজ্জালী কলেজ-এর বিজ্ঞান বিভাগে 'ডেমোনেস্ট্রেটর' ছিলেন। উল্লেখ্য, শাহাদাতের পূর্বে তিনি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন

ছোটবেলা থেকেই ইসলামী আন্দোলনের প্রতি দুর্বলতা থাকলেও বড় ভাই শামসুল হক চৌধুরীর অনুপ্রেরণায় ১৯৬৭ সালে সংগঠনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮ সালে ইসলামী ছাত্রসংঘের সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করতে থাকেন এবং ১৯৬৯ সালে আইএসসি ছাত্র থাকাকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘের রফিক (সাথী) মান অর্জন করেন। ১৯৬৯-৭০ সেশনে সাতকানিয়া কলেজ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০-৭১ সেশনে তিনি সাতকানিয়া শহর শাখার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী সংগঠনের কার্যক্রম গোপনে পরিচালনা করেন এবং দাওয়াতী কাজের অংশ হিসাবে "ক্লাব" ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করেন। ১৯৭৬-৭৭ সেশনে তিনি ইসলামী ছাত্রসংঘের সাতকানিয়া থানা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৭ সালে ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠার পর তিনি শিবিরে যোগদান করেন এবং ১৯৮৩ সালে সংগঠনের "সাথী" মান অর্জন করেন। এরপর ১৯৮২-৮৩ সেশনে তিনি চট্টগ্রাম বিআইটিতে (বর্তমানে চুয়েট) ভর্তি হন এবং ১৯৮৪-৮৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন (শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত)।

www.pathagar.com

অতুলনীয় দাওয়াতী চরিত্র

শহীদ মাহফুজের জীবনের মূল লক্ষ্যই ছিল ইসলামের সৌন্দর্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। শহীদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী বলেন, তিনি সব সময় ইসলামী আন্দোলনকে আমার সামনে পেশ করতেন। আমি প্রথম জীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে কুরআন-হাদিস ও যুক্তির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হন। শুধু তাই নয়, শহীদ মাহফুজ তাঁর দাওয়াতী চরিত্রের মাধ্যমে আমার বাবার মনকে জয় করেন। আমাদের বিয়ের আলোচনার প্রাক্কালে আমার বড় ভাই ব্যতীত বাবাসহ পরিবারের কেউ এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না। আমার বড় ভাই শহীদ মাহফুজের উজ্জ্বল চরিত্রের কারণে ছোট বোনকে তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বিয়ের পরে যে বাবা শহীদ মাহফুজকে তাঁর মেয়ের জন্য অপছন্দ করেছিলেন, তাঁর আদর্শের কাছে তিনি হার মানেন এবং তাঁকে তার নিজ পুত্রের চেয়ে অধিক ভালোবাসতে শুরু করেন। শহীদ মাহফুজের মৃত্যুর সংবাদ শুনে বাবা এত বেশি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিন মাস অসুস্থ থেকে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

শাহাদাতের ঘটনা

২৭ জানুয়ারি, ১৯৮৬। পশ্চিমের সূর্যটা আকাশের সাথে মিশে গেছে। দিনের আলো ম্রিয়মাণ, একটু পরেই আঁধার ঘনিয়ে আসবে। শহীদ মাহফুজুল হক তখনো ব্যস্ত সাংগঠনিক কাজে। আরো দু'একজন শিবিরকর্মীসহ সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন আসন্ন ৯ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দাওয়াত প্রদানে। একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী বারবার দাওয়াতী কাজে বাধা দিচ্ছিল। সবকিছু উপেক্ষা করে শহীদ মাহফুজ ভাই তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছিলেন। মাগরিবের নামাজের আজান হল। শহীদ মাহফুজ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে রাঙ্গুনিয়া থানা মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে কলেজ হোস্টেলে ফিরবেন- এমনটি ভেবে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন রাঙ্গুনিয়ার রওজার হাটে। কিন্তু মার্কসবাদ আর সমাজতন্ত্রের নামে সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ধ্বজাধারী ছাত্র ইউনিয়নের সন্ত্রাসীরা তাঁকে আর ফিরতে দেয়নি। কিরিচ, রামদা, হকিস্টিক, লাঠি ইত্যাদি দিয়ে মাহফুজুল হক ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ে সন্ত্রাসীরা। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিলেন মাহফুজুল হক। সন্ত্রাসীরা তাঁকে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। কিরিচের আঘাতে মাথা কেটে যায় এবং হকিস্টিক ও লাঠির আঘাতে মাথাসহ সমস্ত শরীর থেঁতলে যায়। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যান মাহফুজ। তাঁর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয় জমিন। হামলাকারীরা চলে গেলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে নিকটস্থ ইছাখালি হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাস্থল থেকে ২০০ গজের মধ্যে থানা। কিন্তু পুলিশ এগিয়ে আসেনি।

www.pathagar.com

পরিস্থিতির অবনতি হলে মাহফুজুল হককে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখনো মাহফুজ ছিলেন সংজ্ঞাহীন। কর্তব্যরত ডাক্তার সাধ্যানুসারে চেষ্টা করলেন সারারাত, কিন্তু অবস্থা অপরিবর্তিত রইল।

২৮ জানুয়ারি ভোর ৫টা। ফজরের আজানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসছে মসজিদ থেকে। ডাক্তার শেষবারের মত পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন, 'মাহফুজ আর নেই।' সূর্যোদয়ের পূর্বেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন শহীদ মাহফুজ। মুহূর্তের মধ্যে শহীদের সাথীদের আহাজারিতে হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল মাহফুজুল হকের শাহাদাতের খবর। শোকের ছায়া নেমে এল বন্দরনগর চট্টগ্রামে। শহীদের শোকাহত সাথীরা হাসপাতালে ভিড় জমাতে থাকে তাঁকে একনজর দেখার জন্য।

জানাজা ও দাফন

২৮ জানুয়ারি বিকালে লালদীঘি ময়দানে শহীদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় হাজারো ছাত্র-জনতার ঢল নামে। জানাজা শেষে লাশের কফিন নিয়ে ছাত্র-জনতা চন্দনপুরস্থ ইসলামী ছাত্রশিবির অফিসে যায়। অফিসে লাশ কিছুক্ষণ রাখা হয় এবং তাঁর আন্দোলনের সহকর্মীদের দেখার সুযোগ দেয়া হয়। অতঃপর শহীদের লাশ গাড়িযোগে চট্টগ্রাম শহর থেকে ৩৪ মাইল দূরে সাতকানিয়া থানার "ছদাকা" গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। মাহফুজের লাশ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় এবং সেখানে পুনরায় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে রাতেই শহীদের লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদের মায়ের প্রতিক্রিয়া

'আমার ছেলে শহীদ হয়েছে, আর আমি শহীদের মা, এর চেয়ে পরম সৌভাগ্য আমার আর কী হতে পারে!'

বড় ভাই শামসুল হক চৌধুরীর ভাষ্য

'শহীদ মাহফুজ সকল ধরনের মানসিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে এক নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিল। সে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে ছিল আপসহীন, আনুগত্যের বেলায় অত্যন্ত সচেতন।'

শহীদ হওয়ার পূর্বে স্মরণীয় বাণী

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে আমি কুণ্ঠিত নই। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতি ঘরে ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমি আমরণ চেষ্টা করে যাব।

শহীদের স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

'নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নিয়েও তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করার পরেও তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তিনি বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, ছেলে ও পরিজনের জন্য খুবই দায়িত্ববান ছিলেন।

www.pathagar.com

তাঁর স্বপ্ন ছিলো ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা। শহীদের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমার প্রত্যাশা।'

শহীদের ছেলের বক্তব্য

'আমার পিতা সকল ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করেছেন। সুতরাং ইসলামী আন্দোলনের সকল কর্মীর নিকট প্রত্যাশা, তারা যেন ইসলামী আন্দোলনের জন্য নির্ভয়ে কাজ করে বাবার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করেন। সংগঠন যেন তাঁর আদর্শ থেকে হারিয়ে না যায়। কারণ সংগঠন হারিয়ে গেলে আমার বাবাও হারিয়ে যাবেন। আমি ইসলামী আন্দোলনের একজন শহীদের সন্তান হতে পেরে গর্ব বোধ করছি।'

গ্রামবাসীর প্রতিক্রিয়া

'তিনি অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। সদালাপী শহীদ মাহফুজ গ্রামবাসী, আত্মীয়-স্বজন সবার খোঁজখবর নিতেন এবং সবাইকে ভালো পরামর্শ দিতেন।' ইসলামী আন্দোলনের সাথে শহীদ মাহফুজের আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি তাঁর সাথীদের বলতেন, 'ইসলামী আন্দোলন ডিগ্রি নিয়ে-অবশ্যই ইসলামী আন্দোলন করব...'। কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেয়া হল না। তার আগেই চলে গেলেন পৃথিবী থেকে। শাহাদাতের মৃত্যুই যে তাঁর কাম্য ছিল। আর তিনি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের প্রায়ই বলতেন, 'আমার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে শাহাদাতের মউত দেন।' সে কারণেই হয়ত আল্লাহ তাঁকে কবুল করেন প্রিয় বান্দা হিসেবে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী

নাম : মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চৌধুরী

মাতার নাম : মোসাম্মৎ মনিরা বেগম

পিতার নাম : মাওলানা আব্দুর রহিম চৌধুরী

ভাই-বোন : ৬ ভাই, ২ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : চতুর্থ

পরিবারের সদস্যসংখ্যা : ১১ জন

জন্ম : ২ এপ্রিল, ১৯৫৩; শুক্রবার

স্থায়ী ঠিকানা : নুনু চৌধুরী বাড়ি, গ্রাম- খোদ্দকেঁওচিয়া, ডাকঘর- ছদাহা, উপজেলা- সাতকানিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : তৎকালীন চট্টগ্রাম বিআইটি (চুয়েট)

সর্বশেষ পড়াশোনা : তৃতীয় বর্ষ (সিভিল), বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং

সাংগঠনিক মান : সদস্যপ্রার্থী

জীবনের লক্ষ্য : "ইসলামী দায়িত্ব পালন ও অপরকে শিক্ষা দেয়া"

কৃতিত্ব : ৯ বছর বয়সে ত্রি-চক্রযান উদ্ভাবন

আহত হওয়ার স্থান ও তারিখ : রওজারহাট, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম; ২৭ জানুয়ারি, ১৮৮৬, সন্ধ্যা ৬টা

আঘাতের ধরন : হকিস্টিক, লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্র ইউনিয়ন

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

শাহাদাতের তারিখ : ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৬, ভোর ৬টা

ব্যক্তিগত জীবন : বিবাহিত, ১ পুত্র সন্তানের জনক

শহীদ হওয়ার পূর্বে স্মরণীয় বাণী : "আমাকে নিয়ে চেষ্টা করে লাভ নেই, আমি আর বাঁচব না..."

www.pathagar.com

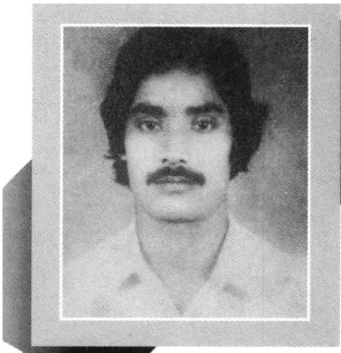

১৪

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

"সেলিম জাহাঙ্গীরের মত যদি জাফর জাহাঙ্গীরও শহীদ হত!" শাহাদাত মুমিন জীবনের কাম্য। সেই কামনা থেকেই এই উক্তিটি করেছিলেন জাফর জাহাঙ্গীর; সেলিম জাহাঙ্গীরের শাহাদাতের পর। তাঁর এই কামনাকে মহান আল্লাহ কবুল করেন সেলিম জাহাঙ্গীরের শাহাদাতের মাত্র ৪০ দিন পর।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

আবু জাফর মুহাম্মদ মনসুর (জাফর জাহাঙ্গীর) ১৯৬৩ সালের ১৯ জানুয়ারি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মা আনোয়ারা বেগম ও বাবা আবুল বাশার। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

শিক্ষাজীবন

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের চূড়ান্ত পর্বের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক পরিচয়

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর বাংলাদেশ কারিগরি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। শাহাদাতকালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের 'সাথী' জাফর জাহাঙ্গীর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখার ক্রীড়া সম্পাদক ও ক্যাম্পাস বিভাগের সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

শাহাদাত

স্বৈরাচারী এরশাদের লেলিয়ে দেয়া জাতীয় ছাত্রসমাজের সশস্ত্র গুণ্ডাদের নিষ্ঠুর বুলেটে জীবন দেন আল্লাহর দ্বীনের পতাকাবাহী এই তরুণ– ১৯৮৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। ইসলামী আন্দোলনের অব্যাহত অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার হীন মানসে পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের চিরন্তন আদর্শ ও কর্মীদের আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলির কারণে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সাধারণ ছাত্ররা দলে দলে ছাত্রশিবিরের

www.pathagar.com

ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে। কয়েক বছরের ব্যবধানে ইসলামী ছাত্রশিবির সবচেয়ে জনপ্রিয় ছাত্রসংগঠনে পরিণত হয়। ছাত্রদের সমর্থন নিয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির পরপর কয়েক বছর পলিটেকনিক কলেজ ছাত্র-সংসদে কখনো আংশিক আবার কখনো পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী হয়। খোদাদ্রোহী অপশক্তির কাছে ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই অগ্রগতি ও জনপ্রিয়তা সহ্য হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে শিবিরের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার অপপ্রয়াস চালায়। আর এই হীন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রসমাজ নামধারী দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দেয়া হয় অর্থ ও অস্ত্র। ১৪ ফেব্রুয়ারি ঘটনার দিন সাধারণ ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে হোস্টেলে অবস্থান করছিলো, কাপুরুষের দল রাতের অন্ধকারে হামলা করে। রাত নয়টা থেকে দুর্বৃত্তরা ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলি ছুঁড়ে ভয় আর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। জাতীয় ছাত্রসমাজ নামধরী এ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে সাধারণ ছাত্ররা। ছাত্ররা রুমের লাইট নিভিয়ে দিয়ে সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে। দুর্বৃত্তরা কক্ষে কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে টার্গেটকৃত ছাত্রদের খুন করতে উদ্যত হয়। ১ নম্বর হোস্টেলে জাফর জাহাঙ্গীর অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাসীরা জাফর জাহাঙ্গীরের দিকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে। স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় জাফর জাহাঙ্গীরের সতেজ দেহ। তখন রাতের নীরবতার সাথে সাথে সমস্ত এলাকাজুড়ে নেমে আসে আতঙ্ক আর নিস্তব্ধতা। টগবগে এক তরুণের জীবন প্রদীপ ঘটনাস্থলেই নিভে যায়, আর মহান আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যান তিনি শহীদের মর্যাদা নিয়ে। নরপিশাচরা খুনের পিপাসা মিটিয়ে অস্ত্র উঁচিয়ে চলে যায়।

ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে পড়ে শিবিরনেতার শাহাদাতের খবর। শিবিরকর্মীরা তাদের সতীর্থকে হারানোর ব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এই হত্যাকাণ্ড চললেও পুলিশ তার চিরায়ত রূপ বজায় রাখে। তারা এসে এই বীর শহীদের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

লাশ দেখার সুযোগ পেল না শহীদের সাথীরা

জালেম সরকার এই শহীদের লাশ কাউকে দেখার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। শহীদের সাথীরা তাদের প্রিয় ভাইকে সামনে নিয়ে জানাজা পড়তে পারেননি। শহীদ জাফর জাহাঙ্গীরের পরিবারবর্গ বাস করেন চট্টগ্রামের পোর্ট কলোনিতে কিন্তু তাদের কাছে লাশ হস্তান্তর না করে তাঁর গ্রামের বাড়ি ছাগলনাইয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হয় কড়া পুলিশ পাহারায়। শোকার্ত পিতা-মাতা ও ভাই-বোনকে শেষবারের মত তাদের প্রিয় জাফর জাহাঙ্গীরের পবিত্র মুখখানি পর্যন্ত দেখতে দেয়নি সরকার। এই নিষ্ঠুর খুনের পর দেশব্যাপী শোকের ছায়া নেমে আসে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শহীদের অনুগামীরা

www.pathagar.com

নেমে আসেন রাজপথে। ১৫ তারিখ রাজধানীতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বিনা উস্কানিতে কাঁদুনে গ্যাস শেল ফাটায় ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। জালেমের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের লাঠির আঘাতে ছাত্রশিবিরের অনেক কর্মী সেদিন আহত হন। কক্সবাজারেও একই ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালন করে।

শাহাদাত ছিল কাম্য যাঁর

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা মনে প্রবলভাবে পোষণ করতেন। শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীরের দাফন শেষে রুমমেটদের তিনি বলেছিলেন, 'সেলিম জাহাঙ্গীর শহীদ হয়, সব জাহাঙ্গীর শহীদ হয় অথচ আল্লাহ আমি জাফর জাহাঙ্গীরকে কেন শহীদ হিসেবে কবুল করে না!' শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী পরিবেশের কারণে মা জাফর জাহাঙ্গীরকে শিবির করতে নিষেধ করলে তিনি মাকে বলতেন, 'আমি শাহাদাত বরণ করলে এদেশে ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে।' আল্লাহপাক সত্যিই জাফর জাহাঙ্গীরের কামনাকে কবুল করে নিলেন। মূলত প্রতিটি ঈমানদারেরই শাহাদাত কাম্য হতে হবে। ঈমান গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টি অর্জন করা। শত-সহস্র সমস্যার আবর্তে জড়িত এ পৃথিবীতে সহজে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিনা হিসাবে যারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, "যাঁরা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাঁদেরকে তোমরা মৃত বল না বরং তাঁরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তাঁরা আনন্দিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯, ১৭০)

ইসলামী বিপ্লবকে শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তাই শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনও তাঁকে শহীদ হিসেবে কবুল করেছেন। শহীদের কামনা ছিল, "ইসলামী বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে" তাঁর শাহাদাতের কারণে। কথাটিতে এক বিরাট তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন কায়েম হবে শহীদের খুনের নজরানার বদৌলতে অথচ সেই দুনিয়াবি ফল ভোগ করার জন্য দুনিয়ায় থাকবে না। কত বড় ত্যাগ! এ ত্যাগের পুরস্কার তো এমন যা দেখে অন্য সকল ঈমানদার লোভাতুর হবেন। দুনিয়ার সর্বস্ব যিনি একমাত্র আখিরাতের কল্যাণে ত্যাগ করতে পারেন তিনি কতো বড় আল্লাহপ্রেমিক এটা তাঁর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা থেকেই প্রমাণ মেলে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ আবু জাফর মুহাম্মদ মনসুর (জাফর জাহাঙ্গীর)

নাম : আবু জাফর মুহাম্মদ মনসুর (জাফর জাহাঙ্গীর)

মায়ের নাম : আনোয়ারা বেগম

বাবার নাম : আবুল বাশার

ভাই-বোন : ২ ভাই ও ২ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়

জন্ম তারিখ : ১৯ জানুয়ারি, ১৯৬৩

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- লক্ষ্মীপুর, ডাকঘর- শান্তিরহাট, ৬ নং ওয়ার্ড, ৮ নং ইউনিয়ন, থানা- ছাগলনাইয়া, জেলা- ফেনী

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস

শাহাদাতের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ সাল

সাংগঠনিক মান : সাথী

দায়িত্ব : শাহাদাতের সময় চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখার ক্রীড়া সম্পাদক ও ক্যাম্পাস সহকারী পরিচালক ছিলেন

বিশেষ উক্তি : "সেলিম জাহাঙ্গীরের মত যদি জাফর জাহাঙ্গীরও শহীদ হত!"

www.pathagar.com

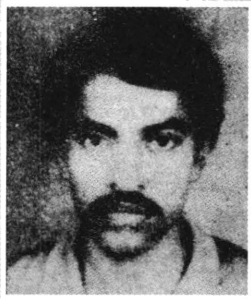

১৫

শহীদ বাকীউল্লাহ

শহীদের আকাঙ্ক্ষা

"মা আমার জন্য কাঁদবেন না, ইচ্ছা করলেই তো শহীদ হওয়া যায় না, আর আমি যদি ইসলামের জন্য শহীদ হই তাহলে দেখবেন হাজার হাজার ইসলামী আন্দোলনের কর্মী আমার লাশ নিয়ে আপনার কাছে আসবে। আপনি শহীদের মা হবেন, এতো আপনার জন্য গৌরবের বিষয়। এক বাকীকে হারিয়ে আপনি হাজার হাজার বাকীকে আপনার সন্তান হিসেবে পাবেন।" আল্লাহর প্রিয় বান্দা শহীদ বাকীউল্লাহ শাহাদাতের মাত্র একদিন আগে বাড়ি থেকে আসার সময় তাঁর মায়ের সাথে শেষ কথা হিসেবে এ কথাগুলোই বলেছিলেন। আর আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দার এ কথাগুলোকে কবুলও করে নিয়েছিলেন।

পড়ালেখা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। শহীদ বাকীউল্লাহ তখন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শক্তি কৌশল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ১ম পর্বের ছাত্র। থাকতেন নজরুল ছাত্রাবাসে। আল্লাহর পথে নিষ্ঠাবান ও কঠোর পরশ্রমী ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী বাকীউল্লাহ তখন ঐ ছাত্রাবাসের প্রচার সম্পাদক এবং মসজিদ কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

শহীদের দায়িত্বানুভূতি

ক'দিন পর কলেজ খুলবে। প্রথম বর্ষের নতুন ছাত্ররা আসছে। সবার আগে নতুনদের মাঝে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। এজন্য সাংগঠনিক ছুটি পেরোতে না পেরোতেই ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছিলেন শহীদ। তিনি সব সময় সংগঠনের প্রয়োজনে সঠিক সময়েই ময়দানে হাজির হতেন। দুই-একটি শিক্ষাশিবিরের খাদ্য বিভাগের ব্যবস্থাপনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন; যেখানে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে সম্পর্ক

কলেজের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী সবার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল সম্মান আর মর্যাদার।

মিতব্যয়িতা

বাড়ির অবস্থা সচ্ছল থাকার পরও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা খরচ করতেন না। বাড়ি থেকে পাঠানো টাকা বাঁচিয়ে তিনি ইসলামী ব্যাংকে জমা করেছিলেন। এ টাকার যাকাত দিতে হবে কি না তিনি আব্বার কাছে একবার জানতে চেয়েছিলেন।

শাহাদাত

জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকীউল্লাহকে লক্ষ্য করে স্টেনগান থেকে অনবরত গুলি ছোঁড়ে সন্ত্রাসীরা। গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকীউল্লাহর সতেজ দেহ। তাঁদের রক্তের স্রোতে তিনতলার মেঝে ভেসে যায়। তখন সমস্ত এলাকা জুড়ে নেমে আসে আতঙ্ক ও নীরবতা। টগবগে দুই তরুণের জীবন প্রদীপ ঘটনাস্থলেই নিভে যায়। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁরা হাজির হন শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে। দুর্বৃত্তরা খুনের উন্মাদনা চরিতার্থ করার পর অস্ত্র উঁচিয়ে পালিয়ে যায়। বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে দুই শিবির নেতার শাহাদাতের খবর। শিবিরকর্মীরা তাদের সতীর্থদের হারানোর ব্যথায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এক ঘণ্টার বেশি সময় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চললেও পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে।

জানাজা আদায় করতে পারল না শহীদের সঙ্গীরা

ঘটনাস্থলেই গুমোট নিস্তব্ধতা নেমে এলে পুলিশ এসে দুই বীর শহীদের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তৎকালীন জালেম সরকার তাঁদের লাশ কাউকে দেখার সুযোগ পর্যন্ত দেয়নি। শহীদের সাথীরা তাদের প্রিয় ভাইকে সামনে নিয়ে জানাজা আদায় করতে পারেননি। বরিশালের মুলাদীতে শহীদ বাকীউল্লাহর লাশ পিতার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ব্রাশফায়ার আর গুলির আঘাতে শহীদের লাশ চেনা যাচ্ছিল না। লাশ বিকৃত হওয়ায় কেউ দেখতে পারেনি।

প্রতিবাদের ঝড়

এই নিষ্ঠুর জোড়া খুনের পর দেশব্যাপী নেমে আসে শোকের কালোছায়া। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শহীদের অনুগামীরা নেমে আসেন রাজপথে। ১৫ তারিখ রাজধানীতে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ বিনা উস্কানিতে কাঁদুনে গ্যাস শেল ফাটায় ও ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। জালেমের লেলিয়ে দেয়া পুলিশের লাঠির আঘাতে শিবিরের তৎকালীন অফিস সম্পাদক (পরে কেন্দ্রীয় সভাপতি) আমিনুল ইসলাম মুকুল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলামসহ অনেকে আহত হন। বৃহত্তর চট্টগ্রামে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে। কক্সবাজারে হরতাল পালনের সময় পুলিশ বিনা উস্কানিতে শিবিরের মিছিলের ওপর চড়াও হলে সংঘর্ষে অনেকে আহত হয়। পুলিশ মিছিলের ওপর ১৫ রাউন্ড গুলি ও অন্তত একশ' টিয়ার গ্যাস শেল নিক্ষেপ করে। শামসুল আলম (১৮) ও জসীম উদ্দিন (২৪) মাথায় গুলিবিদ্ধ হন।

www.pathagar.com

শাহাদাতের পর পিতার বক্তব্য

শাহাদাত বরণ করার পর শহীদের বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাঁর পিতার বক্তব্য– "বাবা বাকী আমাদের খুব আদরের ছিল, সে আমার আদর্শ সন্তান ছিল। যাক আজ বাকীর শাহাদাতের কারণে আল্লাহ তোমাদের সাথে আমার পরিচয়ের সুযোগ দিলেন। বাকী তো শহীদ হয়েছে, তোমরাই আমার বাকী। দোয়া করি তোমরা যাতে জাফর-বাকীর রেখে যাওয়া আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে পার।"

শহীদ হওয়ার পূর্বে স্মরণীয় বাণী

শহীদ বাকীউল্লাহ শাহাদাতবরণের পূর্বদিন বাড়ি থেকে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান। তিনি নিজ হাতে কবরস্থানে একটা আমের ডাল পুঁতেছিলেন। অলৌকিকভাবে সেটা থেকে একটি আমগাছ হয়ে যায়। শাহাদাতের আগের দিন বাড়ি থেকে যাবার সময় চাচাতো ভাই আমির হোসেনকে বলেছিলেন, "ভাই আমি যদি কোনোদিন মারা যাই তবে আমাকে এ অলৌকিক আম গাছের নিচে মাটি দিও।" তাঁকে আম গাছটির নিচের মাটি দেয়া হয়।

শাহাদাতের আগের দিন বর্তমান জামায়াতের উপজেলা আমীর কাসির আহমেদ লঞ্চে চাঁদপুর পর্যন্ত তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। সে সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রশিবিরের প্রচুর নেতাকর্মী আহত হচ্ছিলেন। এ বিষয়ে শহীদ বাকী ভাই বলেন, "একটি বড় বিল্ডিংয়ের জন্য একটি মজবুত ফাউন্ডেশন লাগে। আর ফাউন্ডেশন তৈরি করতে শক্ত ইটও লাগে, আধলা ইটও লাগে। তেমনি এখন যাঁরা আহত হচ্ছেন, শহীদ হচ্ছেন তাঁরা মূলত সংগঠনের জন্য একটি মজবুত ফাউন্ডেশন তৈরি করছেন। কাসির আহমেদ আরো বলেন, 'শহীদ বাকী ভাইয়ের নামাজের মধ্যে যে খুশু-খুজু, যে একাগ্রতা ছিল তা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।'

শহীদের চিঠি

শহীদ হওয়ার আগে তাঁর ফুফাতো ভাইকে দেয়া চিঠিতে লিখেছিলেন– "কয়েকদিন আগে বাতিলের বোমার আঘাতে আমাদের এক ভাইয়ের পা জখম হয়েছে। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কারণে আমরা কিছু করতে পারিনি। ময়দান খুবই উত্তপ্ত, দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করেন।"

শহীদের কথা

শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরীর কফিন কাঁধে নিয়ে শহীদ বাকীউল্লাহ বলেছিলেন– "আল্লাহ! চট্টগ্রামে আরো শহীদের প্রয়োজন হলে আমাকে পরবর্তী শহীদ হিসেবে কবুল কর।"

শহীদের মায়ের বক্তব্য

শহীদ বাকীউল্লাহর শাহাদাতের পর তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে শহীদের বৃদ্ধা মা বলেছিলেন– "বাবা তোমরা আমার বাকু, তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে চিঠি দিও, তা হলে আমি মনে করব আমার বাকু চট্টগ্রাম থেকে আমার কাছে চিঠি দিয়েছে। আমি

www.pathagar.com

এক বাকীকে হারিয়ে তোমাদের মতো হাজার হাজার বাকীকে আমার সন্তান হিসেবে পেয়েছি। জাফর-বাকীর শাহাদাতের বিনিময়ে আল্লাহ যেন এই দেশে ইসলাম কায়েম করে দেন এই দোয়া করি।"

একনজরে শহীদ বাকীউল্লাহ

পূর্ণ নাম : মোহাম্মদ বাকীউল্লাহ

বাবার নাম : গোলাম রহমান হাওলাদার

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- রঙ্গা, ডাকঘর- কাওরিয়া বন্দর, থানা- হিজলা, জেলা- বরিশাল

জন্ম তারিখ : ১৯৬৫ সালের ১২ জুন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান: ৫ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে ৪র্থ

পড়াশোনা : শক্তিকৌশল বিভাগের ৩য় বর্ষ ১ম পর্ব

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

সাংগঠনিক মান : কর্মী

দায়িত্ব : নজরুল হলের প্রচার সম্পাদক, ছাত্রাবাস মসজিদ কমিটির সেক্রেটারি

শাহাদাতের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১ নং হোস্টেলের তিনতলায়

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রসমাজ নামধারী গুণ্ডাদের হাতে

আঘাতের ধরন : গুলি

www.pathagar.com

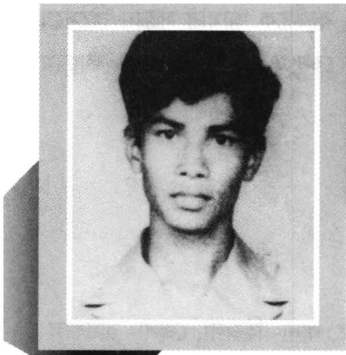

১৬

শহীদ আমীর হোসাইন

নোয়াখালী জেলার সুধারাম থানার নিভৃত গ্রাম ভাটিরটেক-এ ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রগ্রহণ করেন শহীদ আমীর হোসাইন। তাঁর মায়ের নাম মোসাম্মৎ খায়রুন্নেছা এবং বাবার নাম মো: মোয়াজ্জেম হোসেন।

শিক্ষাজীবন

তিনি নোয়াখালীর স্বাধীন গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। শাহাদাতের সময় চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শাহাদাতকালে তাঁর হাতে দশম শ্রেণীর অঙ্ক বই ও খাতা ছিল যা তাঁর রক্তাক্ত দেহের পাশে পড়ে ছিল। শিক্ষকের বাসায় পড়াশোনা শেষ করেই তিনি মিছিলে গিয়েছিলেন– যে মিছিল হলো তাঁর শহীদি কাফেলায় নাম লেখানোর মিছিল।

শাহাদাত

১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭। স্বৈরাচারী শাসক এরশাদের পালিত সন্ত্রাসী বাহিনীর শিকার হয়েছিলেন ইসলামী আন্দোলনের দুই কিশোর কর্মী– ১০ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র শিবিরকর্মী শহীদ আমীর হোসাইন এবং আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম।

ওই বছরেরই ১২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পটিয়ায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১০ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে জাতীয় ছাত্রসমাজের হামলার প্রতিবাদে এবং সেই হামলায় শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকীউল্লাহর হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে সেদিন চট্টগ্রামে হরতাল আহ্বান করে শিবির। হরতাল শেষে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল চত্বরে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের নেতৃত্বে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। লালদিঘীর উদ্দেশ্যে মিছিলটি যখন জেনারেল হাসপাতাল অতিক্রম করছিল ঠিক তখন হাসপাতালের পাহাড় ও পাশের ভবন থেকে একের পর এক ১২টি পেট্রোল

www.pathagar.com

বোমা নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসীরা, একই সাথে নির্বিচার গুলি চালায়। বোমার ধোঁয়ায় পুরো এলাকা ঢেকে যায়। হামলার আকস্মিকতায় শিবিরকর্মীরা প্রথমে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও পরক্ষণে সুসংগঠিত হয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করে। এরই মধ্যে দেখা যায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন রাস্তায় আল্লাহর এক প্রিয় মানুষের রক্তাক্ত দেহ পড়ে আছে– মোহাম্মদ আমীর হোসাইন শহীদ হয়েছেন। বোমা ও গুলির আঘাতে শহীদের শরীরের অনেকাংশ উড়ে গেছে, বাকিটাও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত; শহীদের রক্তে রাস্তার কালো পিচ লাল হয়ে আছে। মিছিলের সঙ্গীরা তাঁকে খুঁজে পাওয়ার কিছু পরেই আল্লাহর কাছে চলে গেলেন তিনি।

ওদিকে সারা শহরে খবর ছড়িয়ে গেল আহত ভাইদের জন্য রক্ত প্রয়োজন। মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে দলে দলে ছুটে আসতে লাগলেন শিবিরকর্মীরা। ব্লাড ব্যাংকে প্রচণ্ড ভিড়। 'আমি আগে, আমি আগে' বলে আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির অধীর আগ্রহ ব্যক্ত করতে থাকেন কর্মীরা। এ দৃশ্য দেখে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স সবাই অবাক হয়ে যায়। কী অপূর্ব সে দৃশ্য! ওদিকে জেনারেল হাসপাতালের সামনে বোমা ও গুলিতে ত্রাসের এক রাজত্ব কায়েম হওয়ার পরক্ষণেই সংঘবদ্ধ শিবিরকর্মীরা ঘিরে ফেলে সে ভবনটি– সামনেই সশস্ত্র ঘাতক এ কথা জানার পরও ছাত্রশিবিরের বীর মুজাহিদরা সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যান তাদের হাতে-নাতে ধরার জন্য। বারজন হামলাকারীকে তারা আটক করেন এবং তাদের পুলিশে সোপর্দ করে দেন। হাসপাতালের ছাদ থেকে উদ্ধার করা হয় ২টি তাজা বোমা ও দুটি বিচ্ছিন্ন আঙুল। পরে পুলিশ এসে শিবিরকর্মীদের সহযোগিতায় আরো চারজন হামলাকারীকে আশপাশের লোকালয় থেকে গ্রেফাতর করে।

শহীদ হওয়ার পূর্বে যা বললেন

"এক আমীর মারা গেলে লক্ষ আমীর আছে। মা, তোমার সাথে আমার জান্নাতে দেখা হবে।"

মায়ের প্রতিক্রিয়া

"শহীদের মা হয়ে আমি গর্বিত। তাঁর ছোট ভাইদেরকেও সংগঠনের কাজ করে শহীদ হতে বলি।"

নিজ এলাকায় তাঁর শাহাদাতের প্রভাব

স্থানীয় শিবিরকর্মী মহিউদ্দিন বলেন, শহীদ আমীর হোসাইনের শাহাদাতের পূর্বে আমরা স্থানীয় তরুণ সমাজ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে তেমন কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমির ভাইয়ের মৃত্যুর কথা শুনে তাঁর বাড়িতে ছুটে গিয়েছিলাম। তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে আমাদের এলাকার তরুণ সমাজ ইসলামী আন্দোলনের সাথে পরিচিত হয়। আজ এ এলাকা শহীদ আমিরের রক্তের বিনিময়ে ইসলামী আন্দোলনের পুণ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ আমীর হোসাইন

পুরো নাম : মো: আমীর হোসাইন

মায়ের নাম : মোসাম্মৎ খায়রুন্নেছা

বাবার নাম : মো: মোয়াজ্জেম হোসেন

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- ভাটিরটেক, ডাক- ধর্মপুর হাজির হাট, ইউনিয়ন- ৭ নং ধর্মপুর (৬ নং ওয়ার্ড), থানা- সুধারাম (সদর), জেলা- নোয়াখালী

জন্ম : ১৯৬৯ সাল

সাংগঠনিক মান : কর্মী

সর্বশেষ পড়াশোনা : দশম শ্রেণী

সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের নাম : রেলওয়ে স্টেশন কলোনি উচ্চবিদ্যালয়

জীবনের লক্ষ্য : শহীদ হওয়া (আল্লাহর দ্বীন অনুসারে জীবন পরিচালনা করা)

আহত হওয়ার স্থান : লালদীঘির পাড়, মিছিলে বোমার আঘাতে

আঘাতের ধরন : শরীরের নিচের অংশের অর্ধেক উড়ে যাওয়া

শাহাদাতের স্থান ও তারিখ : আন্দরকিল্লা, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭

যাদের আঘাতে শহীদ : জাতীয় ছাত্রসমাজ

ভাই-বোন : ৫ ভাই, ৩ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়

www.pathagar.com

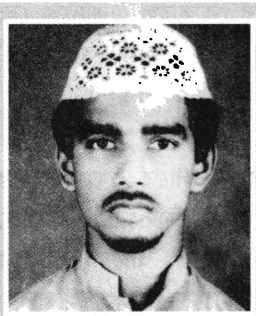

১৭

শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম

১৯৭১ সালের ১ মে চট্টগ্রামের মিয়াজি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম। তাঁর বাবার নাম মাওলানা শাহ সুফী আব্দুল জব্বার। ৩ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে শহীদ ছিলেন দ্বিতীয়।

শিক্ষাজীবন

চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে সালে কুরআন হিফজ শেষ করেন শহীদ। এরপর প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করেন কুমিরাঘোনা আখতারুল উলুম মাদ্রাসায়। পরে ১৯৮২ সালে বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্রাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ওই মাদ্রাসা থেকেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৬ সালে দাখিল পরীক্ষায় হিফজুল কুরআন বিভাগে সপ্তম স্থান অধিকার করেন। মাদ্রাসাটির ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম বোর্ডের বৃত্তিধারী ছিলেন। মেধাবী আব্দুর রহীম মাদ্রাসা ছাত্রাবাসের ১ নম্বর কক্ষে থাকতেন এবং শহীদ হওয়ার প্রাক্কালে আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

লেখক আব্দুর রহীম

অল্প বয়সেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখনী সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা-সাময়িকীতে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর 'জিহাদের যৌক্তিকতা', 'জাগো মুসলিম' ইত্যাদি প্রবন্ধ সবাইকে দ্বীনের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

সাংগঠনিক জীবন

শহীদ আব্দুর রহীমের সাংগঠনিক মান ছিল কর্মী। তিনি বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯৮৩-১৯৮৪)। শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আলিম উপশাখার সভাপতি ছিলেন।

শাহাদাত

১৪ ফেব্রুয়ারির সেই দিনে অসংখ্য আহতদের সাথে হাফেজ আব্দুর রহীমকেও নেয়া হয়েছিল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক ঘোষণা করলেন

www.pathagar.com

প্রিয়ভাই আব্দুর রহীম পৃথিবীর মায়া ছেড়ে, পৃথিবীর সব কোলাহল একদিকে রেখে মহান রবের দরবারে চলে গেছেন। মুহূর্তে শোকের কালো ছায়া আর কান্নার মোনাজাতে ভারী হয়ে উঠল হাসপাতাল। তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৭তম শহীদ।

জানাজা ও দাফন

শহীদের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় লোহাগাড়ার বটতলীতে, ইমামতি করেন মাওলানা মাসউদুর রহমান। দ্বিতীয় নামাজে জানাজা কুতুব উদ্দীনের ইমামতিতে কুমিরাঘোনায় অনুষ্ঠিত হয়। এ নামাজে মানুষের ঢল নামে। গ্রামের বাড়িতেই পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয় প্রাণপ্রিয় শহীদ ভাই হাফেজ আব্দুর রহীমকে।

শহীদ হওয়ার আগে

শহীদ হওয়ার আগের রাতে হরতাল সম্বন্ধে আলোচনাকালে শহীদ হাফেজ আব্দুর রহীম বলেছিলেন, 'প্রয়োজনে গায়ের রক্ত দিয়ে হলেও হরতাল হবে।' হরতালের দিন সকালে তাঁর আব্বাজানের খাদেম মো: শাকি'র সাথে দেখা হলে তাকে বলেছিলেন, 'পিকেটিংয়ে যাচ্ছি, সেখানে প্রয়োজনে রক্ত দেবো, এর বিনিময়ে হয় শহীদ হবো না হয় গাজী হবো।' আল্লাহ তাঁকে শহীদ হিসাবে কবুল করেছেন। পিকেটিংয়ে যাবার সময় ট্র্যাক স্যুট পরাতে তাঁর বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল। তখন তাঁর মন্তব্য ছিল– 'এরকম জিহাদে গেলে এ ধরনের ড্রেস পরতে হয়।' পিকেটিং শেষে গোসল সেরে প্রতিবাদ সমাবেশ করার পূর্বে মাদ্রাসার নিকটস্থ আজমির হোটেলে বন্ধুদের চা খাওয়ানোর সময় জনৈক আব্দুল হামিদের প্রশ্ন : আজ তুমি কেন চা খাওয়াচ্ছ? জবাবে শহীদ বললেন, 'দোয়ার জন্য।'

বাবার প্রতিক্রিয়া

শহীদের পিতা বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল জব্বার (রহ) ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে শোক ও আনন্দের মিশ্র অনুভূতিতে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় শহীদের সৌভাগ্যবান পিতা বলেন, 'আল্লাহ দিয়েছে, আল্লাহ নিয়ে গেছে। আল্লাহ তুমি তাঁর শাহাদাতকে কবুল কর।' পরে শহীদের গ্রামের বাড়ি কুমিরাঘোনায় এক আলোচনা সভা ও দোয়ার মাহফিলে তিনি বলেন, 'শহীদের গৌরবান্বিত পিতা হওয়ার সৌভাগ্যে আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করছি। আমার সন্তানের মত হাজারও শহীদের শাহাদাতের বিনিময়ে যেন এদেশে ইসলামী সমাজ কায়েম হয় এবং মানুষ মুক্তির দিশা পায়।'

মাদ্রাসার প্রতিক্রিয়া

মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আবুল হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি। প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড. আব্দুল করিম। সেখানে শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষকের ভাষ্য

শিক্ষকরা জানান– শহীদ হাফেজ আব্দুর রহীম ছিলেন মেধাবী, অমায়িক, আদর্শবাদী, সৎচরিত্রের অধিকারী।

শহীদের নিজ হাতে লেখা প্রবন্ধ

জিহাদের যৌক্তিকতা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন মজিদে এরশাদ করেছেন- "তোমরা নামাজ কায়েম কর।" ঠিক তিনি অনুরূপভাবে আরো এরশাদ করেছেন- "তোমরা দ্বীন (ইসলাম) কায়েম কর।" পৃথিবীর প্রত্যেকটি মতবাদের প্রবর্তক কামনা করেন যে, তার মতবাদ কায়েম করা হোক। তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অন্যতম সংগ্রাম হচ্ছে দ্বীন ইসলাম কায়েম করা। কারণ ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য মতবাদ বাতিল। এ বাতিল মতবাদের যারা অনুসারী তারাও বিশ্বাস করে যে, আমাদের মতবাদ সংগ্রাম ছাড়া কায়েম হতে পারে না। তারা তাদের মতবাদ কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করে, জীবন বিসর্জন দেয়। তারা জীবন দেয় নরকের উদ্দেশ্যে। আর প্রয়োজনবোধে আল্লাহতায়ালা মানুষের জীবন চান জান্নাতের বিনিময়ে। যেখানে বাতিলের অনুসারীরা বোঝে যে, সংগ্রাম ভিন্ন সত্য (?) কায়েম হতে পারে না, সেখানে সত্যের অনুসারীরা বোঝে যে, সংগ্রাম ভিন্ন সত্য কায়েম হয়ে যাবে? তা কি কোনো যুগে হয়েছিল? পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত মতবাদের উদ্ভব হয়েছে তাদের প্রত্যেকটির প্রথম দৃষ্টি ছিল আমাকে বিশ্বাস কর। যেমন রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রথম দাবি ছিল আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন কর। সে দাবি কিছু লোক মানল। তাদের এ মানাটাকে যদি মুসলমানদের ন্যায় আরবিতে কালেমা পড়ে স্বীকার করা হত, তবে তাদের কালেমা, 'আমানতু বি লেলিনবাদ ওয়াবি মার্কসবাদ' হতো। যারা এ মতবাদ মানল তারা ঐ কালেমা পড়ে তাদের অনুসারী হল। অতঃপর ঐ মতবাদ তাদের নিকট দাবি কর যে, আমাকে শুধু স্বীকার করলে হবে না, বরং আমাকে কায়েম করতে হবে। অনুসারীরা জিজ্ঞাসা করল, কিভাবে কায়েম করব? উত্তরে মতবাদ বলল, তোমরা সংগ্রাম কর, জান দাও মাল দাও। তার অনুসারীরা তাই-ই করল। ঊনিশ লক্ষ লোক জীবন দিল, বহু ধনদৌলত বিসর্জিত হল, তারপর সেখানে কায়েম হল তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত মতবাদ।

তেমনি চীনে এক মতবাদের উদ্ভব হলো- এর নাম হচ্ছে মাওবাদ। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা কালেমা পড়ল, 'আমানতু বি মাওবাদ'। তাদের মাওবাদও দাবি করল যে, আমাকে শুধু বিশ্বাস করলে হবে না বরং আমাকে কায়েম করতে হবে। অতঃপর তার সাথীরা জানমাল দিয়ে সংগ্রাম করে তাদের সেই মতবাদ চীনে কায়েম করল।

সৃষ্টির আদি হতে আল্লাহর প্রতিনিধিদের জন্যে এই নিয়ম ইসলাম বলে দিয়েছে। আল্লাহর বাণী, "তোমাদের মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর।" এই

www.pathagar.com

জানমাল কুরবানি ছাড়া অতীতে কোনো দিন ইসলাম কায়েম হয়নি। এ যুগেও হচ্ছে না, ভবিষ্যতেও হবে না। এখানে আল্লাহতায়ালা যে জানমাল চেয়েছেন, সে জানমাল রাস্তায় ছড়ালেও ইসলাম কায়েম হবে না। বরং তা আল্লাহর পথে দান করতে হবে সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পন্থায়। সে পন্থা হল জামায়াতবদ্ধ অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে নবী করীম (সা)-এর ন্যায় ইসলামী আন্দোলন করে যাওয়া।

মৃত্যু হচ্ছে জীবনের দুটি পর্যায়ের মাঝখানে একটি দরজা মাত্র। এর এ পাশটা কর্মের জীবন, আর ও পাশটা ভোগের জীবন। জীবনের এ পার্শ্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই ও পার্শ্বে গিয়ে সুখ ভোগ করা যাবে। নবী করীম (সা)-এর সাথীদের মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল বলেই অতি দ্রুত সারা পৃথিবীতে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ইসলামী হুকুমত কায়েম করা সম্ভব হয়েছিল।

অনেকে ধারণা করেন যে, আলেমগণ আওয়াজ করেই সমাজে দ্বীন কায়েম করে ফেলবেন। কারো বা ধারণা তাবলিগ করতে করতে একদিন আপনা আপনি দ্বীন ইসলাম কায়েম হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন রাখি- অতীতে কোন যুগে হয়েছিল? তা যদি না হয় তবে ইসলাম কায়েমের থিওরি কী এ যুগে পাল্টে গেল? ওয়াজের পেছনে সংগ্রামী সংগঠন ও বিপ্লবী কর্মসূচি থাকতে হবে; না হয় যেমন বিনা সংগঠনে অতীতে কোনো কাজ হয়নি, বর্তমানে হচ্ছে না, তেমনি কোনো যুগেও তা হবে না। আর যদি কোনো দিন সংগঠন সংগ্রাম ছাড়া বিপ্লব কায়েম হবে সেই দিন বলা যাবে যে ইসলাম কায়েমের থিওরি যা আল্লাহ প্রত্যেক নবী (সা)-কে দিয়েছেন আজ তা পাল্টে গেল।

বড় ভাই মাওলানা আব্দুল হাই নদভী-এর বক্তব্য

তিনি বলেন, সে খুব মেধাবী ছিল। ছয় থেকে বারো মাসের মধ্যে কুরআন হেফজ করে। সহজ-সরল ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিল। অল্পভাষী ছিল কিন্তু সবার সাথেই মিশত। শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে যার শুরু আব্দুর রহীমের মত অসংখ্য শহীদের মাধ্যমে হয়েছে। তাদের রক্তের বিনিময়ে দেশে সত্যিকার ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এটাই সবার প্রত্যাশা। শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দাওয়াতী কার্যক্রমের ওপর আরো বেশি জোরদানের পরামর্শ দেন তিনি। তিনি এজন্য ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারেরও পরামর্শ দেন।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

নাম : হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুর রহীম

মায়ের নাম : মানসুরা বেগম

বাবার নাম : শাহ মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার

ভাই-বোন : ৩ ভাই ও ৫ বোন

ভাই-বোনের মধ্যে অবস্থান : ৫ম

পরিবারের মোট সদস্য : ৮ জন

স্থায়ী ঠিকানা : মিয়াজীপাড়া, বড় হাতিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

জন্ম : ১৯৬৬ সাল

সাংগঠনিক মান : কর্মী

পড়াশোনা : আলিম ১ম বর্ষ (১৯৮৬), দাখিল স্ট্যান্ড (দেশের মধ্যে মেধাতালিকায় ৭ম)

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্টগ্রাম

জীবনের লক্ষ্য : আলেম হওয়া

কৃতিত্ব : বিপ্লবী হাফেজ আব্দুর রহীম ছিলেন একজন লেখক। অতি অল্প বয়সেই তাঁর লেখা কিছু পত্রিকায় প্রকাশ পায়

আহত হওয়ার স্থান : চট্টগ্রাম শহরে আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতালের সামনে

আঘাতের ধরন : বোমার আঘাতে শহীদ

যাদের হাতে শহীদ : স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের মদদপুষ্ট জাতীয় ছাত্রসমাজ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসী

শাহাদাতের তারিখ : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, শনিবার, বেলা ১টা ২০ মিনিট

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

www.pathagar.com

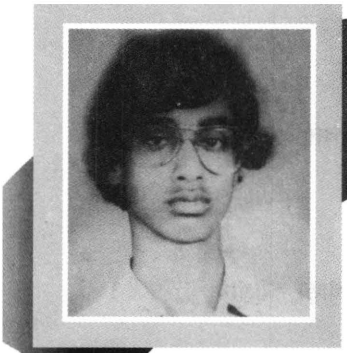

১৮

শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রাম; বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এক রক্তঝরা শহীদি ময়দান। আন্দোলনের রক্তপিচ্ছিল এ ময়দানে শাহাদাতের প্রেরণায় উজ্জীবিত অসংখ্য তরুণ বাতিলের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। শাহাদাতের এমনি এক অধ্যায়ের নায়ক শহীদ জসিম উদ্দিন। খোদাদ্রোহী শক্তির হামলায় ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ আহত হয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি সুবেহ সাদেকের সময় শাহাদাত বরণ করেন তিনি।

জসিম উদ্দিনের বেড়ে ওঠা

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার পূর্ব সরফভাটা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন জসিম উদ্দিন। তাঁর পিতা মাস্টার খলিলুর রহমান ও মাতা মরিয়ম বেগম ছিলেন খুবই ধার্মিক। শহীদ জসিম ছোটকাল থেকেই আল্লাহর পথে নিবেদিত সাচ্চাদিল মুজাহিদ ছিলেন। তিনি নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন এমনভাবে; যেন দ্বীনের কাজ করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান লক্ষ্য।

শিক্ষাজীবন

শহীদ খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন এবং শাহাদাতকালে তিনি ইমাম গাজ্জালী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন

শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী ইমাম গাজ্জালী কলেজে অধ্যয়নকালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

শাহাদাত

১৪ ফেব্রুয়ারি শিবিরের মিছিলে বর্বর বোমা হামলায় দু'জন কর্মী খুনের প্রতিবাদ ও খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে ১৮ ফেব্রুয়ারি শিবির দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা করে। এ উপলক্ষে ঢাকার ফুলবাড়িয়া ও চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ছাত্র

www.pathagar.com

গণজমায়েতের আয়োজন করা হয়। লালদীঘি ময়দানে সমাবেশের সাড়া পড়ে গিয়েছিল চট্টগ্রাম শহর ছাড়াও আশপাশ উপজেলাগুলোতে। লালদীঘির ময়দান লোকে লোকারণ্য হয়। সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় ছাত্র গণজমায়েত। জমায়েত শেষে লোকজন স্ব-স্ব গন্তব্যে পৌঁছার পূর্বেই ঘটানো হলো আরো এক নৃশংসতা।

ওইদিন বেলা ১২টা থেকেই রাঙ্গুনিয়ার শিবিরকর্মীরা লালদীঘি ময়দানে জমায়েতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, কিছু সংখ্যক শিবিরকর্মী রাঙ্গুনিয়া শিবির অফিসে সমবেত হন। জোহরের নামাজ পড়ে সবাই রওয়ানা হবে ঠিক করেন, অনেকে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়েছিলেন, এমন সময় মানবতার দুশমন ফ্যাসিস্টরা রাঙ্গুনিয়া শিবির অফিসে হামলা চালায়। হামলাকারীরা কিরিচ, ছোরা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে শিবিরকর্মীদের নির্বিচারে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। ৬ জন শিবিরকর্মীকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তাঁদের মধ্যে জসীম উদ্দিন চৌধুরীর অবস্থা মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটে, শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। হাসপাতালের শয্যায় অবিরাম রক্ত দেয়ার পরও তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক হয়নি, ছোরার আঘাতে ফুসফুস ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল তাঁর, রাতভর জ্ঞান ফেরেনি। এভাবে দীর্ঘ সাড়ে ষোল ঘণ্টা কঠিন যন্ত্রণায় ভোগার পর পরদিন ১৯ ফেব্রুয়ারি সুবহে সাদিকের সময়, ৫.১৫ মিনিটে তিনি মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান। তাঁর শাহাদাতের খবর যেন বিদ্যুৎবেগে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। শহীদের সাথীরা দলে দলে ভিড় জমায় হাসপাতালে। তাদের কান্নার রোলে হাসপাতালের পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। বিকেলে লালদীঘি ময়দানে শহীদের নামাজে জানাজার পর লাশ রাঙ্গুনিয়ার পূর্ব সফরভাটা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। সেখানেই চির নিদ্রায় শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন আল্লাহর দ্বীনের এক নিবেদিত মর্দে মুজাহিদ শহীদ জসিম।

জসিমের স্মৃতি আঁকড়ে আছেন মা

শহীদের পিতা আজ আর বেঁচে নেই। মা মরিয়ম বেগম বেঁচে থাকলেও অসুস্থ। ছেলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'জসিমের কথা মনে হলে এখনো তাঁর জামা ও ছবির ওপর হাত বুলিয়ে মনকে বোঝাই। তাঁর কথা মনে পড়লে কান্নায় বুক ফেটে যায়। আমি তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন সে বেহেশতে শান্তিতে থাকতে পারে।'

জসিম উদ্দিন মাহমুদের জীবন থেকে

শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী সরফভাটা উচ্চবিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় তাঁর মামা হাজী ফজলুল হক ফার্মেসিতে বসতেন। তাঁর মামা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'আমার এখনো স্মরণে আছে জসিম দেশের প্রতি নাগরিকের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত দেশের খবর রাখতেন। তবে টিভি দেখতে তাঁর আগ্রহ ছিল না, রেডিওতে খবর শুনতেন। একদিন শহীদ জসীমের বন্ধুরা দুষ্টুমি করে তাঁকে জোর করে টিভির সামনে বসিয়ে দেয়। জসিম উদ্দিন খুব ক্ষুব্ধ হন এবং টিভি রুম থেকে বেরিয়ে আসেন।'

একনজরে শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরী

নাম : জসিম উদ্দিন চৌধুরী

মায়ের নাম : মরিয়ম বেগম

পিতার নাম : মাস্টার খলিলুর রহমান

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- পূর্ব সরফভাটা, থানা- রাঙ্গুনিয়া, জেলা- চট্টগ্রাম

সাংগঠনিক মান : সাথী

সর্বশেষ পড়াশোনা : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ইমাম গাজ্জালী কলেজ

জীবনের লক্ষ্য : ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

আহত হওয়ার স্থান : রাঙ্গুনিয়া শিবির অফিস

আঘাতের ধরন : রামদা, রড দিয়ে মাথায় আঘাত

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রসেনা

শাহাদাতের তারিখ : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭, ভোর ৫.১৫টা

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

খুনিদের বিচার : শহীদের খুনি আব্দুর রহমান ও মুছা কাদেরী এ খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মাথায় নিয়ে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করছে।

www.pathagar.com

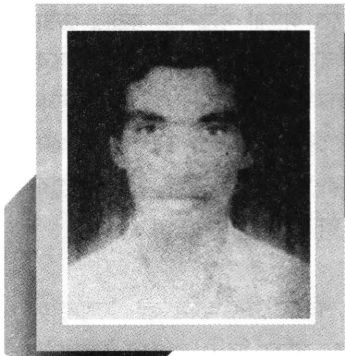

১৯

শহীদ আব্দুল আজিজ

মানুষের মুক্তি আর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে সমাজে আল্লাহর দ্বীনের কাজ আনজাম দিতে গিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এ যাবৎ অসংখ্য মানুষ নিজেদের জান কুরবান করেছেন– শহীদ আব্দুল আজিজ তাঁদের একজন। এ মহান মানুষটি বাংলাদেশে কুরআন ও হাদিসের পতাকাকে সমুন্নত করতে নিজের জান বিলিয়ে দিয়েছেন অকুণ্ঠভাবে, ইসলামী আন্দোলনের ভাইদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

ব্যক্তিগত পরিচয়

বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ১৯তম শহীদ হলেন শহীদ আব্দুল আজিজ। তিনি নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার সাতজান গ্রামে ২৫ মার্চ, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ আব্দুল আজিজ মা-বাবার বড় সন্তান। ৫ ভাই ও ১ বোন তাঁরা। বাবার নাম মোহাম্মদ মোবারক আলী।

শিক্ষাজীবন

নীলফামারী জেলার জলঢাকার গোলমুন্ডা দ্বি-মুখী উচ্চবিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তরের লেখাপড়া করেন শহীদ। তিনি এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ১৯৮৩ সালে এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে রংপুর সরকারি বাণিজ্য ইনস্টিটিউট হতে প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা ইন-কমার্স-এ উত্তীর্ণ হন ১৯৮৫ সালে। ১৯৮৬ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল সরকারি মহাবিদ্যালয়ে হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। শাহদাতের সময় সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন

ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে শহীদের পরিচয় ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে। তিনি ১৯৮০ সালে সমর্থক হন। তখন থেকেই তিনি ইসলামকে সবুজ-শ্যামল এই বাংলার জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি শুধু সমর্থক হয়েই বসে থাকেননি,

www.pathagar.com

নিজের মান উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামী আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৮১ সালে সংগঠনের কর্মী হন এবং ১৯৮৩ সালে সাথী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। সাথী হওয়ার পরপরই ইসলামী ছাত্রশিবিরের সর্বোচ্চ সম্মানজনক স্তর– 'সদস্য' হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৮৫ সালের ১৩ মে সংগঠনের সদস্য স্তরে উন্নীতও হন। শাহাদাতবরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি রংপুর শহর শাখার স্কুল বিভাগের উত্তর অঞ্চলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শাহাদাত

শহীদ বলতেন, 'রংপুরে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ যেন আমি হই।' আল্লাহ তাঁর এ আন্তরিকতাপূর্ণ দোয়া কবুল করেছেন। সত্যি সত্যি তিনি রংপুরে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদ হলেন, হাসিমুখে চলে গেলেন আল্লাহর কাছে, পেছনে ফেলে গেলেন চিন্তা-তৎপরতা-ত্যাগের স্মৃতিময় দিনগুলো। শাহাদাতকালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য এবং রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের নির্বাচিত মিলনায়তন সম্পাদক ছিলেন তিনি।

২৫ আগস্ট, ১৯৮৭; রংপুর কারমাইকেল কলেজ, ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ শান্ত-স্বাভাবিক। সকাল ১১টার দিকে আব্দুল আজিজসহ ছাত্র-সংসদের নেতৃবৃন্দ বাজেট অধিবেশন, মেডিক্যাল সেন্টার, কলেজ গেট নির্মাণ ও অন্যান্য ছাত্রসমস্যা নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষের অফিস কক্ষে আলোচনারত ছিলেন। এ সময় বামপন্থী দাবিদার ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসীরা কোনো কারণ ছাড়াই অফিসের বাইরে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। কলেজ অধ্যক্ষ মিটিং স্থগিত করে বাইরে এসে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে তারা শহীদ মিনারের দিকে চলে যায় এবং সলাপরামর্শ করে একটি মিছিল বের করে। নানা ধরনের সন্ত্রাসমূলক স্লোগান দিয়ে পরিস্থিতি অশান্ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু শিবিরকর্মীরা এ ধরনের উস্কানির মুখেও চরম ধৈর্য ধারণ করেন। এরই মাঝে জোহরের নামাজের আজান হয়ে গেলে শিবিরকর্মীরা মসজিদের দিকে অগ্রসর হন। মসজিদে যাবার সময় তাজুল, সবুর, মোশাররফ, জাহাঙ্গীর, জিন্নার নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা রামদা, হকিস্টিক, লাঠি নিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ চালায়। খুনিরা আব্দুল আজিজকে কিরিচ, রামদা এবং চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করে পালিয়ে যায়। আহত আজিজকে তাঁর বন্ধুরা রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের শয্যায় কাটে যন্ত্রণাময় আটটি দিন। ২ সেপ্টেম্বর ভোররাত ৩টা ৪৫ মিনিটে অসুখ-শয্যায় পড়ে রইলো শুধু আব্দুল আজিজের দেহখানি, আব্দুল আজিজ পাড়ি জমালেন পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে।

তিনি শপথ গ্রহণ করেছিলেন– "নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছুই সারাজাহানের রব আল্লাহর জন্য।" আর তার বাস্তবায়ন করেও গেলেন তিনি।

www.pathagar.com

পরিবারের প্রতিক্রিয়া

আব্দুল আজিজের শাহাদাতের খবর যখন ছড়িয়ে পড়ল ডিমলা উপজেলার সাতজান গ্রামে, তখন দরিদ্র কৃষক বাবা আর অসহায় মা প্রিয় সন্তান বিয়োগের বেদনায় একবারে মুষড়ে পড়লেন। বাবা-মায়ের কত স্বপ্ন ছিল আবদুল আজিজ এমএ পাস করে বড় চাকরি করবেন এবং তাদের দরিদ্র পরিবারে সুখ নেমে আসবে। তাদের সে স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। আব্দুল আজিজের ছোট ছোট ভাই-বোনদের অসহায় মুখ দেখে হতাশা, যন্ত্রণা ও কান্নায় ভেঙ্গে গেল বাবা-মায়ের স্নেহাতুর বুক।

সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া

প্রিয় ছাত্র বিয়োগের বেদনায় হতবাক হয়ে গেলেন কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণ। ডুকরে কেঁদে উঠল আবদুল আজিজের সহপাঠীরা, দলে দলে আসতে লাগল শত শত স্কুল ছাত্র- আব্দুল আজিজ যাদেরকে দ্বীনের পথে ডাকতেন। ছুটে আসতে লাগল জুম্মাপাড়ার (যেখানে শহীদ আজিজ লজিং থাকতেন) সর্বস্তরের জনগণ। তারা সবাই ছুটে আসছিল এক নজরে তাদের প্রিয় আজিজ ভাইকে দেখার জন্য। তারা হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাল।

ইসলামের সুমহান আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য যেসব ত্যাগী ব্যক্তিত্ব নিজেদের মূল্যবান জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের মাঝে শহীদ আব্দুল আজিজের নাম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামী সংগঠনের ত্যাগী কর্মীরা শহীদের সহজ-সরল জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ আব্দুল আজিজ

নাম : মো: আব্দুল আজিজ

মায়ের নাম : মোছাম্মাৎ আছমা খাতুন

বাবার নাম : মো: মোবারক আলী

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- সাতজান, ডাকঘর- কাকরাবাজার, থানা- ডিমলা, জেলা- নীলফামারী

পরিবারের মোট সদস্য : ৯ জন

ভাই-বোনের সংখ্যা : ৭ ভাই, ১ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়

জন্মতারিখ : ২৫ মার্চ, ১৯৬৮

সাংগঠনিক মান : সদস্য

সর্বশেষ দায়িত্ব : রংপুর শহর শাখার স্কুল বিভাগের উত্তর জোনের সভাপতি

আহত হওয়ার স্থান : রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মসজিদ প্রাঙ্গণ

আঘাতের ধরন : রামদা, হকিস্টিক, লাঠি

যাদের আঘাতে শহীদ : তাজুল, সবুর, মোশাররফ, জাহাঙ্গীর, জিন্নার নেতৃত্বে বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসী বাহিনী

শাহাদাতের তারিখ ও সময় : ২ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ , ভোর ৩.৪৫ মিনিট

শাহাদাতের স্থান : রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

সর্বশেষ পড়াশোনা : রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ

বিষয় ও বর্ষ : হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ (সম্মান ১ম বর্ষ, পুরাতন)

সমর্থক ও কর্মী হওয়ার সময় : ১৯৮০, ১৯৮১ সাল

সাথী হওয়ার সময় : ১৯৮৩ সাল

সদস্য হওয়ার তারিখ : ১৯৮৫ সালের ১৩ মে

www.pathagar.com

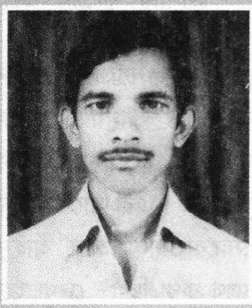

২০

শহীদ আইনুল হক

ছাত্ররাজনীতি প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং নিজের স্বৈরাচারী শাসনকে ঝুঁকিমুক্ত করতে সামরিক শাসক এরশাদ এক ভয়ঙ্কর অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন– সারা দেশের ক্যাম্পাসগুলোতে গড়ে তুলেছিলেন পোষা সন্ত্রাসী বাহিনী– 'জাতীয় ছাত্রসমাজ'। ওই বাহিনীর ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের কারণে শিক্ষাঙ্গনগুলোর পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে সেই শাসনামলে। দেশের অন্যতম বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও ওই সন্ত্রাসের বাইরে ছিল না। ১৯৮৮ সালের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্রসমাজের সন্ত্রাসীরা প্রায় একমাস জুড়ে চরমতম সন্ত্রাস চালায়, এ সময় আইনুল হক শাহাদাতবরণ করেন।

ব্যক্তিগত পরিচিতি ও শিক্ষাজীবন

শহীদি কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২০তম শহীদ হলেন আইনুল হক। শহীদ আইনুল হক ছিলেন গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর থানার মহারাজপুর গ্রামের হারেস মুন্সির ছেলে। তিনি তাঁর তিন ভাই ও এক বোনের মাঝে সবার বড়। শহীদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন তথ্য পাওয়া যায়নি। শাহাদাতকালে তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের এমএসসি শেষ পর্বের ছাত্র ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে খুবই দক্ষ, সাহসী ও মেধাবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন শহীদ।

শাহাদাত

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে সরকার ১৯৮৭ সালের নভেম্বরের শেষার্ধে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ করে দেয়। দীর্ঘ ৬০ দিন বন্ধ থাকার পর ১৯৮৮ সালে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেয়। সে অনুযায়ী সে বছরের ৭ জানুয়ারি আবাসিক হলগুলো ও ১০ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ছিল। কিন্তু সন্ত্রাসী ছাত্রসমাজের কুখ্যাত হামিদ বাহিনী ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের সময় ২টি বাস, ১টি মাইক্রোবাস ও

www.pathagar.com

১টি জিপে করে গুলি করতে করতে ক্যাম্পাসে ঢুকে দখলদারি কায়েম করে। দখলকৃত ক্যাম্পাসে সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা ভয়াবহ তাণ্ডব চালায়।

সে সময় আইনুল হক ও তাঁর বন্ধু হাবিবুর রহমান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে ছিলেন- কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম ঘুরতে ঢাকা থেকে রওয়ানা করে ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম পৌঁছেছিলেন তাঁরা। একদিন চট্টগ্রাম অবস্থান করে পরদিন অর্থাৎ ১৫ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে রওয়ানা হন দু'জন। এর আগে কখনও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাননি তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলে আইনুল হকের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকতেন– হাবীব রেজা। বন্ধুর সাথে কথা ছিল– দেখা হবে, সুতরাং যাওয়া। কিন্তু তাঁরা ক্যাম্পাসের অবস্থা ঠিকঠিক জানতেন না। ক্যাম্পাস যখন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দখলে, যখন সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছেন না, তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রোভিসি, শিক্ষক সমিতি এবং দশটি সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন সংবাদমাধ্যমে বারবার জানাচ্ছিলেন যে, 'পরিবেশ পরিস্থিতি স্বাভাবিক, ছাত্ররা ক্রমশ হলে ফিরে আসছে' ইত্যাদি। এসব বানানো গল্পের কারণেই অনেকেই দূরের বাড়ি থেকে এসে ভোগান্তিতে পড়েছিলেন।

১৫ তারিখ সকাল এগারোটার দিকে রিকসায় করে ক্যাম্পাসে পৌঁছেছিলেন দুই বন্ধু। টহলরত সন্ত্রাসীদের একদল এসে তাঁদের জোর করে থামায়, সাথে থাকা অর্থ-কড়ি জিনিসপত্র কেড়ে নেয় এবং দু'জনকে আটকে আলাওল হলে নিয়ে যায়। তারপর শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন, রাইফেলের বাট আর রড দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর। ৬/৭ জন মিলে তীব্রভাবে মারতে শুরু করে আইনুল হককে, এক পর্যায়ে রক্তাক্ত আইনুল জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে পড়ে যান। ঘাতকরা তাঁকে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যায়। সেই থেকে হাবিব আর তাঁর বন্ধুর হদিস পাননি সামনা-সামনি।

ওদিকে হাবিবকে আলাওল হলের ২২১ নম্বর কক্ষে একটানা ০৬.০২.১৯৮৮ তারিখ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে পটিয়ায় নিয়ে গিয়ে ১৭.০২.১৯৮৮ তারিখ পর্যন্ত হাতে-পায়ে লোহার বেড়ি দিয়ে আটকে রাখে সন্ত্রাসীরা। দীর্ঘ ৩৩ দিন পর দুর্বৃত্তরা হাবিবকে চোখ বন্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম শহরে এনে ছেড়ে দেয়। হাবিব ঢাকায় ফিরে আসেন, কিন্তু আইনুলের সন্ধান মেলেনি আর। আইনুল হকের জন্য তাঁর পিতা-মাতা, ভাই-বোন হন্যে হয়ে এদিক-সেদিক তালাশ করেন। দুর্বৃত্তরা যে আইনুল হককে হত্যা করেছে তা নিশ্চিত। হাবিব ছাড়া পেয়ে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দী দেন। অবশ্য সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে।

শাহাদাতের পর পিতা-মাতার অবস্থা

নিশ্চিত ধারণা করা হয় যে, কুখ্যাত হামিদচক্র আইনুল হককে খুন করে লাশ গুম করেছে। অকালে পুত্র হারানোর শোকে একদিন শহীদের মা ইন্তেকাল করেন। বাবা

www.pathagar.com

হারিস মুন্সি এখনও পাগলের মতো দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পীর দরবেশের কাছে ধরনা দেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পাহাড়ে পাহাড়ে তার সন্তানকে তালাশ করে ফেরেন। কিন্তু কেউই আর ফিরিয়ে দিতে পারে না জান্নাতবাসী শহীদ আইনুল হককে।

একনজরে শহীদ আইনুল হক

নাম : মো: আইনুল হক

মায়ের নাম :

বাবার নাম : মো: হারেস শেখ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- মহারাজপুর, থানা- মোকসেদপুর, জেলা- গোপালগঞ্জ

পরিবারের মোট সদস্য : ৬ জন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়

সর্বশেষ পড়াশোনা : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (এমএসসি, ভূগোল, শেষ বর্ষ)

সাংগঠনিক মান : সাথী (ঢাকা মহানগরী পশ্চিম)

শাহাদাতের তারিখ : ১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৮

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আঘাতের ধরন : রাইফেলের বাট, রড, লাঠি

www.pathagar.com

২১

শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরী

চট্টগ্রামের কাটিরহাট– সন্ত্রাসবাদী ছাত্রলীগের কিলিং স্পট হিসেবে কুখ্যাত। এখানেই ১৯৮৮ সালের ৭ এপ্রিল শাহাদাতবরণ করেন শিবিরকর্মী নাসিম উদ্দিন চৌধুরী। চট্টগ্রাম কলেজে নিজের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দেখে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আর বাড়ি ফেরা হলো না, সন্ত্রাসীদের আঘাতে শহীদ হয়ে চিরতরে চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজে সে সময় মুজিববাদী ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের তাণ্ডব ছিল বেশ। তার মধ্যেও মানুষের মুক্তি আর অধিকারের কথা সাহসের সাথে বলে যাচ্ছিলেন ইসলামী ছাত্রআন্দোলনের কর্মীরা। আন্দোলনের পথে, শান্তির লক্ষ্যে সাহসী মিছিলে নির্যাতন আর শাহাদাত আসবেই– সেটা শিবিরকর্মীরা জানতেন। এমনই এক মিছিল ছিল ১৯৮৮ সালের ৬ এপ্রিল। জোহরের নামাজের বিরতির সময় শিবিরকর্মীরা কলেজ ক্যাম্পাসে সুশৃঙ্খল মিছিল শুরু করে। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে মুখরিত মিছিলে নজরে পড়ার মতো বিষয় দাঁড়ালো এই যে, বিপুলসংখ্যক নতুন ছাত্র যোগ দিয়েছিল মিছিলে। তাতে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের রাজ্যে এমন মুক্তিকামী মিছিল দেখে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের মনে শিবির সম্পর্কে নতুন আশার সঞ্চার হয়।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রাসীরা সেটি মেনে নিতে পারেনি। মিছিল যখন কলেজ শহীদ মিনারের পাদদেশে আসে ঠিক তখনি সমাবেশের ওপর ছাত্রলীগের (সু-র) কর্মীরা হাতবোমা নিক্ষেপ করে। সেই সাথে এলোপাথাড়ি গুলি করতে শুরু করে। ঘটনাস্থলে গুলিবিদ্ধ হন শিবিরকর্মী দিদারুল আলম ও সেলিমসহ আরো অনেকে। গুলি করতে করতে এক পর্যায়ে তারা শিবিরকর্মীদের কলেজের বাইরে নিয়ে যায়। পরে শিবিরকর্মী ও বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিরোধে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। এ ঘটনায় বহিরাগত যুবক আমিনুল করিমসহ আরো কয়েকজন আহত হন। পুলিশ তাদের ফেলে যাওয়া একটি পাইপগান উদ্ধার করে।

www.pathagar.com

শাহাদাতবরণ

নাজিরহাট কলেজ থেকে শান্তিকামী ছাত্র-জনতার প্রতিরোধে সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাস থেকে পালাতে বাধ্য হয়। পরে তাদের বড় আস্তানা কাটিরহাটে একত্রিত হয়। পরদিন ৭ এপ্রিল কাটিরহাটে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা, অস্ত্রের মুখে বাস-কোস্টার থামিয়ে তল্লাশি চালাতে থাকে শিবিরকর্মীদের সন্ধানে। নাসিম উদ্দিন এ খবর জানতেন না। তখন তিনি চট্টগ্রাম কলেজে সদ্য প্রকাশিত ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল দেখে বাড়ি ফেরার পথে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গাড়ি থামিয়ে দেখতে পায় নাসিম উদ্দিনকে। ভীত-সন্ত্রস্ত যাত্রীদের ভিড় থেকে তারা নামিয়ে আনে নাসিমকে।

সেক্যুলার রাজনীতির ধ্বজাধারী সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কর্মীরা রড, ছুরি ও কিরিচের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে তাঁর দেহ। স্টেনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় নাসিমের সারা দেহ। কিরিচের আঘাতে তাঁর মাথা ও হাতে গুরুতর জখম করে। এক পর্যায়ে তাঁকে মৃত ভেবে পাশের বিলে ফেলে সন্ত্রাসীরা চলে যায়। এখানে তিন ঘণ্টা তিনি পড়ে থাকেন। অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা স্থান ত্যাগ করার পর স্থানীয় লোকজন তাঁকে পার্শ্ববর্তী ফটিকছড়ি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখা দিলে তাঁর চাচাতো ভাই ৪ নম্বর ভূজপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাস্টার রজি আহমদ স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরও তাঁর দেহ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে। কিন্তু তিনি পুরোটা সময় মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্কেও সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন অস্ফুট কণ্ঠে– কালেমায়ে শাহদাত তাঁর মুখে ছিল পুরোটা সময়। শিবিরকর্মীরা তাদের মুমূর্ষু ভাইটিকে রক্ষা করতে, রক্ত দান করতে ছুটে আসতে লাগল। তাঁর চাচাতো ভাই মাস্টার রজি আহমদ যখন রক্তের জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলেন, তখন নাসিম বলে ওঠেন, 'আমার আর রক্তের প্রয়োজন নেই, আমি চলে যাচ্ছি রবের নিকট।' একথা শুনে হাসপাতালে পড়ে যায় কান্নার রোল। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ও বাঁচানো গেল না তাঁকে। বিকেল পৌনে পাঁচটায় ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন নাসিম উদ্দিন আর নেই। সকলের সামনেই নাসিম উদ্দিন চলে গেলেন খুনরাঙা পথ বেয়ে জান্নাতের সর্বোত্তম ঠিকানায়।

জানাজা ও দাফন

শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র । সন্ত্রাসীদের হামলা শিবিরকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। মিছিলে উত্তালরূপ নেয় সারা দেশে। পরদিন ৮ এপ্রিল শহীদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মহসিন কলেজ মাঠে। হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ছুটে আসে শহীদের জানাজায় অংশ নিতে। শহীদের লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাঁর গ্রামের বাড়িতে। লাশ যখন নাজিরহাটে পৌঁছে তখন ঘিরে ধরে অপেক্ষমাণ হাজার ছাত্র-জনতা। সেখানে তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হয় আবার। শোকার্ত মানুষের ঢল পেছনে ফেলে লাশ যখন ফটিকছড়িতে পৌঁছে সেখানে অবতারণা হয় আরেক

www.pathagar.com

হৃদয়বিদারক দৃশ্যের। এখানে অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ, সহপাঠীবৃন্দ, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষ। প্রিয় ছাত্রের স্মরণে বক্তব্য দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অধ্যক্ষ। কলেজ মাঠে আরেকবার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে গ্রামের বাড়িতে অপেক্ষমাণ শোকে বিহ্বল আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহীরা শেষবারের মত জানাজায় মিলিত হন সেখানে। তাঁর কফিন যখন গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন কফিনের পেছনে ছুটছিল স্বতঃস্ফূর্ত শোকার্ত জনতার ঢল। তাঁকে ফটিকছড়ির পূর্ব ভূজপুর গ্রামের চৌধুরী বাড়ির মসজিদস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

মায়ের প্রত্যাশা

'নাসিম উদ্দিন সত্যবাদী ছিলেন। সত্য পথে চলার কারণে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা আমার সন্তানকে শহীদ করেছে। হিংসার বশবর্তী হওয়ায় পুত্রকে হত্যা করে শিবিরের পথ চলা এই এলাকায় বন্ধ করতে চেয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, হবেও না। শহীদের মা হিসেবে শিবিরের প্রতি আমার অনুরোধ, অন্যায় শক্তির প্রতি দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমার সন্তান চলে গেছে, এখন সব শিবিরকর্মীই আমার সন্তান।'

শহীদের স্মরণীয় বাণী

"মানুষের সেবা করব এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত লড়ে যাব।"

একনজরে শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরী

নাম : নাসিম উদ্দিন চৌধুরী
মায়ের নাম : দেলোয়ারা বেগম
বাবার নাম : ডাঃ আহমদ হোসেন চৌধুরী
স্থায়ী ঠিকানা : চৌধুরী পাড়া, পোস্ট- কাজিরহাট, পূর্ব ভূজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
পরিবারের মোট সদস্য : ৯ জন
ভাই-বোন : ৫ ভাই, ২ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়
সর্বশেষ পড়াশোনা : অনার্স ভর্তি পরীক্ষার্থী (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
সাংগঠনিক মান : কর্মী
জীবনের লক্ষ্য : শিক্ষকতা
আহত হওয়ার স্থান : কাটিরহাট বাজার
আঘাতের ধরন : রড, ছুরি, কিরিচ, গুলি
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ
শাহাদাতের তারিখ : ৭ এপ্রিল, ১৯৮৮, ৪টা ৪০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

www.pathagar.com

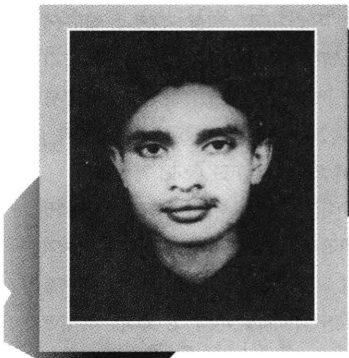

২২

শহীদ আমিনুল ইসলাম

বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে অনিবার্য সংঘাত ঈমানদারদের দেয় আল্লাহর দরবারে মর্যাদার আসন নিশ্চিত করার এক মহা সুযোগ– শাহাদাত। কুফরের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তির নির্মম আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় মজলুম জনতা, শহীদের সারি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। এমনই এক মজলুম শহীদের নাম শহীদ আমিনুল ইসলাম।

শহীদের পরিচয়

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার সুয়াগাজার কমলপুর গ্রামের আব্দুল হামিদের জ্যেষ্ঠ সন্তান আমিনুল ইসলাম এলাকায় আদর্শ ছাত্র হিসেবে খ্যাত ছিলেন। পরিবারে তিন ভাই, তিন বোনের মধ্যে তাঁর অবস্থান ছিল দ্বিতীয়।

শিক্ষাজীবন

ছোটবেলা থেকেই শহীদের জানার আগ্রহ ছিল প্রচুর। তাঁর বাবা বলেন, 'সে অন্য সবার চেয়ে একটু আলাদা ছিল। সে বেশি বেশি প্রশ্ন করত।' প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত তিনি প্রথম স্থান অর্জন করেন। নবম শ্রেণীতে শুভগাজী তোফাজ্জল আহমদ উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং দশম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি বিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিন বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে ভর্তি হন। শহীদ হওয়ার সময় প্রথম বর্ষ পরীক্ষা শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠেন। তাঁর শাহাদাতের কয়েকদিন পর ফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় ডিপার্টমেন্টে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

উগ্র সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগ তার জন্মের পর থেকে রাজনীতির নামে ফ্যাসিবাদ কায়েম করে আসছে। স্বাধীনতার পর তাদের অনুসরণ করতে শুরু করে ছাত্র ইউনিয়ন– এই সংগঠনটি বামপন্থার নামে দেশে ইহজাগতিকতাবাদ (সেক্যুলারিজম) এবং সাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের এক

www.pathagar.com

অদ্ভুত খিচুড়ি নিয়ে রাজনীতিতে অগ্রসর হয় প্রধানত সন্ত্রাসকে পুঁজি করে। আশির দশকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্র ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মজবুত অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছিল সাধারণ শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের অকুণ্ঠ সমর্থনে– মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন স্বভাবতই তা সহ্য করতে পারেনি। বারবার তারা মানুষের মুক্তি আর অধিকারের আন্দোলনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে।

২৮ এপ্রিল ১৯৮৮, বৃহস্পতিবার, সকাল দশটা– শিক্ষার্থীদের ১৩ দফা দাবিতে শিবির ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। মিছিলটি যখন কলাভবন অতিক্রম করছিল তখন ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে কথিত ছাত্রঐক্য নামধারী কিছু বহিরাগত সশস্ত্র সন্ত্রাসী অতর্কিত হামলা চালায়। তাতে বেশ কয়েকজন শিবিরনেতা ও কর্মী আহত হন। সন্ত্রাসীদের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে বিনষ্ট করা এবং হলগুলোকে বন্ধ করে দেয়া। কিন্তু ছাত্রশিবির ও সাধারণ ছাত্রদের সহনশীলতার কারণে তাদের সেই হীন পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়। পরবর্তীতে দুর্বৃত্তরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী মদনহাট ও চৌধুরীহাটে সংগঠিত হতে থাকে এবং শহরগামী বিভিন্ন বাস ও ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে শিবিরকর্মীদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালাতে থাকে। একই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনে সশস্ত্র হামলা চালানোর অভিযোগে বিভিন্ন সংগঠনের ১৬ জন দুষ্কৃতিকারী ছাত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারাদেশের সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিল। সেই সিদ্ধান্তকে ঠেকানোর জন্য শিবিরের সাথে পরিকল্পিতভাবে সংঘর্ষ বাধানো হয়।

শাহাদাত

আমিনুল ইসলাম ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমানত হল শাখার একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ঘটনার দিন বাড়ি যাবার উদ্দেশে আমিনুল ইসলাম বিকেল ৫:২০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনে শহরে রওয়ানা করেন। তাঁর সাথে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য দু'জন ছাত্র আলী রেজা ও ওয়াহিদুর রহমান চৌধুরী। ট্রেন ৫:৩৫ মিনিটে চৌধুরীহাট স্টেশনে পৌঁছলে কথিত সংগ্রামী ছাত্রঐক্য নামধারী ১০/১২ জন সন্ত্রাসীরা টুপি-দাড়িওয়ালা সব সাধারণ যাত্রীর ওপর চড়াও হয়। মারধর ও অমর্যাদাকর আচরণ করতে থাকে। ট্রেন পলিটেকনিক এলাকা অতিক্রম করার পর দুর্বৃত্তদের চোখে পড়ে যান আমিনুল। ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমিনুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ইহজাগতিকতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী দুবৃর্ত্তরা। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম করে তাঁকে। আমিনুল সংজ্ঞাহীন হয়ে ট্রেনের মেঝেতে পড়ে যান। চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা সংজ্ঞাহীন আমিনুলকে ট্রেন থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে ১ম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে নিয়ে যায় এবং ধারালো ছোরার আঘাতে সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে। আমিনুলের দুই সঙ্গী সহপাঠীকে মারধর করে বেঁধে রাখে সন্ত্রাসীরা। অল্পক্ষণ পরেই নরপিশাচরা রক্তমাখা ছোরা হাতে বিশ্রামাগারের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের পুরো শরীর আমিনুলের রক্তে মাখা। দুর্বৃত্তরা নিচে নেমেই আগে থেকে প্রস্তুত একটি মাইক্রোবাসে করে আমিনুলের সঙ্গী দু'জন ছাত্রসহ দারুল ফজল মার্কেটিস্থ ছাত্র ইউনিয়ন কার্যালয়ে চলে যায় এবং তাদের রাত ১টা পর্যন্ত আটকে রাখে। ঘটনা ফাঁস করলে খুন করা হবে বলে হুমকি দিয়ে তারপর তাদের ছেড়ে দেয়। ওদিকে

www.pathagar.com

রেলওয়ে পুলিশ রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত আমিনুলকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই ক্রমাগত রক্তক্ষণের ফলে আমিনুল ইসলামের দেহ নিস্তেজ হয়ে আসে। হাসপাতালে পৌঁছলে কর্তব্যরত ডাক্তার জানান– আমিনুল আর নেই। আমিনুল ইসলাম শাহাদাতবরণ করেছেন।

খোদাদ্রোহী শক্তির নৃশংস আঘাতে আঘাতে এমনিভাবে মৃত্যুহীন জীবন লাভ করলেন আমিনুল ইসলাম। খালি হয়ে গেল মায়ের বুক, হারিয়ে গেল বাবার আশা, স্নেহবঞ্চিত হলো ছোট ভাই-বোনেরা। সেই সাথে গভীর শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন শহীদের জানা-অজানা অনেক সাথী, যাদের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবাসার কারণে ছিল শহীদের হৃদয়ের সম্পর্ক।

বাবার প্রতিক্রিয়া

শহীদের পিতা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন, 'আমি বড় আশা করে মানুষের মত মানুষ করতে বড় ছেলেকে পড়াশোনা করাচ্ছিলাম, কিন্তু আমার সেই আশা সন্ত্রাসীরা পূরণ করতে দিল না। সে ছোটবেলা থেকে খুবই মেধাবী ছিল। যারা আমার ছেলেকে হত্যা করেছে তাদের বিচার এই দুনিয়ার কাঠগড়ায় হয়নি কিন্তু আল্লাহ যেন তাঁর কাঠগড়ায় তাদের উপযুক্ত বিচার করেন। যে পথে আমার ছেলে শহীদ হয়েছে সে পথে যেন সবাই এগিয়ে আসে।'

প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া

শহীদ আমিনুল ইসলাম সম্পর্কে প্রতিবেশী সরাফত আলী বলেন, 'সে তো ছিল খুব অমায়িক। শিক্ষা-দিক্ষা, চাল-চলনে তাঁর কোনো তুলনা ছিল না। কুমিল্লাতে আমার দেখা অমন ছেলে আর নেই। আর শুধু তাঁর স্বভাব-চরিত্র নয় তাঁর চেহারাও ছিল খুব সুন্দর। শুরু থেকেই আমরা তাঁকে পড়াশোনায় প্রথম হতে দেখেছি।'

একনজরে শহীদ আমিনুল ইসলাম

নাম : মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
বাবার নাম : মোহাম্মদ আবদুল হামিদ
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- কমলপুর, পোস্ট- কমলপুর, থানা- সদর দক্ষিণ, জেলা- কুমিল্লা
ভাই-বোন : ৩ ভাই, ৩ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : পরিসংখ্যান দ্বিতীয় বর্ষ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
জীবনের লক্ষ্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া
আহত হওয়ার স্থান : বটতলী রেলস্টেশন, চট্টগ্রাম
আঘাতের ধরন : ধারালো অস্ত্রের আঘাত
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সন্ত্রাসী
শাহাদাতের তারিখ : ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৮
শাহাদাতের স্থান : ঘটনাস্থল

www.pathagar.com

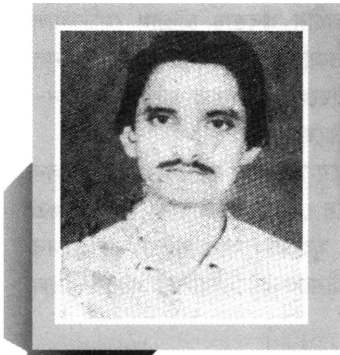

২৩

শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ

মানুষের ইতিহাস– সত্য আর মিথ্যার লড়াইয়ের ইতিহাস। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই লড়াই অনিবার্য। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সত্য আর মিথ্যার ফারাক হয়ে থাকে। মিথ্যার ধারক-বাহকরা এর মধ্য দিয়েই পরাজয় বরণ করে। আর ঈমানদার মানুষ এর মধ্যে হয় বিজয়ের নাগাল পায় নয় নিজেদের দুনিয়াবী জীবন বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন, মহান প্রভুর দরবারে হাজির হন। সেই লড়াইয়ে বাংলাদেশের ময়দানের এক সাহসী মুজাহিদ– শাহাদাতের মর্যাদা প্রাপ্তদের একজন– শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ।

জন্ম পরিচয়

১৯৭০ সালের ১ আগস্ট। সুবহে সাদিকের মধ্য দিয়ে দিগদিগন্তে আজানের সুমধুর ধ্বনি ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঠিক সেই সময়ে জগৎকে আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ। সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার সড়কের পাড় গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মায়ের নাম আমেনা খাতুন, বাবা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান। পাঁচ ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম।

শিক্ষাজীবন

পলাশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন শহীদ। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে পলাশ উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকে ১৯৮৬ সালে কৃতিত্বের সাথে এসএসসি পাস করে গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৮৮ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন । শাহাদাতকালে তিনি এইচএসসি ফলপ্রার্থী ছিলেন।

সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন

স্কুলজীবনেই সংগঠনে যোগ দেন শহীদ। সংগঠনে যোগদানের পর থেকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তাঁর মাঝে নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হতে থাকে। ১৯৮৭ সালে কলেজ ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে শিবিরের

www.pathagar.com

প্যানেলে সমাজসেবা সম্পাদক পদে নির্বাচন করেন। শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সংগঠনের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন।

শাহাদাত

উদীয়মান নেতা আব্দুস সালাম আজাদের উত্থানকে ভিন্ন মতাদর্শের সন্ত্রাসী ছাত্রসংগঠনগুলো মেনে নিতে পারেনি। তাঁকে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে তারা। দিনটি ছিল ১৯৮৮ সালের ৭ নভেম্বর। গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি কলেজের পাশে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতৃত্বে গঠিত 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' নামধারী সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে গুরুতর আহত করে তাঁকে। মৃত ভেবে তারা তাঁকে একটি খাদে ফেলে চলে যায়। এক ট্রাক চালক আজাদকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেন সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। হায়েনাদের আঘাতে নির্মমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত আজাদকে বেশিক্ষণ হাসপাতালে থাকতে হয়নি। সেখানে বিকেল সাড়ে তিনটায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

শহীদের ব্যক্তিজীবন

ব্যক্তিজীবনে তিনি অত্যন্ত সৎ, সাহসী, মজবুত ঈমানের অধিকারী, ব্যবহারে অমায়িক, ধৈর্যশীল, মেধাবী ও সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং একজন সম্ভাবনাময় তরুণ ছিলেন। তিনি শহীদ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন, চলে গেছেন চির সুখের ঠিকানা জান্নাতে। আব্দুস সালাম আজাদকে হারিয়ে আমরা হারালাম এক সম্ভাবনাময় নেতৃত্বকে। হারালাম একজন দায়ীকে, যিনি মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে চলার জন্য সর্বদা আহ্বান জানাতেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তরুণ সমাজ এগিয়ে এলেই তাঁর জীবনদান সার্থক হবে।

একনজরে শহীদ আব্দুস সালাম আজাদ

নাম : মুহাম্মদ আব্দুস সালাম আজাদ
মায়ের নাম : মোসাম্মৎ আমেনা খাতুন
বাবার নাম : মুহাম্মদ আব্দুর রহমান
সাংগঠনিক মান : কর্মী
পড়াশোনা : এইচএসসি
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : গোবিন্দগঞ্জ আব্দুল হক স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
আহত হওয়ার স্থান : মহাবিদ্যালয়ের পাশে
শহীদ হওয়ার স্থান : সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল
আঘাতের ধরন : পুরো শরীরে জখম
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল
শাহাদাতের তারিখ : ৭ নভেম্বর, ১৯৮৮
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- সড়কের পাড়, ডাক- মেরুয়াখলা, থানা- বিশ্বম্ভরপুর
জেলা- সুনামগঞ্জ

www.pathagar.com

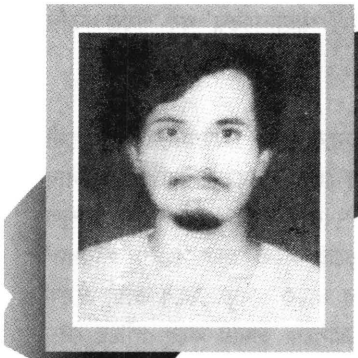

২৪

শহীদ আসলাম হোসাইন

আশির দশকের শুরু থেকেই ছাত্রশিবিরের ওপর মারাত্মক সব আঘাত হানতে শুরু করে ইহজাগতিকতা (সেক্যুলারিজম) আর সমাজতন্ত্রের নামে সন্ত্রাসের রাজনীতি করনেওয়ালা শক্তিগুলো। বিশেষ করে ১৯৮২ সালের পর থেকে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর উদ্যোগে-পৃষ্ঠপোষকতায়-সমর্থনে শিবিরের ওপর সারা দেশে সন্ত্রাসী হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮; ছয় বছরের ইতিহাস– শিবিরের নেতা-কর্মীদের ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্য আর শাহাদাতবরণের ইতিহাস। সামান্য সব ঘটনার সূত্র ধরে সন্ত্রাসীরা শিবিরকে বাংলার জমিন থেকে উৎখাতের হুমকি দিত, কিন্তু একদিকে মানুষের মুক্তি আর কল্যাণ অন্যদিকে আল্লাহর সাথে সুসম্পর্কের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা সবসময়ই শিবিরকর্মীদের রেখেছে অকুতোভয় করে। এই বাংলার জমিন ধীরে ধীরে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের শিকড়কে টেনে নিয়েছে বুকের গভীরে।

ব্যক্তিগত পরিচয়

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ থানার বুজিডাঙ্গা গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে শহীদ আসলাম হোসাইন জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের যে কয়জন ভাই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শহীদ আসলাম হোসাইন হলেন ২৪তম শহীদ।

শিক্ষাজীবন

শহীদ আসলাম হোসাইন শাহাদাতকালীন সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক জীবন

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য শহীদ আসলাম হোসাইন শিবিরের চূড়ান্ত শপথ– সদস্য শপথ নিয়েছিলেন এবং তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল লতিফ হল শাখা শিবিরের সভাপতি ছিলেন। তাঁর প্রখর মেধা ও সাংগঠনিক প্রজ্ঞা

www.pathagar.com

দেখে প্রতিপক্ষের শত্রুরা হিংসার আগুনে পুড়ে মরছিল। তারই প্রতিশোধ নিতে তাঁকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হলো।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বরের রাত; রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিরের জন্য সেটি ছিল একটি কালো রাত্রি। ওইদিন শামসুজ্জোহা হলের শিবিরের পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে শিবির ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দু'জন কর্মীর মধ্যে কিছুটা কথা কাটাকাটি হয়। এই ঘটনা তখনই শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তুচ্ছ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ওইদিন গভীর রাতে হত্যা ও ধ্বংসের উন্মাদনা ছড়িয়ে দেয় সারা হলে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় তারা হত্যা করে দু'জন শিবিরকর্মীকে।

১৭ নভেম্বর রাতে যখন শিবিরকর্মীরা পড়ালেখা শেষ করে নিত্যদিনের মত ঘুমিয়েছিলেন, তখন রাত সাড়ে বারোটার সময় কথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সন্ত্রাসী বাহিনী দা, ছুরি, কিরিচ, রড, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হলের কক্ষে কক্ষে শিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর নৃশংস হামলা চালায়। তারা হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত শিবিরকর্মীদের ওপর। খুনি চক্র একযোগে হামলা চালালো শহীদ আসলাম হোসাইনের কক্ষে– ৩২৯ নম্বর কক্ষের দরজা ভেঙে। আক্রমণে সংজ্ঞা হারান আকতার, শফিক, মুকুল ও আসলাম হোসাইন। বাইরে পুলিশ নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করছিল। খুনিরা আসলাম হোসাইনকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর লাশ চিরতরে গুম করার জন্য কক্ষ থেকে টেনে হেঁচড়ে হল ডাইনিং কক্ষে টেবিলের ওপর রাখল। কিন্তু পরে নিজেরাই লাশ নিয়ে ভয়ার্ত হয়ে পড়ে। খুনিরা সবাই মিলে চেষ্টা করেও ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে লাশ সরাতে পারেনি। পরে হাল ছেড়ে দিয়ে তারা পুলিশের সামনে দিয়েই হল থেকে সদলবলে বেরিয়ে যায়। অন্যান্য হলের নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় পরে আহত সবাইকে মেডিকেল ভর্তি করা হল। ডাক্তার আসলাম হোসাইনকে দেখে মৃত ঘোষণা করলেন। সকাল হতেই আসলাম হোসাইনের শাহাদাতের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শোকের ছায়া নেমে এলো গোটা ক্যাম্পাস ও মহানগরীতে।

শহীদের পিতার প্রতিক্রিয়া

'আসলাম ইসলামের পথে শহীদ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমি এক আসলামকে হারিয়ে হাজারো আসলামকে পেয়েছি। আমার দুঃখ নেই, আমি শহীদের পিতা হিসেবে গর্ববোধ করি।'

মায়ের প্রত্যাশা

'আমার আসলাম যে দ্বীনি কাজের জন্য শাহাদাতবরণ করেছে বর্তমানে আসলামের উত্তরসূরিরা আসলামের বাকি কাজের আঞ্জাম দেবে, তবেই আমি খুশি হব।'

শহীদের বিশেষ উদ্যোগ

যুবকদের সুন্দর চরিত্র গঠন এবং গরিব ও অসহায়দের সহযোগিতা করার জন্য 'আল আমীন' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছিলেন

www.pathagar.com

স্মরণীয় ঘটনা

শহীদ আসলাম হোসাইন নামাজের পর হাত তুলে দোয়া করতেন, যা দেখে আসলামের পিতা তাঁর মাকে বলেছিলেন, আসলাম কিন্তু আর ফিরবে না (অর্থাৎ শহীদ হয়ে যাবে)। তাই তাঁর পিতা তাঁর শাহাদাতের পূর্বে কবর দেয়ার স্থান ঠিক করে রেখেছিলেন।

একনজরে শহীদ আসলাম হোসাইন

নাম : আসলাম হোসাইন
মায়ের নাম : আনজুমান আরা বেগম
বাবার নাম : ডা. মো: জিন্নাত আলী
ভাই-বোন : ৪ ভাই, ৬ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : ভাইদের মধ্যে প্রথম, ভাই-বোনের মধ্যে পঞ্চম
জন্মতারিখ : ৪ ফাল্গুন, ১৩৬৭
সাংগঠনিক মান : সদস্য
সর্বশেষ পড়াশোনা : এমএসসি (ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্য) পরীক্ষার্থী
সর্বশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
জীবনের লক্ষ্য : বাংলার জমিনে কুরআনের রাজ প্রতিষ্ঠা করা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম+ডাক- বুজিডাঙ্গা মুন্দিয়া, উপজেলা- কালিগঞ্জ, জেলা- ঝিনাইদহ
আহত হওয়ার স্থান : ৩২৯ নং কক্ষ, নবাব আব্দুল লতিফ হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
আঘাতের ধরন : রড, হকিস্টিক, ছোরা, কুড়াল, রামদা
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রমৈত্রী, জাসদ ছাত্রইউনিয়ন, ছাত্রলীগ
শহীদ হওয়ার তারিখ : ১৭ নভেম্বর, ১৯৮৮; রাত ১২.৩০ মিনিট

www.pathagar.com

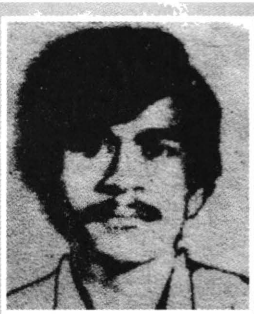

২৫

শহীদ আসগর আলী

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানার শাশারপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ আজগর আলী। ছোটবেলা থেকে অনেক শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছিলেন তিনি। কোনো কারণ ছাড়া এদিক-সেদিক ঘুরতে অপসন্দ করতেন। তাঁর মা আকলিমা খাতুন এবং বাবা রমজান আলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন শহীদ।

শিক্ষাজীবন

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবন শুরু করেন তিনি। দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস্ উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৯ সালে বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৮৪ সালে ভর্তি হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৯৮৮ সালে পদার্থ বিজ্ঞান বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। শাহাদাতের পূর্বে এমএসসি পরীক্ষার মাত্র দু'টি বিষয় বাকি ছিল তাঁর। শহীদ আসগর স্বপ্ন দেখতেন একজন আদর্শ শিক্ষক হওয়ার। গ্রামের বাড়ির কাছে সঙ্গীত কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের একজন অস্থায়ী প্রভাষক হিসাবে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

শহীদের ব্যক্তিজীবন

আশপাশের মানুষ শালীন ও কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেই জানতেন শহীদকে। অসাধারণ এই মানুষটির ব্যবহার ছিল সবার অনুকরণীয়, আর আমলি জিন্দেগি ছিলো নির্মল ও অতুলনীয়। আসগর আলী গ্রামের মানুষের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বাড়িতে গেলে সবার সাথে দেখা করতেন। খোঁজ খবর নিতেন, সালাম বিনিময় করতেন। তাদের পরিবারের সমস্যাগুলো জানতেন এবং সমাধানের পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করতেন। পুরুষদেরকে

www.pathagar.com

নামাজের জন্য মসজিদে ডাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয় থাকাকালে এলাকায় ছোট ভাই-বোনদের নানা কাজে সহযোগিতা করতেন। সামর্থ্যে কুলালে আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। আন্দোলনের সহকর্মীদের অভিজ্ঞতা এ রকম- শহীদ কম কথা বলতেন, সবার চেয়ে কম খেতেন। পরিবারের সদস্যরা বলেন, রান্নার সময় তিনি মায়ের চুলার কাছে বসতেন। তার সাথে প্রাণখুলে কথা বলতেন। মাকে শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া এবং বেশি কাজ না করার পরামর্শ দিতেন। মাকে ভালোবাসতেন প্রাণ দিয়ে।

পারিবারিক জীবন

সম্মান শ্রেণীতে পড়ার সময় দিনাজপুর শহরের পুলহাট গ্রামে বিয়ে করেন শহীদ। আফিফা তাজরেমিন– শহীদের একমাত্র সন্তান– শাহাদাতের সময় যার বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। সেই আফিফা এখন পঁচিশ বছর অতিক্রম করতে যাচ্ছেন। তার নিভৃত কান্নায় হয়তোবা প্রকৃতিও কেঁদে ওঠে। তার প্রশ্ন– কারা কলম ফেলে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল? আমার আব্বুকে হত্যা করেছিল? আমার আব্বু তো কোনোদিন কারো ক্ষতি করেননি। মানুষের জন্য, ইসলামের জন্য তাঁর হৃদয় কাঁদতো, আর তাই তিনি ইসলামকে জীবনের মিশন মনে করেছিলেন। সত্য বলতে কী, এটাই ছিল আমার আব্বুর অপরাধ। কিন্তু কেন বড় অসময়ে আমার আব্বুকে প্রাণ দিতে হল? কে দেবে এই প্রশ্নের জবাব?

শাহাদাতবরণ

আমীর আলী হলের ৩০২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র ছিলেন শহীদ। ১৮ নভেম্বর ১৯৮৮, জুমাবার; নামাজ হল মসজিদে পড়া যেত নিশ্চয়ই। কিন্তু বেশি সওয়াবের উদ্দেশ্যে গোসল করে পাক-পবিত্র হয়ে জুমার নামাজ আদায়ের জন্য কেন্দ্রীয় মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন তিনি। তবে জুমার নামাজ আর আদায় করা হলো না মসজিদে। খুনিরা রামদা, হকিস্টিক, ছোরা, কুড়াল দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করলো তাঁকে। ঘটনাস্থলেই শহীদ হলেন আলী আসগর ভাই। ঘড়ির কাঁটা তখন ১২টা ৪৫ মিনিটের ঘরে।

জানাজা ও দাফন

বাড়িতে খবর পৌঁছায় রাতেই। পরের দিন সকাল দশটায় লাশ বাড়ি পৌঁছায়। পাড়া প্রতিবেশীরা সেদিন শাশালপুরের আকাশ-বাতাসের সাথে কেঁদেছে, চোখের পানিতে বুক ভিজিয়েছে। তাদের প্রিয় মানুষটিকে শুধু একনজর দেখার জন্য আকুতি করেছে। ভিড় ভেঙেছে হাজারো মানুষের, মিছিল নিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁর প্রিয় সাথীরা শহীদকে সম্মানের সাথে দাফন করার জন্য। শাশালপুর এর আগে একসাথে এত বড় জানাজার নামাজ দেখেনি।

স্মরণীয় বাণী

"সুন্দর এ মতিহার সবুজ চত্বরকে ভালোবেসেছি, জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ইসলামের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভালোবেসে যাব।"

www.pathagar.com

মা-বাবার প্রতিক্রিয়া

শহীদ আসগর আলীর শাহাদাতের খবর যখন তাঁর পিতা-মাতার নিকট পৌঁছে তখন তারা উভয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পরে শহীদের মা বলেন, 'আল্লাহতায়ালা তাঁকে নিয়ে গেছেন, ভালোভাবে রাখুন, এই প্রার্থনা করি। আর আমি আশা করি কিয়ামতের দিন কঠিন মুছিবতের সময় সে যেন আমাদের জান্নাতে যাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে, তাঁর উছিলায় আমরা যেন জান্নাতে যেতে পারি। আসগরের উত্তরসূরিদের নিকট প্রত্যাশা করি এই আন্দোলনের জনশক্তিরা আসগরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেন কাজ করে যায়।'

শহীদের স্ত্রীর কথা

শহীদের স্ত্রী দিলরুবা বেগম বলেন, 'নিজেকে সান্ত্বনা দিই এভাবে যে, আমি একজন শহীদের স্ত্রী।' তিনি শহীদ আসগরের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দাওয়াতী কাজে আরো বেশি মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান যাতে করে শহীদ আসগরের রক্তঝরা জমিনে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করা যায়।

শহীদের কন্যার কথা

শহীদের কন্যা আফিফা তাজরিমিন (পপি) বলেন, 'বাবাকে খুব মনে পড়ে। বাবা থাকলে শ্বশুর বাড়ি আসতেন, আমার খোঁজ-খবর নিতে পারতেন। আজ বাবা না থাকায় এই বেদনা সয়ে যাচ্ছি। তবুও একজন শহীদের সন্তান হতে পেরে আমি খুব গর্বিত।

একনজরে শহীদ আসগর আলী

নাম : আসগর আলী
মায়ের নাম : আকলিমা খাতুন
বাবার নাম : মোঃ রমজান আলী (সাবেক ইউপি মেম্বার)
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- শাশালপুর, ডাক- ভিয়াইল, থানা- চিরিরবন্দর, জেলা- দিনাজপুর
জন্মতারিখ : ১৯৬৩ সাল
ভাই-বোন : ৩ ভাই, ১ বোন
ভাই-বোনদের মধ্যে অবস্থান : সবার বড়
সাংগঠনিক মান : কর্মী
জীবনের লক্ষ্য : শিক্ষক হওয়া
কৃতিত্ব : এসএসসি প্রথম বিভাগ (বিজ্ঞান), ১৯৭৯; এইচএসসি দ্বিতীয় বিভাগ (বিজ্ঞান), ১৯৮১; বিএসসি (সম্মান) পদার্থ, ১৯৮৮; শাহাদাতবরণকালে এমএসসি (রা.বি) অধ্যয়নরত ছিলেন
শহীদ হওয়ার স্থান : শাহ মাখদুম হলের সামনে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
আঘাতের ধরনঃ হকিস্টিক, কিরিচ, ছোরা, কুড়াল দিয়ে সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রমৈত্রী
শাহাদাতের তারিখ : ১৮ নভেম্বর, ১৯৮৮; দুপুর ১২:৪৫ মিনিট

www.pathagar.com

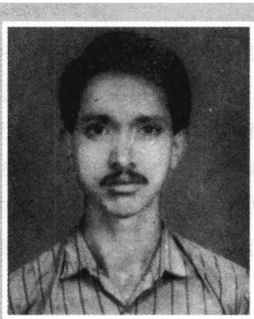

২৬

শহীদ আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম

লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী থানার দেওডোমা গ্রামে এক নিঃস্ব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ। তাঁর বাবার নাম আবদুস সামাদ। পরিবারে দুই ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়।

শিক্ষাজীবন

দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর রংপুর কারমাইকেল কলেজে বিএ ভর্তি হন তিনি। শাহাদাতকালে তিনি এই কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক পরিচয়

আবু সাঈদ মোহাম্মদ সায়েম ছিলেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। ইসলামী ছাত্রশিবিরের এই নিষ্ঠাবান কর্মী সংগঠনের জন্য সব সময় পেরেশান থাকতেন কিভাবে সংগঠনকে এগিয়ে নেয়া যায়।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

রংপুর শহর শাখার উদ্যোগে তখন লাইব্রেরি সপ্তাহ চলছিল। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে শিবিরকর্মীরা কুরআন, হাদিস ও ইসলামী সাহিত্যের বই লাইব্রেরিতে দেয়ার জন্য মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছিলেন। শহীদ সায়েমও লাইব্রেরি সপ্তাহের কাজ করছিলেন। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের জন্য একটি পাঠাগার গড়তে হবে- এই পেরেশানি নিয়ে কাজ করছিলেন শহীদ। ১৯৮৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর সকালে সামান্য খাওয়া-দাওয়া করে বই সংগ্রহে বেরিয়ে পড়লেন সায়েম ভাই। সারাদিন কাজ করে বিকেলে স্থানীয় জাহাজ কোম্পানির মোড় হতে কয়েকজন সঙ্গীসহ বাসায় ফিরছিলেন। সারাদিন ময়দানে কাজ করে ক্লান্ত। বলাকা সাইকেল স্টোরের সামনে পৌঁছামাত্রই পার্শ্ববর্তী আওয়ামী লীগ অফিস থেকে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাইদের ওপর। সন্ত্রাসীরা দা, ছুরি, কুড়াল,

www.pathagar.com

রড, হকিস্টিক, কিরিচ ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে শিবিরকর্মীদের। তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল কারমাইকেল কলেজের কৃতী ছাত্র, উদীয়মান ছাত্রনেতা মোহাম্মদ সায়েম। রক্তলোলুপ ছাত্রলীগের হায়েনারা শহীদের দুটি হাতই ভেঙে দেয়। উপর্যুপরি আঘাতে মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। রক্তে লাল হয়ে যায় রাস্তার কালো পিচ, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি রাস্তার পাশেই। পরে স্থানীয় ছাত্র-জনতা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের শয্যায় মরণাপন্ন অবস্থায় কাটে সারারাত। কিন্তু আর সংজ্ঞা ফেরেনি তাঁর। পরদিন ১৫ ডিসেম্বর ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন তিনি, চলে গেলেন নিজের পরম প্রভুর সান্নিধ্যে।

মায়ের প্রতিক্রিয়া

'সায়েম ছোটবেলা থেকে আর্থিক কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছে, ও নিজের খরচ নিজে বহন করার চেষ্টা করত। আর আমাকে বলত, 'মা তুমি নানার বাড়ি থেকে কিছু টাকা এনে একটু কষ্ট করে চল, কিছু দিনের মধ্যে ঢাকা থেকে আমার চাকরির চিঠি আসবে, তারপর আমি সকলের কষ্ট দূর করবো।' চিঠি এলো ঠিকই কিন্তু ততদিনে আমার সায়েম আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে।'

একনজরে শহীদ আবু সাঈদ মোহাম্মদ সায়েম

নাম : আবু সাঈদ মোহাম্মদ সায়েম
পিতার নাম : আবদুস সামাদ
স্থায়ী ঠিকানা : দেওডোমা, আদিতমারী, লালমনিরহাট
ভাই-বোন : দুই ভাই, এক বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার বড়
পরিবারের মোট সদস্য : ৪ জন
সাংগঠনিক মান : কর্মী
জীবনের লক্ষ্য : পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে ইসলামের আদর্শ পৌঁছানো
আহত হওয়ার স্থান : রংপুর শহর, বলাকা সাইকেল স্টোরের সামনে (স্থানীয় জাহাজ কোম্পানি মোড় হতে একটু দক্ষিণে)
আঘাতের ধরন : রড, হকিস্টিক, ছোরা, কুড়াল, কিরিচ
যাদের আঘাতে শহীদ : আওয়ামী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
শাহাদাতের তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৮; ভোর ৫.৩০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান : রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

www.pathagar.com

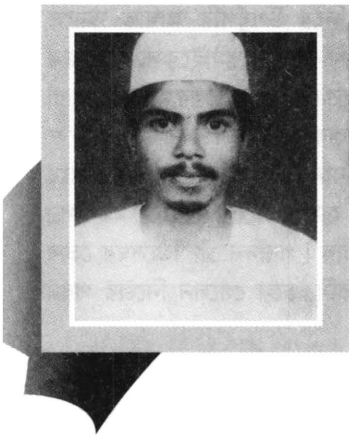

২৭

শহীদ তরিকুল ইসলাম

শহীদ তরিকুল আলম ছিলেন জনাব আলী হোসেনের সুযোগ্য পুত্র। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ির নানুপুর গ্রামে। ৩ ভাই ও ১ বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন শহীদ। বৃদ্ধ পিতা আলী হোসেন মংলা পোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। শাহাদাতকালে তরিকুল ছিলেন ফাজিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র।

শিক্ষাজীবন

অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র ছিলেন শহীদ। তিনি নানুপুর গাউছিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে দাখিল ও আলিম পাস করেন। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হন নাজিরহাট জামেয়া আহমদিয়া সিনিয়র আলিয়া মাদ্রাসায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল একজন বড় আলেমে দ্বীন হওয়া। কিন্তু ফ্যাসিস্টচক্র তাঁর সেই স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেয়।

শাহাদাতের ঘটনা

১৯৮৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, বিকাল ৩টা; শিবিরকর্মী মেধাবী ছাত্র শহীদ তরিকুল আলম জরুরি কেনাকাটার জন্য ফটিকছড়ির নানুপুর বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি দাড়ি রাখতেন। ইসলামের দুশমন ছাত্রলীগের ফ্যাসিস্টচক্র তাঁকে দেখা মাত্র খুনের উন্মাদনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। এরপর উপর্যুপরি আঘাতের পর আঘাতে তাঁর হাত-পাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষত-বিক্ষত করে সন্ত্রাসীরা। তবুও ক্ষান্ত হয়নি নরপিচাশরা– হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁকে নিয়ে যায় পাশের নির্জন ঝোপের আড়ালে। সেখানে তাঁকে দা, কিরিচ ও রড দিয়ে আঘাত হানে ইচ্ছামতো। এরপর দুর্বৃত্তচক্র তারিককে মৃত মনে করে ফেলে চলে যায়। বর্বরতার প্রত্যক্ষদর্শী কতিপয় স্থানীয় লোক সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ক্ষতের যন্ত্রণা ও রক্তক্ষরণে দিন দিন তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে।

www.pathagar.com

২৭ ফেব্রুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হন তরিক। ২৮ ফেব্রুয়ারি অপারেশন করে ডান পা সম্পূর্ণ কেটে ফেলতে হয়। এরপর দুইদিন অজ্ঞান ছিলেন। ডাক্তার তিন এম্পুল দুষ্প্রাপ্য এন্টি গ্যাংগ্রিন সিরাম (এজিএম) প্রয়োজন বলে জানান। পত্রপত্রিকায় খবর ছাপিয়েও সারাদেশের কোথাও ঔষধটি পাওয়া যায়নি। শিবিরের পক্ষ থেকে বিদেশ থেকে ঔষধটি আনানো হয়। কিন্তু ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরও তরিককে বাঁচানো যায়নি। ২ মার্চ ১৯৮৯, সকাল সাড়ে দশটায় পঙ্গু হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ রুমে কালেমায়ে শাহাদাত পড়তে পড়তে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান সকলের প্রিয় শহীদ তরিকুল আলম ভাই। সাতবার জানাজা শেষে তাঁকে দাফন করা হয়।

একনজরে শহীদ তারিকুল আলম

নাম : তরিকুল ইসলাম
মায়ের নাম : আনোয়ারা বেগম
বাবার নাম : আলী হোসেন
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- নানুপুর, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম
ভাই-বোনের সংখ্যা : ৩ ভাই, ১ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : দ্বিতীয়
পরিবারের মোট সদস্য : ৬ জন
সাংগঠনিক মান : সাথী প্রার্থী
সর্বশেষ পড়াশোনা : ফাজিল ১ম বর্ষ, (দাখিল ও আলিম নানপুর মজহারুল উলুম গাউছিয়া ফাজিল মাদ্রাসা থেকে)
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : নাজিরহাট আলিয়া আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা
জীবনের লক্ষ্য : আলেমে দ্বীন হওয়া
আহত হওয়ার স্থান : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নানুপুর বাজারের কাছে (দুপুর সাড়ে ১২টায় ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আঘাত করে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯)
আঘাতের ধরন : ডান পায়ে বিষাক্ত বেয়োনেটের প্রয়োগ, মাথা ও বাম হাতে দা, কিরিচ, ছুরি ও রড দিয়ে আঘাত
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ
শাহাদাতের তারিখ : ২ মার্চ, ১৯৮৯; সকাল ১০.৩০ মিনিট
শাহাদাতের স্থান : ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের পোস্ট অপারেটিভ রুম
স্মরণীয় বাণী : "দুনিয়া কিছুই না, আমি শহীদ হব।"

www.pathagar.com

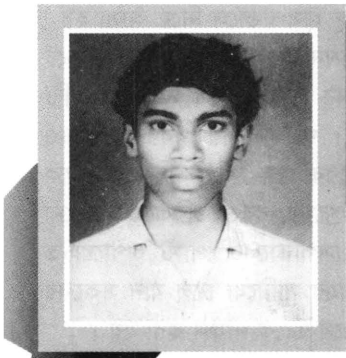

২৮

শহীদ জসিম উদ্দিন মাহমুদ

আল্লাহর সৃষ্টি সুন্দর এই পৃথিবীতে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। আল্লাহর অনুগত বান্দারা সব সময় চেষ্টা করেছেন সত্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে। অন্যদিকে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা সত্যের সমুজ্জ্বল শিখাকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী তাদের সেই কু-চেষ্টা সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে। সত্যকে তারা নেভাতে পারেনি বরং তারা নিজেরাই ইতিহাসের আঁস্তকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সত্যের আলো এখন দূর হতে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। সে সত্য-মিথ্যার লড়াইয়ের এক বিজয়ী সৈনিক শহীদ জসিম উদ্দীন মাহমুদ।

জন্ম-পরিচয়

শহীদের পুরো নাম এ কে এম জসিম উদ্দীন। ১৯৭৩ সালের জুন মাসের প্রথম দিকের কোনো এক শুভক্ষণে পৃথিবীতে আলো ছড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। চট্টগ্রাম জেলার কোতয়ালী থানার মিয়াখান নগর তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। পিতা ডা. এম এ খালেক একজন বিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। মাতা নুরজাহান বেগম একজন আদর্শ মাতা। পিতা-মাতার সান্নিধ্যে ৪ ভাই আর এক বোনের সবার বড় জসিম উদ্দীন ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন। দুরন্ত চঞ্চলতায় বাল্যকাল অতিবাহিত হলেও দায়িত্ববোধসম্পন্ন হয়ে ওঠেন পরবর্তীতে।

শিক্ষাজীবন

শিক্ষার হাতে খড়ি হয় নিজ গ্রামে। এরপর এএএস সিটি করপোরেশন উচ্চবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৮ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাস করেন। তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী জসিম উদ্দিন ছোটবেলা থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপের বাইরেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জসিম ষষ্ঠ শ্রেণীতে থাকতেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় জেলা পর্যায়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এসএসসি পাস করার পর বাণিজ্য বিভাগে পড়ার মানসিকতা নিয়ে

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজে ভর্তি হন। অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছাত্র হিসেবে তিনি অল্প সময়েই জয় করে নেন ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকদের মন। শাহাদাতের পূর্বে তিনি সাময়িক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। শাহাদাতের পর ফলাফল প্রকাশ হলে দেখা যায় তিনি মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। শাহাদাতকালে জসিম উদ্দীন মাহমুদ প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাত

ইসলামী ছাত্রশিবিরের নিরলস কর্মী হিসেবে ধীরে ধীরে কলেজ প্রাঙ্গণে পরিচিতি লাভ করেন শহীদ। কিন্তু মানুষের শত্রু– ইসলামে শত্রুরা শহীদের এই জনপ্রিয়তা মেনে নিতে পারেনি। ১৯৮৯ সালের ২৭ মার্চ আসে সেই ভয়াল দিনটি। সরকারি কমার্স কলেজ শুধু বাংলাদেশ নয় উপমহাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গন। সুতরাং এ শিক্ষাঙ্গনে যারা পড়তে আসে তারাও মেধায় উত্তীর্ণ, তারা নিজেদের বিবেকের রায়ে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকেই তাদের নিজেদের সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু সত্যের দুশমন সেক্যুলার ছাত্রলীগের কাছে তা অসহনীয় ঠেকে। ফলে তারা নিরীহ ছাত্রদের ওপর বার বার আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু ছাত্রসমাজের প্রতিরোধের মুখে পিছু হটে যায়। তবে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ নস্যাতের জন্য তারা আরো প্রস্তুতি নিতে থাকে। এমনই এক পরিস্থিতিতে কলেজ প্রশাসন ছাত্র-সংসদ নির্বাচন ঘোষণা করেন। ৩ এপ্রিল ১৯৮৯-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের নিজ নিজ প্রচারণায় কলেজ ক্যাম্পাস মুখরিত করে তুলেছিল। কিন্তু সত্যের বিরোধী এই সংগঠনটি তখনও নিজেদের প্যানেল ঠিক করতে পারেনি। ২৭ মার্চ ছিল প্যানেল জমা দেয়ার শেষ সময়। তাই তারা মরিয়া হয়ে ওঠে নির্বাচন বানচালের জন্য। কিন্তু ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্রদের পক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসনকে চাপ দিতে থাকে। অবশেষে এল ২৭ মার্চ। সকাল থেকেই সাধারণ ছাত্রসহ ছাত্রশিবিরের কর্মীরা কলেজ ক্যাম্পাসে ভিড় জমাতে থাকে। সকাল ১০:৩০ মিনিটে ছাত্রশিবিরকে টার্গেট করে ছাত্রলীগ নামধারী কিছু সন্ত্রাসী উস্কানিমূলক শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা শিবিরকর্মীদের ওপর হামলার জন্য উদ্যত হলে সম্মানিত শিক্ষকদের হস্তক্ষেপে তা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অসংখ্য বহিরাগতসহ এসএমজি, কাটারাইফেল, বন্দুক, রিভলবারের মতো মারাত্মক সব আগ্নেয়াস্ত্রসহ বোমাবাজি করতে করতে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। শিবিরকর্মীদের ওপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে তারা। তাদের আকস্মিক হামলায় শিবিরকর্মী ও সাধারণ ছাত্ররা হতচকিত হয়ে দিগ্বিদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলে গুলিবর্ষণের ঘটনা। শিবিরের ভিপি প্রার্থীসহ ৩০ জন গুলিবিদ্ধ হন। ঘাতকের একটি বুলেট এসে শিবিরকর্মী জসিম উদ্দীন মাহমুদের বুক ভেদ করে যায়। বুলেটের আঘাত লাগে মাথায়ও। কালেমায়ে শাহাদাত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়তে পড়তে দ্বীনের এই মুজাহিদ মাটিতে পড়ে যান।

www.pathagar.com

তাঁর ভেজা রক্তে রক্তিম হয়ে যায় ক্যাম্পাসের সবুজ মাঠ। হাসপাতালে নেয়ার পথে জসিম উদ্দীন মাহমুদ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেন।

দেড় ঘণ্টাব্যাপী এই বর্বরোচিত হামলা চললেও পুলিশ ছিল সম্পূর্ণ নির্বিকার। পুলিশের সামনেই অস্ত্র উঁচিয়ে দুষ্কৃতিকারীরা কলেজ আঙিনায় প্রবেশ করে। হত্যার পর পুলিশের সামনেই গাড়ি হাঁকিয়ে দুর্বৃত্তরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। ২৮ মার্চ শহীদ জসিম উদ্দীন মাহমুদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় লালদিঘী ময়দানে। এরপর চাকতাই তাঁদের পারিবারিক গোরস্থানে লাশ দাফন করা হয়।

শহীদ হওয়ার পূর্বের স্মরণীয় বাণী

"ইসলামী জাগরণের জন্য সর্বদা কাজ করে যাব।"

পিতার প্রত্যাশা

'শহীদের অপূর্ণাঙ্গ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করতে সবাইকে আরো বেশি আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কাছে তুলে ধরে শহীদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজকে গতিশীল করতে হবে।'

একনজরে শহীদ জসিম উদ্দীন মাহমুদ

পূর্ণ নাম : এ কে এম জসিম উদ্দীন মাহমুদ
মায়ের নাম : নূরজাহান বেগম
বাবার নাম : ডা. মুহাম্মদ আব্দুল খালেক
জন্মতরিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
পরিবারের মোট সদস্য : ৬ জন, ৩ ভাই এক বোনের মধ্যে সবার বড়
স্থায়ী ঠিকানা : হাফিজিয়া লেন, মিয়াখান নগর, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম
সাংগঠনিক মান : কর্মী
সর্বশেষ পড়াশোনা : এইচএসসি
সর্বশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ
জীবনের লক্ষ্য : সমাজসেবক হওয়া
আহত হওয়ার স্থান : কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম
আঘাতের ধরন : ব্রাশফায়ার
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ
শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রাম সরকারি কমার্স কলেজ
শাহাদাতের তারিখ : ২৭ মার্চ, ১৯৮৯

www.pathagar.com

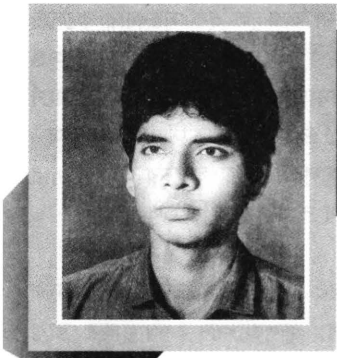

২৯

শহীদ শফিকুল ইসলাম

পদ্মাবিধৌত হযরত শাহ মখদুম (রহ)-এর স্মৃতিবিজড়িত উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের এক অনন্য লীলাভূমি এই পবিত্র জমিন। সবুজ-শ্যামল, ছায়া সুনিবিড় আর সাজানো-গোছানো সুরম্য অট্টালিকায় চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর এই ক্যাম্পাস। শিক্ষার জগতে ভ্রমণ করার, শিক্ষার অতল সমুদ্রে অবগাহন করার এবং জীবনসংগ্রামে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য হৃদয়ে একগুচ্ছ আশা-ভরসা নিয়ে ভর্তি হয় ছাত্র-ছাত্রীরা মতিহারের এই সবুজ চত্বরে গড়ে ওঠা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে। প্রকৃতির সেই বাস্তবতায় জীবনে বড় হওয়ার এক অদম্য স্পৃহা নিয়ে এই ক্যাম্পাসে ভর্তি হন আমাদের প্রিয় ভাই প্রতিভাবান ছাত্র, শহীদি মিছিলের উজ্জ্বল নক্ষত্র শহীদ শফিকুল ইসলাম।

পারিবারিক পরিচয়

নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত শাহবাজপুর গ্রামে ১৯৬৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন শহীদ শফিকুল ইসলাম। তাঁরা তিন ভাই, চার বোন। ভাই-বোনদের মধ্যে পঞ্চম এবং ভাইদের মাঝে সবার ছোট ছিলেন তিনি। বড় ভাই কামাল হাসান বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার। মেজ ভাই জাহাঙ্গীর আলম প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক পিতা কায়েস আহমদ ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। দুখিনী মা ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে জান্নাতের সিঁড়িতে পদার্পণ করেন ৩ অক্টোবর ১৯৯৫ তারিখ মঙ্গলবার ভোর ৪টায়।

শিক্ষাজীবন

শহীদি ঈদগাহের মুজাহিদ, আমাদের প্রিয় ভাই শফিকুল ইসলাম পারদিলালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক পড়াশোনা শেষ করেন। শাহবাজপুর হাইস্কুল থেকে ১৯৮২ সালে গণিতে লেটার মার্কসসহ প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে

www.pathagar.com

এসএসসিতে উত্তীর্ণ হন। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮৪ সালে প্রথম বিভাগে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ হন। এরপর নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার লক্ষ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষে গণিত বিভাগে ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন প্রিয় ভাই শহীদ শফিকুল ইসলাম। তিনি ছিলেন মতিহার হলের আবাসিক ছাত্র এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের হল শাখার সেক্রেটারি। শাহাদাতকালীন সময়ে তিনি গণিত তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক পরিচয়

মানুষের মুক্তি আর কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন কায়েমের বিপ্লবী কাফেলা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের দাওয়াত পান ১৯৮১ সালে, স্কুলজীবনে। আল্লাহর রঙে জীবনকে রঙিন করার চেতনায় ১৯৮৪ সালে সংগঠনের সাথী প্রার্থী হন। অতঃপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে সাথী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। যদিও তিনি ক্যাম্পাসে এসে সাথী শপথ গ্রহণ করেন, তবুও আগে থেকেই তিনি সংগঠনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। দাওয়াতে দ্বীনের মহান চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্কুলজীবন থেকেই ছাত্রদের মাঝে ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছিয়ে দিতে শুরু করেন। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা এবং অনুপম চরিত্র স্কুল ছাত্রদের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঈমানের প্রদীপ্ত চেতনা তাঁকে দাওয়াতের কাজে উদ্বুদ্ধ করত প্রতিনিয়ত। তিনি বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে মির্জাপুর হাইস্কুলে পায়ে হেঁটে গিয়ে প্রোগ্রাম করে আসতেন এবং তরুণ ছাত্রসমাজকে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শের পথে আহবান করতেন। শহীদ শফিকুল ইসলামের জীবনের মহান লক্ষ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া অথবা বিসিএস উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা তাঁর সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। তাদের পাশবিক জিঘাংসার শিকারে পরিণত হন তিনি। তাঁকে যোগ দিতে হয় শহীদ আসলাম ও আসগরের পথ ধরে শহীদি মিছিলে।

অনন্য গুণে ভাস্বর শহীদ

শহীদ শফিকুল ইসলাম শুধুমাত্র একজন ভালো ছাত্রই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন আদর্শ যুবক। সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রতি দায়িত্ববান এক সচেতন নাগরিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ বন্যায় একবার এলাকা প্লাবিত হওয়া শুরু হলে তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার সমস্ত ছাত্রকে একত্রিত করে গ্রামের পার্শ্ববর্তী উমরপুর নালায় বাঁধ দেন। ফলে এলাকার বিপুল পরিমাণ শস্যক্ষেত এবং ঘরবাড়ি বন্যার কবল থেকে রক্ষা পায়।

শহীদি মিছিলের অগ্রসেনা শহীদ শফিকুল ইসলাম আচার-আচরণের দিক থেকে এক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। উত্তম চরিত্র ও আচরণের কারণে তিনি ছিলেন একাধারে পিতা-মাতার আদরের সন্তান, বড় ভাই-বোনদের একান্ত স্নেহভাজন, পাড়ার প্রতিটি মানুষের উত্তম প্রতিবেশী এবং শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে একজন আদর্শবান ছাত্র। রুচিশীল ও মার্জিত পোশাক পরতেন তিনি। প্রিয় শখ ছিল ফুটবল খেলা, তবে সংগঠনে আসার

www.pathagar.com

পর ট্র্যাকস্যুট পরে খেলতেন। তিনি বাসায় পিঠা খেতে ভালোবাসতেন। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ইসলামের ফরজিয়াতসমূহ পালন করতেন। নফল নামাজ ও নফল রোজা ছিল তাঁর জীবনের অবিচ্ছেদ্য আমল।

শাহাদাত

দিনটি ছিল ১৮ এপ্রিল, ১৯৮৯; ক্যাম্পাসে শহীদ আসলাম ও আসগরের রক্ত শুকাতে না শুকাতেই ঘটে গেল আর একটি শাহাদাত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পূর্ববর্তী ছয় শহীদের পথে পাড়ি জমালেন শফিকুল ইসলাম। শহীদ আসলাম ও আসগরের শাহাদাতের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী আন্দোলনের জিন্দাদিল কর্মীরা শহীদের রক্তে ভেজা মতিহারের পবিত্র অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েন আরো বেশি করে– দাওয়াতে দ্বীনের কাজ শুরু করেন জোরালোভাবে। তখন ইসলামবিরোধী শক্তির মধ্যে শুরু হয় মর্মজ্বালা। তারা ইস্যু খুঁজতে থাকে কিভাবে মতিহারের সবুজ চত্বর থেকে মানুষের বিজয়ের কথা– মুক্তির কথা চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা যায়। এমনই একটা সময়ে তৈরি করা হল নতুন আর একটি ইস্যু। ক্লাসে আগের বেঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি শুরু হয়, পরে সেটা রাজনৈতিক ব্যাপারে রূপান্তরিত হয়। তথাকথিত সংগ্রাম পরিষদের সন্ত্রাসীরা প্রথমেই কলা ভবনের সামনে শিবিরনেতা তোতাকে আঘাত করে। বামপন্থার নামে গোড়া সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধ্বজাধারী ছাত্রমৈত্রীর সশস্ত্র গুণ্ডা কামরানের প্রচণ্ড আঘাতে তোতা ভাইয়ের নাক ফেটে যায়।

এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা ব্যাংকের সামনে ভর্তি গাইড বিক্রিরত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ওপর হামলা পরিচালনা করে। চালাতে থাকে এলোপাথাড়ি গুলি। গণিত ৩য় বর্ষের মেধাবী ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য শিক্ষক শফিকুল ইসলাম অন্যান্য শিবিরকর্মীদের সাথে গাইড বিক্রির কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

সন্ত্রাসী বাহিনীর উপর্যুপরি গুলিবৃষ্টি শুরু হওয়ার পর শফিকুল ইসলাম তাঁর প্রিয় কাফেলার অন্যান্য ভাইদের হেফাজত ও খোঁজ-খবরের স্বার্থে ব্যাংকের সামনে থেকে প্যারিস রোডের দিকে সিনেট ভবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমনি একটি ভয়াবহ মুহূর্তে সন্ত্রাসীদের একটি গুলি শহীদ শফিকুল ইসলামের বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। মারাত্মক আহতাবস্থায় তাঁকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মেডিক্যালে পৌঁছার পরও তিনি জিজ্ঞেস করতে থাকেন হৃদয়ের স্পন্দন ইসলামী ছাত্রশিবিরের অবস্থান, ক্যাম্পাসের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে। অল্প কিছুক্ষণ পরেই কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ডাক্তারের ভাষায় শফিকুল ইসলাম 'মৃত', কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যুহীন জীবনে হাজির হয়েছেন আমাদের প্রিয় শহীদ– পৌঁছে গেছেন পরম প্রিয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে।

খুনিরা যেখানে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় : মানবতা সেখানে নিভৃতে কেঁদে ফেরে

শহীদ শফিকুল ইসলামকে হত্যা করে জাসদ-মৈত্রীর সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী। ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং পুলিশের উপস্থিতিতে গুলি করে হত্যা করা হয় তাঁকে। প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে মামলা দায়ের করা

www.pathagar.com

হয়। সেই ১৯৮৯ থেকে আজ অবধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোলঘেঁষে বয়ে যাওয়া পদ্মায় বন্যার জোয়ার এসেছে নিয়মিত। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র উদিত হয়ে অস্ত যাচ্ছে আগের মতই, প্রকৃতিতে বসন্তের আগমন ও প্রস্থান ঘটেছে অনেকবার, সূর্য মেঘের আড়ালে লুকোচুরি খেলে স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে বারবার, কিন্তু আজ পর্যন্ত সুষ্ঠু বিচার করা হয়নি শহীদ শফিকুল ইসলামের খুনিদের। যার কারণে সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হয়ে ক্যাম্পাসে বার বার হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে নির্লিপ্তে, নির্বিঘ্নে। ফলশ্রুতিতে জীবন দিতে হয়েছে ১৯৯০-এর ২২ জুন শিবিরনেতা খলিলুর রহমানকে, '৯৩-এর ৬ ফেব্রুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমান ও রবিউল ইসলামকে, '৯৫-এর ১২ ফেব্রুয়ারি মোস্তাফিজুর রহমান ও ইসমাঈল হোসেন সিরাজীসহ আরো অনেককে।

এদেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যে, এ দেশের বিচারবিভাগও শাসকদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকতে পারেনি। প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি শহীদ শফিকুল ইসলামের বিচারের ক্ষেত্রেও। শহীদ শফিকুল ইসলামের বিচারের রায় ঘোষণার কয়েকদিন পূর্বে তৎকালীন ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির নেতৃত্বে খুনিচক্রের একটি দল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং শহীদ শফিকুল ইসলামের হত্যাকারীদের বেকসুর খালাস দাবি করে। বেগম খালেদা জিয়া খুনিচক্রের অন্যায় আবেদনের নিকট মাথানত করে হাতে তুলে নেন টেলিফোন, বিচার বিভাগকে নির্দেশ দেন তার কথা মতো রায় দিতে। ফলে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে যাওয়া একটি হত্যাকাণ্ডের নায়ক জাসদ-মৈত্রীর সন্ত্রাসীদের বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

শহীদ শফিকুল ইসলামের তো কোনো অপরাধ ছিল না। অপরাধ ছিল মাত্র একটি, সেটা হলো ইসলামকে ভালোবাসা। মহান আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "মুমিনদের সাথে ঐ বাতিলগোষ্ঠীর শত্রুতা শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল।" তারা শহীদ শফিকুল ইসলামকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি দৃশ্যত আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি রয়েছেন জীবিত। মহান আল্লাহর ঘোষণা, "যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না, বরং তাঁরা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না।" শহীদের রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জীবন চলার পথে আলো বিতরণ করবে অনন্তকাল ধরে।

শহীদ হওয়ার পূর্বে স্মরণীয় বাণী

"শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কালো থাবা বিস্তার করেছে। সন্ত্রাস নির্মূলে এক সাগর রক্তের প্রয়োজন।"

মা-বাবার প্রতিক্রিয়া

শহীদ শফিকের লাশ বাড়ি নেয়ার সাথে সাথে কান্নায় ভেঙে পড়েন শহীদের দুঃখিনী মাতা। পিতা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'তুমি আমাকে ছেড়ে আগেই চলে গেলে শফিক। কিভাবে আমি এত বড় বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকবো!'

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ শফিকুল ইসলাম

নাম : মো: শফিকুল ইসলাম

পিতার নাম : কায়েস আহমদ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- শাহবাজপুর, ডাক- আজমতপুর, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- নবাবগঞ্জ

ভাই-বোন : ৭ জন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : পঞ্চম

পরিবারের মোট সদস্য : ৯ জন

সাংগঠনিক মান : সাথী

কৃতিত্ব : এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ছিলেন

জীবনের লক্ষ্য : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া

আহত হওয়ার স্থান : রাবি সিনেট ভবনের সামনে

আঘাতের ধরন : কাটা রাইফেলের গুলি

যাদের আঘাতে শহীদ : সংগ্রাম পরিষদের যৌথ হামলায়

শহীদ হওয়ার তারিখ : ১৮ এপ্রিল, ১৯৮৯

শহীদ হওয়ার স্থান : রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

www.pathagar.com

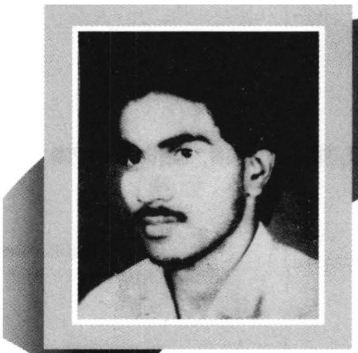

৩০

শহীদ আফাজ উদ্দিন

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী যে ছেলেটি ছিল সদা হাস্যোজ্জ্বল– তরুণ-সমাজের কাছে যে ছিল আদর্শ– সেই ছেলেটিই এক সময় বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের পালিত ফ্যাসিস্ট চক্রের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। আর এজন্যই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল ঠাণ্ডা মাথায়, সুপরিকল্পিতভাবে। সেই মহান সৌভাগ্যের অধিকারী তরুণ প্রাণ হলেন চট্টগ্রামের নাজিরহাটের চৌধুরী পরিবারের সন্তান শহীদ আফাজ উদ্দিন চৌধুরী।

পারিবারিক পরিচয়

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির নাজিরহাট গ্রামের বাশার চৌধুরীর সন্তান ছিলেন শহীদ। জন্মের আড়াই বছর পর স্নেহময়ী মাতাকে হারান। শাহাদাতকালে পিতা বয়সের ভারে ছিলেন ন্যুব্জ, শহীদের দুই বড় ভাই নুরুল আমীন ও জাহাঙ্গীর বিদেশে ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাই রুহুল আমীন চৌধুরী ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা।

শিক্ষাজীবন

শাহাদাতকালে নাজিরহাট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন তিনি।

অনন্য গুণে ভাস্বর আফাজ যে কারণে শহীদ হলেন

মেধাবী ছাত্র শহীদ আফাজ ছিলেন স্থানীয় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক। ফুটবল, ব্যাডমিন্টনসহ সব খেলায় তাঁর জুড়ি ছিল বিরল। শহীদ আফাজ উদ্দিনের হত্যাকাণ্ডটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। ইসলামী ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে রুশ-ভারতের এ দেশীয় এজেন্টরা শিবিরের স্থানীয় নেতাদের হত্যার ঘৃণ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনাটি পাকাপোক্ত করা হয় আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের উপস্থিতিতে, নাজিরহাটস্থ আবাহনী ক্লাবে। শহীদ আফাজ উদ্দিনের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই রুহুল আমিনের কাছ থেকে সন্ত্রাসীরা চাঁদা নিয়ে যায় এর আগে। সে টাকা দিয়ে বুলেট কিনে আফাজকে হত্যা করে নজিরহাটে উল্লাস করে।

www.pathagar.com

শাহাদাতের ঘটনা

১২ মে, ১৯৮৯ সালের ঘটনা। দিনটি ছিল শুক্রবার। ঈদুল ফিতরের মাত্র একদিন পর ঈদের খুশির রেশ তখনো কাটেনি। আফাজ উদ্দিন চৌধুরী বাড়ির নিকটস্থ মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে স্থানীয় গণি মার্কেটে একটি দোকানের সামনে বসে পত্রিকা পড়ছিলেন। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। মাগরিবের নামাজের ১৫/২০ মিনিট পর কুখ্যাত ফ্যাসিস্ট ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসী শাহজাহান, হেলাল, শ্যামল ও শাহনেওয়াজসহ ৮/১০ জন যুবক মোটরসাইকেলযোগে এসে অতর্কিত ঝাঁপিয়ে পড়ল শিবিরকর্মী আফাজ উদ্দিনের ওপর। দুর্বৃত্তদের কয়েকজন আফাজকে লক্ষ্য করে সাব-মেশিনগান (এসএমজি) ও স্টেনগানের ব্রাশফায়ার করলে আফাজের বক্ষ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। খুনিচক্র তাদের রক্তের লালসা চরিতার্থ করার পর নিজ আশ্রয়স্থলে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আফাজের নিষ্পাপ দেহটি নিঃসাড় হয়ে পড়ল। শাহাদাতের মর্যাদা নিয়ে মহান বন্ধুর কাছে হাজির হলেন সবার প্রিয় আফাজ উদ্দিন।

শহীদ আফাজ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন নাজিরহাটের আপামর ছাত্র-জনতার হৃদয়ের স্পন্দন। তাঁর বুকে বুলেট বিদ্ধ করে সন্ত্রাসীরা হিংসার যে লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছে– তা খুনিদের ঘুম নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত আর থামবে না। শহীদ আফাজ উদ্দিন চৌধুরীর সাথীরা আজ লড়তে শিখেছে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, অস্তিত্বের লড়াই, যা চলবে আরও ক্ষীপ্রগতিতে।

শহীদের স্মরণীয় বাণী

"ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সাহসী ও ত্যাগী হতেই হবে, এ জন্য যেকোনো ত্যাগ কিংবা শাহাদাতবরণ করতে হলেও আমি পিছু হটব না।"

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ আফাজ উদ্দিন চৌধুরী

নাম : আফাজ উদ্দিন চৌধুরী

মাতার নাম : রাবেয়া খাতুন

বাবার নাম : আলহাজ্ব আবুল বাশার চৌধুরী

জন্মতারিখ : ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭০

ভাই-বোন : ৭ ভাই-বোন (৫ ভাই, ২ বোন আপন), আপন ভাই-বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ

পরিবারের মোট সদস্য : ৯ জন, জীবিত ৭ জন

স্থায়ী ঠিকানা : মোহাম্মদ চৌধুরীবাড়ি (শহীদ আফাজ মঞ্জিল), পোস্ট- মুসবিয়া, পূর্ব মন্দাকিনী, নাজিরহাট, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

সাংগঠনিক মান : সাথী (চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব)

সর্বশেষ পড়াশোনা : এইচএসসি (দ্বিতীয় বর্ষ), নাজিরহাট কলেজ

শাহাদাতের স্থান : নাজিরহাটের গণি মার্কেট

আঘাতের ধরন : সাব-মেশিনগান ও স্টেনগানের গুলি

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসী শাহজাহান, হেলাল, শ্যামল ও শাহনেওয়াজসহ ৮/১০ জন

শাহাদাতের তারিখ : শুক্রবার, ১২ মে, ১৯৮৯

www.pathagar.com

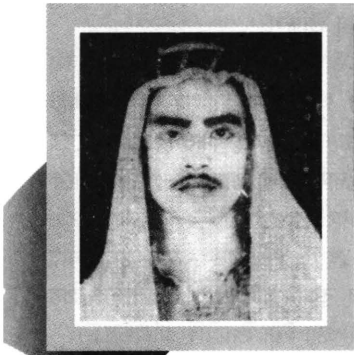

৩১

শহীদ শিহাব উদ্দিন

আলেমে দ্বীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন শহীদ শিহাব উদ্দিন। আর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছিলেন সমাজকে। কিন্তু আঁধারের সাথে যাদের মিতালী, আঁধারকেই তারা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। আঁধারের বুক চিরে সোনালি সকালের আগমন তাদেরকে খুব পীড়া দেয়। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা চায় আঁধারের রাজত্ব ধরে রাখতে। সন্ত্রাসী, রক্তপিপাসু ছাত্রলীগের নিকট তেমনি পছন্দ নয় রাজনীতিতে সন্ত্রাসীদের পরিবর্তে মেধাবীদের আগমন ঘটুক। এ কারণেই তারা মেধাবীনির্ভর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে। তাদের সন্ত্রাসের এক করুণ শিকার শহীদ শিহাব উদ্দিন।

ব্যক্তিগত পরিচয়

চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ থানাধীন ঘড়িহান গ্রামের বাসিন্দা মাওলানা হাশমত উল্লাহর চতুর্থ সন্তান শিহাব উদ্দিন। মায়ের নাম তফুনের নেছা। শহীদ শিহাব উদ্দিন ছিলেন ৫ ভাই ও ৪ বোনের মধ্যে চতুর্থ। মাওলানা হাশমত উল্লাহ ছিলেন মাছিমপুর ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। শহীদ শিহাবুদ্দিনের শাহাদাতের মাত্র ৪ বছর পরে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষাজীবন

শহীদ শিহাব উদ্দিন শোল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর এসে ভর্তি হন মাছিমপুর ফাজিল মাদ্রাসায়। এখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ফাজিল পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। কামিল ভর্তি হন চট্টগ্রাম নাজিরহাট আলিয়া মাদ্রাসায়। অল্প কিছুদিন পরেই কামিল পরীক্ষা। বাড়ি থেকে পরীক্ষা দেয়ার জন্য নাজিরহাটে চলে আসেন। কিন্তু হায়েনাদের আঘাতে তিনি আর পরীক্ষা দিতে পারলেন না। তবে সবচেয়ে বড় পরীক্ষায় ঠিকই তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আর সে কারণেই আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে শাহাদাতের সর্বোত্তম নজরানা পেশ করলেন। শাহাদাতবরণের আগে শিহাব উদ্দিন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব শাখার কর্মী ছিলেন।

www.pathagar.com

যেভাবে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন শিহাব উদ্দিন

১৯৮৯ সালের ১৫ জুন। তখন রাত প্রায় ৯টা। শিহাব উদ্দিন একটু আগেই জামায়াতের সাথে এশার নামাজ আদায় করেছেন। এবার রাতের খাওয়া সারার জন্য নাজিরহাট বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। বাজারে যাওয়ার পথেই তিনি সন্ত্রাসের কারিগর ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কবলে পড়লেন। শিহাব উদ্দিনকে দেখামাত্রই পাষণ্ডরা পেছন থেকে গুলিবর্ষণ করে। শিহাব উদ্দিন আত্মরক্ষার জন্য দৌড়ে একটি হোটেলে ঢুকে পড়েন। তবুও তিনি রক্ষা পাননি দুর্বৃত্তচক্রের কবল থেকে। হায়েনারা হোটেলে ঢুকেই খুনের উন্মাদনায় কাটা রাইফেল দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয় শিহাব উদ্দিনের বুক। ঘটনাস্থলে আমাদের প্রিয় ভাইটি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

জানাজা ও দাফন

শিহাব উদ্দিনের শাহাদাতের পরদিন ১৬ জুন অসংখ্য মানুষ সমবেত হয়ে শহীদের জানাজা নামাজ আদায় করেন। জানাজা শেষে শহীদের সাথীরা লাশ নিয়ে রওয়ানা হন চাঁদপুরের উদ্দেশে। ঐদিন রাতে শহীদের লাশ ফরিদগঞ্জ থানার মোল্লাগ্রামের নিজ বাড়িতে পৌঁছে। সেখানে শহীদের আত্মীয়-স্বজনদের আহাজারিতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। পরদিন ১৭ জুন সকাল ১০টায় পুনরায় জানাজার নামাজ শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

সেই 'মা' ডাক এখনো মনে পড়ে

শহীদ শিহাব উদ্দিন তাঁর মাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। যখন তাঁর মাকে দেখতেন না তখন অনেকটা পাগলপারা হয়ে পড়তেন। তাঁর মা বলেন, 'আজো তাঁর 'মা' ডাক আমার মনে পড়ে। মনে হয় কে যেন দূর থেকে 'মা' বলে ডাকছে।' তাঁর মা যখন একটি ডিম ভেজে দিতেন তখন নিজে পুরো অংশ না খেয়ে মায়ের জন্য অর্ধেক রেখে দিতেন। এই ছিল তাঁর মায়ের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টান্ত।

একনজরে শহীদ শিহাব উদ্দিন

নাম : শিহাব উদ্দিন
পিতার নাম : মাওলানা হাশমত উল্লাহ
মাতার নাম : তফুরেন নেছা
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- ঘড়িহান, থানা- ফরিদগঞ্জ, জেলা- চাঁদপুর
সাংগঠনিক শাখা : চট্টগ্রাম জেলা পূর্ব
সাংগঠনিক মান : কর্মী
শাহাদাতের তারিখ : ১৬ জুন, ১৯৮৯
শাহাদাতের স্থান : নাজিরহাট আলিয়া মাদ্রাসা
যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ
আঘাতের ধরন : ব্রাশফায়ার
ভাই-বোন : ৯ জন (৫ ভাই, ৪ বোন)
সর্বশেষ পড়াশোনা : কামিল পরীক্ষার্থী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : নাজিরহাট আলিয়া মাদ্রাসা

www.pathagar.com

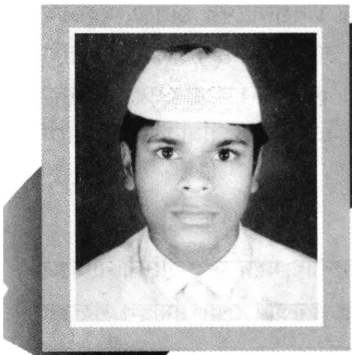

৩২

শহীদ মীর আনসার উল্লাহ

মীর আনসার উল্লাহ, সেক্যুলারের ধারক ছাত্রলীগের গুলিতে নির্মমভাবে জীবন দেয় এক নির্ভীক মুজাহিদের নাম। ১৯৮৯ সালের ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় আল্লাহর ঘর মসজিদের পাশেই সন্ত্রাসীরা জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল ষোল বছরের এই নিষ্পাপ শিবিরকর্মীর। শহীদ আনসার উল্লাহ ফটিকছড়ি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশ নেয়ার অপরাধের জন্যেই খোদাদ্রোহী বর্বর শক্তি তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। আর পূর্ণ বিকশিত হয়ে সুবাস ছড়ানোর আগেই ঝরে গেল একটি তাজা গোলাপ।

ব্যক্তিগত পরিচয়

ইসলামী আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী মীর আনসার উল্লাহ ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার ভূজপুর থানাধীন কাজিরহাট গ্রামের বাসিন্দা মীর মাহমুদ আহম্মদের সন্তান। তাঁর মায়ের নাম সুফিয়া খাতুন। ৬ ভাই ও ৩ বোন আর বাবা-মা নিয়ে তাঁদের সুখী পরিবার ছিল। আনসার উল্লাহ ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে চতুর্থ। ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে মীর আনসার উল্লাহ ফটিকছড়ি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা তাঁর সেই স্বপ্নকে পূরণ হতে দেয়নি ফুটতে দেয়নি একটি স্বপ্ন গোলাপ। কলিতেই তাঁকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছে শাহাদাতের সময় মীর আনসার উল্লাহ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী ছিলেন।

শাহাদাতের ঘটনা

১৯৮৯ সালের ১৪ আগস্ট। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন সন্ধ্যা ৭টায় ফটিকছড়ির কাজীরহাট বাজার মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন মীর আনসার উল্লাহ। নামাজ শেষে বন্ধু করিমের সঙ্গে চা পান করে বাড়ি ফিরছিলেন পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ওঁৎ পেতে থাকা রক্তপিপাসু সন্ত্রাসী শাহজাহান, হেলাল অহিদ, তসলীম প্রমুখ দুর্বৃত্তরা পথিমধ্যে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে প্রথমে বোমা ও পরে

www.pathagar.com

উপর্যুপরি গুলি চালাতে থাকে আনসার উল্লাহর ওপর। সন্ত্রাসীদের গুলিতে মুহূর্তেই তাঁর বুকের ডানপাশ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই শাহাদাত বরণ করেন ইসলামী আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক মীর আনসার উল্লাহ। চরম নির্মমতা হচ্ছে, দুর্বৃত্তরা তাঁকে খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, যাবার পথে লুটতরাজ ও ব্যাপক বোমাবাজির মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে।

শহীদের জানাজা

ঘটনার পরদিন ১৫ আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৫টায় লালদীঘি ময়দানে শহীদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর কফিন সহকারে জনতার শোক মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এবং পরে ফটিকছড়ির ভূজপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

প্রতিবাদের ঝড়

আনসার উল্লাহ হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৭ আগস্ট চট্টগ্রামের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ঘর্মঘট পালিত হয়। শুধু ১৯৮৯ সালে আনসার উল্লাহসহ ১১ জন শিবিরকর্মী শাহাদাত বরণ করেন।

আমানতদারির নজির

সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি আঘাতে মুমূর্ষাবস্থায় যখন শহীদের বড় ভাই ফয়জুল্লাহ তাঁকে চিকিৎসার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন তখন তিনি ভাইকে ডেকে বললেন, 'ভাই! আমি আর বাঁচবো না। ডাক্তার দেখাতে হবে না। আমার কাছে এক সওদাগর দু'টি টাকা পাবে, টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিও।' এর কিছুক্ষণ পরই আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন প্রিয় বান্দা মীর আনসার উল্লাহ।

ভাইহারা বোনের আহাজারি

শহীদ আনসার উল্লাহর মেজ বোন কুলসুমা খাতুন বলেন, 'অনেক কষ্ট করে ভাইকে কলেজে ভর্তি করিয়েছিলাম। ভাইকে ঘিরে আমাদের কতইনা স্বপ্ন ছিল! কিন্তু ইসলামের শত্রুরা আমাদের সে স্বপ্নকে পূরণ হতে দেয়নি। অনেক দিন সে বাড়ি না আসায় চিঠি দিয়ে তাঁকে বাড়িতে আনা হয়। কিন্তু আমার ভাইকে সন্ত্রাসীরা সেদিনই শহীদ করে দেয়। যদি জানতাম আমার ভাইকে এভাবে চিরতরে হারাতে হবে, তাহলে তাঁকে বাড়ি আসতে বলতাম না।'

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ মীর আনসার উল্লাহ

নাম : মীর আনসার উল্লাহ

পিতার নাম : মীর মাহমুদ আহম্মদ

মাতার নাম : সুফিয়া খাতুন

ভাই-বোন : ৬ ভাই, ৩ বোন

অবস্থান : ভাইদের মধ্যে চতুর্থ

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও ডাকঘর- কাজিরহাট, থানা- ভূজপুর, উপজেলা- ফটিকছড়ি, জেলা- চট্টগ্রাম

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : ফটিকছড়ি কলেজ, একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ

সাংগঠনিক মান : কর্মী

শাহাদাতের স্থান : কাজিরহাট মসজিদের পাশে

আঘাতের স্থান : বুকের ডান পাশে

শাহাদাতের তারিখ : ১৯৮৯ সালের ১৪ আগস্ট, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা

www.pathagar.com

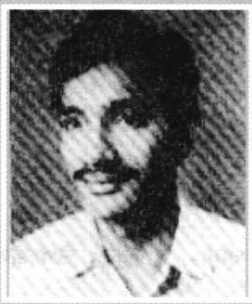

৩৩

শহীদ খোরশেদ আলম

চট্টগ্রাম ইসলামী ছাত্রশিবিরকে প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যাঁদেরকে আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে জীবন দিতে হয়েছে তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের শহীদ খুরশেদ আলম অন্যতম।

ব্যক্তিগত পরিচয়

শহীদ খুরশেদ আলম হলেন চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার পোপাদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল আলমের স্নেহাস্পদ সন্তান। তিনি ১৯৮৮ সালে বোয়ালখালী কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেন।

শহীদ হওয়ার ঘটনা

সন্ত্রাসে বিশ্বাসী ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তদের নিষ্ঠুর শিকারের আরেকটি প্রোজ্জ্বল ছবি শিবিরকর্মী মুহাম্মদ খোরশেদ আলম। ১৯৮৯ সালের ১৭ অক্টোবরের ঘটনা। বিকেল ৪টা। খোরশেদ আলম তখন বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ করেই ছাত্রলীগের স্থানীয় সন্ত্রাসী মনসুরের নেতৃত্বে ১৫/২০ জন দুষ্কৃতকারী খোরশেদের বাড়িতে হামলা চালায়। খোরশেদকে সামনে পেয়ে দুর্বৃত্তরা গুলি চালায়। এতে ঘটনাস্থলেই শাহাদাতবরণ করেন ইসলামী আন্দোলনের সাহসী সেনা খোরশেদ আলম।

একনজরে শহীদ খোরশেদ আলম

নাম : মোহাম্মদ খোরশেদ আলম
পিতার নাম : নুরুল আলম
জন্মস্থান : পোপদিয়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম
সাংগঠনিক শাখা : চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ, সাংগঠনিক মান : কর্মী
পড়াশোনা : ১৯৮৮ সালে বোয়ালখালী কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস
শাহাদাতের তারিখ : ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৯
শাহাদাতের স্থান : নিজ বাড়ি
পরিবারের মোট সদস্য : ৫ জন
যাদের আঘাতে শহীদ : স্থানীয় ছাত্রলীগ ক্যাডার মনসুর ও তার সঙ্গীদের দ্বারা

www.pathagar.com

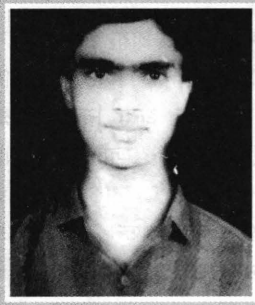

৩৪

শহীদ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন

জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন। কত সুন্দর এক নাম! নামের মতোই তেমনি সুন্দর ছিলেন তিনি। মায়াবী চেহারার লিটনকে একবার কেউ দেখলে তার চোখ আর সহজে নামত না। এমন মায়াবী চেহারার লিটনকে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিল সন্ত্রাসী আওয়ামী বাকশালীরা।

শাহাদাতের ঘটনা

১৫ অক্টোবর ১৯৮৯ ছিল জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত 'গণ জাগরণ' দিবস। দিবসকে সফল করে তুলতে জামায়াতে ইসলামী দোহাজারিতে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলে অংশ নেয় ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরাও। কিন্তু বরাবরের ন্যায় ইসলামপ্রিয় ছাত্র-জনতার এমন মিছিল বাতিলের তাঁবেদার আওয়ামী-বাকশালীদের পছন্দ হয়নি। মিছিলটি বাজার প্রদক্ষিণ করার এক পর্যায়ে আওয়ামী-বাকশালী ও তথাকথিত ছাত্রসেনার দুষ্কৃতকারীরা হঠাৎ করে মিছিলের ওপর বোমা ও গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুহুর্মুহু গুলি আর বোমার আঘাতে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন, নূরুল ইসলাম, নাসির উদ্দিন, মোহাম্মদ হোসাইন, মুহাম্মদ মহসীন, সুলতান আহমদ, মফিজসহ ৪০ জন আহত হন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে পড়ে জনতা। আহতদের আর্তচিৎকার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল। শান্তির জনপদে যেন হঠাৎ করেই ছোবল দেয় বিষাক্ত কালনাগীনিরা। গুরুতর আহত ও গুলিবিদ্ধ ৭ ভাইকে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে পথচারী নূরুল ইসলাম ১৬ অক্টোবর দুপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর চিকিৎসাধীন শিবিরকর্মী জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন ওইদিন মধ্যরাতে পৃথিবীর মায়া ছিন্ন করে চলে যান পরম প্রিয় প্রভুর সান্নিধ্যে। বোয়ালখালীর খোরশেদ হত্যার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লিটনও খোরশেদের পথ অনুসরণ করেন।

www.pathagar.com

জানাজা ও দাফন

লিটনের শাহাদাতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে পুরো চট্টগ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার পরদিন ১৮ অক্টোবর ১৯৮৯ বিকেলে লালদিঘী ময়দানে দুই শহীদের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজার পর শহীদের লাশ দাফনের জন্য নিজ বাড়িতে পাঠানো হয়। পথিমধ্যে কেরানীহাট ও সাতকানিয়া হাইস্কুল মাঠেও লিটনের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাঁকে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার উত্তর ডেমসাস্থ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। শহীদ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন তিন ভাই ও এক বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। শাহাদাতের সময় তিনি নাজিরহাট কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

একনজরে শহীদ জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন

নাম : জহির উদ্দিন মুহাম্মদ লিটন
মাতার নাম :
পিতার নাম :
স্থায়ী ঠিকানা : ডেমসা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
সাংগঠনিক মান : সাথী
সাংগঠনিক শাখা : চট্টগ্রাম জেলা দক্ষিণ
পরিবারের মোট সদস্য : ৭ জন
ভাই-বোন : ৪ ভাই ও ১ বোন
সর্বশেষ পড়াশোনা : এইচএসসি (দ্বিতীয় বর্ষ)
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : নাজিরহাট কলেজ
আঘাতের ধরন : বোমা, গুলি
শাহাদাতের তারিখ : ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৯
শাহাদাতের স্থান : দোহাজারী স্টেশন
যাদের আঘাতে শহীদ : আওয়ামী লীগ, ছাত্রসেনা

www.pathagar.com

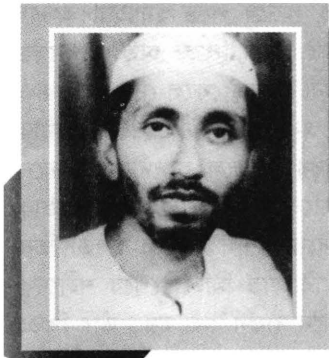

৩৫

শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যতদিন আকাশ-জমিনের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন থাকবে এ দ্বন্দ্ব। শয়তানের বাধা উপেক্ষা করেই সত্যের পতাকাবাহী একদল লোক আজীবন মানুষকে আল্লাহর শাশ্বত পথে ডাকবেই। সন্ত্রাসবাদী ছাত্রলীগের ঘাতকবাহিনীর আরেক নিষ্ঠুর শিকার শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া। ১৯৮৯ সালের ২২ অক্টোবর খুনিচক্র ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী হাফেজ ইয়াহিয়াকে ঠাণ্ডা মাতায় গুলি করে হত্যা করে।

মুহাম্মদ ইয়াহিয়া একজন হাফেজে কুরআন। নাজিরহাট আহমদীয়া মাদ্রাসা থেকে আলীম পাস করে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি সাহিত্য (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিলেন। আসা ছিল উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে সমাজ উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবেন। কিন্তু মানবতার চির দুশমন খুনিচক্র তাঁকে নির্মমভাবে খুন করে। ইসলামের পথে চলার অপরাধেই তাঁকে অকালে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়। ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের হাতে এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় শিবিরকর্মী হিসেবে হাফেজ ইয়াহিয়া শাহাদাত বরণ করেন। এর আগে ১৭ অক্টোবর খোরশেদ ও লিটনকে খুনিচক্র ব্রাশফায়ারে খুন করে। ২২ অক্টোবর ১৯৮৯ সালের দুপুর ১টার দিকে রক্তের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা হায়েনারা কাটারাইফেল, স্টেনগান, বন্দুক ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নাজিরহাটের মন্দাকিনী এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক মোজাফ্ফর চৌধুরীর বাড়িতে হামলা চালায়। মোজাফ্ফর চৌধুরীর পুত্র শাহেদ চৌধুরী ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মী হওয়ার কারণেই মূলত খুনিচক্র তাদের বাড়িতে এই সন্ত্রাসী আক্রমণ চালায়। এই হামলার সময় মোজাফ্ফর চৌধুরীর বৃদ্ধা স্ত্রী, পুত্রবধূসহ কয়েকজনকে কিরিচের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত ও গণলুটপাট করে মানবতা বিধ্বংসীরা। ঘাতকবাহিনী লুটপাটের পর ফেরার পথে সামনে হাফেজ ইয়াহিয়াকে পেয়ে কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই সরাসরি গুলি করে। কালো অস্ত্রের বুলেটে

www.pathagar.com

হাফেজ ইয়াহিয়ার বক্ষ ঝাঁঝরা হয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ইয়াহিয়া অসহ্য যন্ত্রণায় হাত-পা ঝাঁকি দিচ্ছিলেন। প্রাণ সংহারের এই নির্মম মুহূর্তে হাত ও পায়ের গোড়ালি কিরিচের আঘাতে বিচ্ছিন্ন এবং লাশ মন্দাকিনী নদীতে ফেলে দেয় পাষণ্ডরা। মন্দাকিনী নদীর স্রোতে হাফেজ ইয়াহিয়ার লাশ প্রায় অর্ধ কিলোমিটার ভেসে যাওয়ার পর স্থানীয় জনগণ তাঁকে উদ্ধার করে। ২৩ অক্টোবর বিকেলে লালদীঘি ময়দানে হাজার হাজার শোকাতুর ছাত্র-জনতা কুরআনের হাফেজ এই শহীদের জানাজার নামাজে অংশ নেন। জানাজা শেষে শহীদের লাশ নিয়ে বিশাল মিছিলে জনতা তিন শিবিরনেতা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে শহীদের লাশ হাটহাজারীর আলীপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর পিতা হাফেজ জামাল হোসেন ও মাতা ফিরোজা বেগমের কবরের পাশেই তাঁদের স্নেহের দুলাল ইয়াহিয়া চিরশায়িত।

একনজরে শহীদ হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া

নাম : হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
পিতার নাম : হাফেজ মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন
মাতার নাম : ফিরোজা বেগম
ভাই-বোন : ৩ ভাই, ৫ বোন
ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সবার ছোট
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- আলীপুর, ডাক ও থানা- হাটহাজারী, জেলা- চট্টগ্রাম
শিক্ষাগত যোগ্যতা : শাহাদাতকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি (সম্মান) প্রথম বর্ষে অধ্যয়ন করছিলেন
শাহাদাতের স্থান : নাজিরহাট, মন্দাকিনী
শাহাদাতের তারিখ : ১৯৮৯ সালের ২২ অক্টোবর
সাংগঠনিক মান : সাথী
আঘাতের স্থান : মুখে বন্দুকের গুলি এবং হাত-পায়ের রগ কর্তন

www.pathagar.com

৩৬

শহীদ আলী হোসেন

শহীদ আলী হোসেনের মৃত্যুর সংবাদ বাকরুদ্ধ করে দিল বালিয়াপাড়া গ্রামবাসীদের। এভাবে তাঁর চলে যাওয়ায় গ্রামবাসীদের হতবাক হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। সহজ-সরল, অনুপম চরিত্রের অধিকারী আলী হোসেনকে অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিল বাকশালী ছাত্রলীগ।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

স্বৈরাচার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সম্মুখে নেতৃত্ব দেয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ১৫ আগস্ট ১৯৮৯ দোহাজারিতে জামায়াতে ইসলামী গণজাগরণ দিবস উপলক্ষে মিছিলের আয়োজন করে। মুয়াজ-মায়াজের উত্তরসূরি আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় সৈনিক আলী হোসেন সে মিছিলে যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল চলাকালে আওয়ামী-বাকশালীচক্র ব্যাপক বোমা হামলা ও গুলি চালায়। এর সাথে যোগ হয় পুলিশি হামলা। পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলে অন্যায়ভাবে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে বিপরীতে মারাত্মকভাবে আহত আলী হোসেনসহ জামায়াত-শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। কারাগারে আলী হোসেনের সুষ্ঠু চিকিৎসা করা হয়নি। শিবির নেতৃবৃন্দের জোরালো দাবি সত্ত্বেও তাঁকে কারাগার থেকে হাসপাতালে পাঠানো হয়নি। পরবর্তীতে অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে চট্টগ্রাম সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে তাকে স্থানান্তর করা হয়।

শাহাদাত

হাসপাতালের ডাক্তাররা আলী হোসেনকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর জখম ছিল অত্যন্ত গুরুতর। তাছাড়া চিকিৎসা করাতে বেশ বিলম্বও করা হয় পুলিশ প্রশাসনের একগুঁয়েমির কারণে। ক্রমশ মৃত্যুর পথের দিকে অগ্রসর হন আলী হোসেন। কয়েক দিন মৃত্যু যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়ার পর ২৯ অক্টোবর ১৯৮৯ সালে

www.pathagar.com

বিকেল ৪টায় সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হন তিনি।

জানাজা ও দাফন

আলী হোসেনের শাহাদাতের সংবাদে সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে আসে। পরদিন ৩০ অক্টোবর বিকেলে লালদীঘি ময়দানে তাঁর নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহীদের লাশ চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজলার পশ্চিম জলদিস্থ বালিয়াপাড়া গ্রামে পাঠানো হয়। লাশ গ্রামে পৌঁছলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেখানে পুনরায় নামাজে জানাজার পর আলী হোসেনকে দাফন করা হয়।

আলী হোসেন আর কখনো আমাদের মাঝে আসবেন না। কেবল তাঁর আত্মত্যাগের কথাই বেঁচে থাকবে। সে প্রেরণার সফল বাস্তবায়নে আলী হোসেনের দেখিয়ে যাওয়া পথে সংগ্রাম করা উচিত সকলকে।

একনজরে শহীদ আলী হোসেন

নাম : আলী হোসেন

সাংগঠনিক মান : সাথী

ভাই-বোন : ৬ ভাই, ৩ বোন

স্থায়ী ঠিকানা : বালিয়াপাড়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

আহত হওয়ার স্থান : দোহাজারী

আহত হওয়ার তারিখ : ১৪ আগস্ট, ১৯৮৯

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ

শহীদ হওয়ার তারিখ : ২৯ অক্টোবর, ১৯৮৯

www.pathagar.com

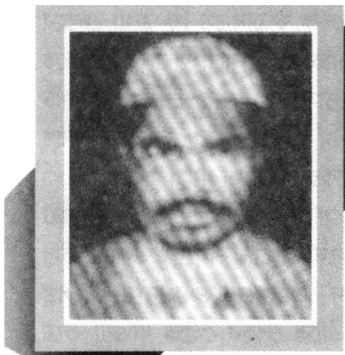

৩৭

শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক

সন্ত্রাসের বর্বর ছোবল থেকে মুক্ত থাকেনি দেশের প্রধান দ্বীনি প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা'। আলেমে দ্বীন তৈরির এই শ্রেষ্ঠ কারখানায় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নামধারী দুষ্কৃতকারীদের নিষ্ঠুর হামলায় ১৯৮৯ সালের ৭ ডিসেম্বর শাহাদাত বরণ করেন কৃতী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুল খালেক।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক ছিলেন পরিবারের ৫ ভাই ও ২ বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। শহীদের পিতার নাম মুহাম্মদ আনসার উল্লাহ মিয়া। আর মাতার নাম মোছাম্মৎ জুবেদা খাতুন। ভাইদের মধ্যে অন্যরা ছোটখাট চাকরি বা ব্যবসা করেন। শহীদ মুাহাম্মদ আবদুল খালেক ছিলেন পরিবারের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষিত। তাঁকে ঘিরে পরিবারের ছিল অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু সবকিছু ভেঙে চুরমার করে সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিল ঘাতকেরা।

শিক্ষাজীবন

শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক আলোনিয়া কুলচুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর পরিবারের ইচ্ছানুযায়ী সিনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ১৯৮৪ সালে দাখিল, ১৯৮৬ সালে আলিম ও ১৯৮৮ সালে ফাজিল পাস করেন। এরপর তিনি জ্ঞানের ভাণ্ডার নিজেকে সমৃদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভর্তি হন ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসায়। ইসলামী ছাত্রশিবিরের একনিষ্ঠ কর্মী শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক শাহাদাতকালে কামিল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

শাহাদাতের ঘটনা

১৯৮৯ সালের ৭ নভেম্বর। অন্যান্য দিনের মতোই সে দিনের কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল ছাত্রদল নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। তারা সেদিন খুনের উন্মত্ততায়

www.pathagar.com

মেতে উঠেছিল। ওই দিন সকাল ১০টায় আবদুল খালেক ছাত্রাবাসে ফি জমা দেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। আর কিছুদিন পরেই মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রি নিয়ে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করতেন তিনি। ইচ্ছা ছিল মাদ্রাসা জীবনের শেষ পরীক্ষাটি ছাত্রাবাসে থেকেই শেষ করবেন। কিন্তু ঘাতকের নির্মম ছোবল তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হতে দেয়নি। অকালেই জীবনপ্রদীপ নিভে গেছে ঘাতকের হিংস্র থাবায়।

ঘাতকদল খুনের নেশায় ওঁৎ পেতে থাকতো প্রায়ই। সেদিন শহীদ খালেক সিট রেন্ট হিসেবে ৪৫৭ টাকা জমা দেয়ার সময় শিক্ষকদের সামনেই কয়েকজন দুষ্কৃতকারী তাঁর ওপর আক্রমণ শুরু করে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে তিনি দৌড়ে মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি বাড়িতে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করেন। দুর্বৃত্তরা তাঁকে পেছন থেকে ধাওয়া করে ১/২, উর্দু রোডের একটি বাড়ির সিঁড়িতে ধরে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত ও বর্বর আক্রমণ চালায়। দুর্বৃত্তরা খুনের লালসা মিটিয়ে নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে। লোকজন আবদুল খালেকের রক্তাক্ত নিস্তেজ দেহ মিটফোর্ড হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। আর এভাবেই আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় এক সৈনিক আলেমে দ্বীন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল খালেক শাহাদাত বরণ করেন।

জানাজা ও দাফন

শহীদ আবদুল খালেকের লাশ পোস্টমর্টেমের পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে নিয়ে আসা হয়। এখানেই শহীদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা নামাজের ইমামতি করেন তৎকালীন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী। জানাজার ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইউনুস শিকদার, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম মুকুল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা ইসলামী আদর্শ কায়েমের মাধ্যমে শহীদের খুনের বদলা নেয়ার আহবান জানান।

জানাজার পর শহীদের লাশের কফিন চাঁদপুর নিজ বাড়ির উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। নেয়ার পথে রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসায় দ্বিতীয়বার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে কয়েক হাজার শোকার্ত ছাত্র-জনতা অংশ নেন। সর্বশেষে তাঁর নিজ গ্রাম আলোনিয়ায় তৃতীয়বার জানাজার পর লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়। শেষবার ইমামতি করেন আওলাদে রাসূল (সা) মাওলানা সাইয়েদ আনোয়ার হোসাইন তাহের আল মাদানী।

ঘটনার প্রতিক্রিয়া

মাওলানা আবদুল খালেকের শাহাদাতের খবর ছড়িয়ে পড়লে রাজধানীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। শোককে শক্তিতে পরিণত করে ছাত্র-জনতা ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

পরবর্তীতে শহীদ আবদুল খালেকের খুনের সাথে জড়িত ২০ জন দুষ্কৃতকারীকে আসামি করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। দুষ্কৃতকারীরা সবাই ছাত্রদলের সশস্ত্র

www.pathagar.com

সদস্য। পুলিশ তাদের গ্রেফতার না করায় তারা পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে নেতৃত্ব দেয়।

একনজরে শহীদ মুহাম্মদ আবদুল খালেক

নাম : মুহাম্মদ আবদুল খালেক

পিতার নাম : মুহাম্মদ আনসার উল্লাহ মিয়া

মাতার নাম : মোছাম্মৎ জুবেদা খাতুন

সাংগঠনিক মান : কর্মী (ঢাকা মহানগরী পূর্ব)

ভাই-বোন : ৫ ভাই, ২ বোন

ভাই-বোনদের মাঝে অবস্থান : সর্বকনিষ্ঠ

স্থায়ী ঠিকানা : আলোনিয়া, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

শাহাদাতকালে অধ্যয়ন : ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা (কামিল, ২য় বর্ষ)

শহীদ হওয়ার স্থান : আলিয়া মাদ্রাসা হল প্রাঙ্গণ, সকাল ১০টা

যাদের আঘাতে শহীদ: ছাত্রদল

শহীদ হওয়ার তারিখ : ৭ নভেম্বর, ১৯৮৯

মায়ের মন্তব্য : ১৩ আগস্ট ১৯৮৯, আলিয়া মাদ্রাসায় সংঘর্ষের পর তাঁর মা বলেছিলেন, 'সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। সংগঠন ছেড়ে দাও।' আর শহীদ আবদুল খালেক মাকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন, 'আমি মারা গেলে তুমি শহীদের মা হবে।'

www.pathagar.com

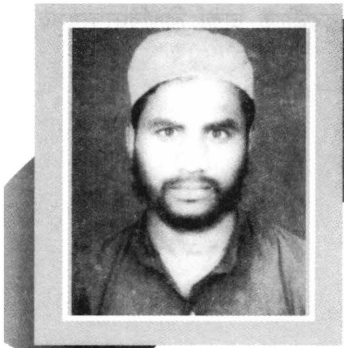

৩৮

শহীদ মোজাহের আলী

আল্লাহর দ্বীনের অকুতোভয় সৈনিকেরা কখনই খোদাদ্রোহী শক্তির কাছে মাথানত করেনি। তাঁরা আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে কাজ করে যান। এ রকম একজন সাহসী সৈনিক ছিলেন শহীদ মোজাহের আলী। এই সহজ-সরল মানুষটির দ্বীনের প্রতি আকর্ষণ খোদাদ্রোহী শক্তির সহ্য হয়নি। যার ফলশ্রুতিতে তারা মোজাহের আলীকে হত্যার পথ বেছে নেয়।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৩৮তম শহীদ হলেন শহীদ মোজাহের আলী। তিনি কুষ্টিয়া জেলার মীরপুরের মিঠল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ মোজাহের আলীরা ৬ ভাই ও ১ বোন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছোটকাল থেকে তাঁর ইসলামের প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। যার কারণে তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এ কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সাথী শপথ গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন

শহীদ মোজাহের আলীর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। তবে যতটুকু জানা যায় তিনি কুষ্টিয়ার মীরপুর নাজমুল উলুম কামিল মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। এ মাদ্রাসার ছাত্র থাকাকালেই তাঁকে বর্বরোচিত পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করা হয়। সশস্ত্র ছাত্র দুর্বৃত্তরা তাঁকে আখক্ষেতে ধরে নিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ সংহার করে।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

শহীদ মোজাহের আলী অত্যন্ত নম্র স্বভাবের দ্বীনদার শিবিরনেতা ছিলেন। তিনি ছোটকাল থেকেই মুখে দাড়ি রেখেছিলেন। প্রায় নিয়মিত মাথায় টুপি দিয়ে চলতেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরে আসার পর মানুষকে

www.pathagar.com

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিলের কাজে সদা ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বন্ধুমহলের সকলকে কুরআনের দিকে আহ্বান করতেন। তাঁর দাওয়াতী চরিত্র খোদাদ্রোহী শক্তি সহ্য করতে পারেনি। তারা তাদের খোদাবিমুখ মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে মোজাহের আলীকে প্রতিবন্ধক ভাবতো। এ কারণেই দুর্বৃত্তরা মোজাহের আলীকে খুন করার জন্য পরিকল্পনা এঁটেছিল। খুনের উন্মাদনায় সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকতো প্রায়ই। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো ১৯৯০ সালের ২১ জানুয়ারি। এই দিনে খুনিরা মোজাহের আলীকে একা পেয়ে ধরে আখক্ষেতে নিয়ে যায় এবং নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে তাঁর দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে ও পরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে পৈশাচিক কায়দায় তাঁকে হত্যা করে। হত্যার পর খুনিরা নির্বিঘ্নে নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়। এই সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি, আকাশ, বাতাস সকলেই সাক্ষী হয়ে রইল। কিন্তু এই খুনিদের দুনিয়ার আর কোনো বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হল না।

শাহাদাতের পর প্রতিবাদসভা

১৯৯০ সালের ২২ জানুয়ারি আখক্ষেত থেকে লাশ উদ্ধারের পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে ঢাকাসহ সারাদেশে। ২২ জানুয়ারি বিকেলে ইসলামী ছাত্রশিবির রাজধানীতে বিশাল প্রতিবাদসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করে। জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান এক বিবৃতিতে মোজাহেরের নির্মম হত্যাকাণ্ডে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং খুনিদের খুঁজে বের করে শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

জানাজা ও দাফন

১৯৯০ সালের ২২ জানুয়ারি সোমবার কুষ্টিয়া ঈদগাহ ময়দানে শহীদের প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। কুষ্টিয়া জেলা জামায়াতের আমীর ডা. আনিসুর রহমান বিশাল জানাজায় ইমামতি করেন। পরে আমলা হাইস্কুল মাঠে দ্বিতীয়বার ও সর্বশেষ শহীদের নিজ গ্রামে জানাজার পর লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

অনুকরণীয় আদর্শ

ইসলামী আদর্শকে বিশ্বের জমিনে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অসংখ্য ভাইকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে। এটাই ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্য। এই ধারাবাহিকতায় এ পথেই হাঁটতে হয়েছে শহীদ মোজাহের আলীকেও। ইসলামের পথে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে তিনি ইসলামের সৈনিকদের নিকট এক অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হয়ে আছেন।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ মোজাহের আলী

পূর্ণ নাম : মোহাম্মদ মোজাহের আলী

পিতার নাম : মোহাম্মদ ইমদাদ আলী মণ্ডল

মাতার নাম : মোছাম্মৎ রাজুমুন্নেসা

জন্ম : ১৯৬৫ সাল

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ১০ জন

ভাই-বোন : ৮ জন

পড়াশোনা : মীরপুর নাজমুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া

স্থায়ী ঠিকানা : মিঠল, মীরপুর, কুষ্টিয়া

সাংগঠনিক মান : সাথী

শাহাদাতের তারিখ : ২১ জানুয়ারি, ১৯৯০

www.pathagar.com

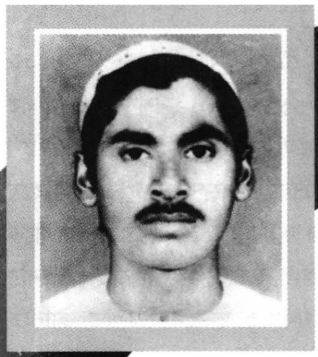

৩৯

শহীদ খলিলুর রহমান

১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাস্তিক্যবাদী ইসলামবিরোধী খুনিরা শিবিরের আটজন নেতা ও কর্মীকে হত্যা করেছে। অতীতে সকল খুনির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মামলা দায়ের করার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলেই খুনিচক্র বারবার খুনের নেশায় মেতে ওঠে। মেতে উঠেছিল সেদিনও। যার ফলশ্রুতিতে খলিলের মতো একজন প্রতিভাবান ও সম্ভাবনাময় তরুণকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হল। শহীদ খলিলুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম শহীদ।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

শহীদ খলিলুর রহমান একজন পিতৃমাতৃহীন এতিম। তাঁর পিতার নাম ছিল আয়েজ আলী মন্ডল। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানাধীন ঘোষকুড়া নামক গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন শহীদ খলিলুর রহমান। নয় ভাই-বোনের মাঝে তাঁর অবস্থান ছিল পঞ্চম। আল্লাহর দ্বীনের দুশমনরা খলিলকে হত্যা করে তাদের জিঘাংসা চরিতার্থ করলে পরিবারটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

লেখাপড়া ও সাংগঠনিক জীবন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্রশিবিরের অষ্টম শহীদ খলিলুর রহমান ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রথম বর্ষের (পুরাতন) ছাত্র ছিলেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য শহীদ খলিলুর রহমান শাহাদাতকালে ১৯৮৯-৯০ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সৈয়দ আমীর আলী হল শিবিরের সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছিলেন। প্রতিভাবান এই ছাত্র ইতঃপূর্বে নাটোর শহর ও জেলা শাখার সেক্রেটারি ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কয়েকবার।

www.pathagar.com

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

১৯৮৯-এর এপ্রিলের পর থেকে ক্যাম্পাসে কমবেশি টেনশন থাকলেও ৯০-এর ২২ জুনের আগে তেমন বড় ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ১৯৮৯-৯০ সেশনের প্রথম বর্ষ সম্মানের ক্লাস মাত্র ১২ দিন আগে শুরু হয়েছে। সেশনজট কিছুটা কমতে শুরু করেছে। ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ রীতিমত চলছে। নবাগত ছাত্র-ছাত্রীরা শিবিরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে মুক্তিকামী এই কাফেলায় শরিক হচ্ছে। আর অন্যদিকে শিবিরের অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে বাতিলপন্থী খোদাদ্রোহীরা হিংসার থাবা বিস্তার করতে শুরু করেছে। ঘটনার দিন রাত ১০টায় ছাত্রশিবির শাহ মাখদুম হল শাখা নবাগত ছাত্রদের স্বাগত জানিয়ে হলে মিছিল শুরু করে। মিছিল চলাকালে ছাত্রলীগ (না-শ)সহ অন্যান্য সকল ছাত্রসংগঠনের সন্ত্রাসীরা একযোগে চিৎকার শুরু করে 'ধর ধর, মার মার' ইত্যাদি বলে। কিন্তু শিবিরের মিছিল তখনও "সব মতবাদ পায়ে দলে/আয়রে তোরা খোদার পথে; "মুক্তির একই পথ-ইসলামী বিপ্লব"; নবাগত ছাত্র ভাইয়েরা/স্বাগতম শুভেচ্ছা' ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে হল প্রদক্ষিণ করছিল। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা করিডোরের লাইট নিভিয়ে গোটা হলকে অন্ধকার করে দিয়ে মিছিলের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে। অকথ্য ভাষায় শিবিরকে গালিগালাজ করতে থাকে। অন্ধকারময় অবস্থায় সন্ত্রাসীরা হাতবোমা আর ককটেলের শব্দে হলকে প্রকম্পিত করে তোলে। হলের গেটে তালা লাগিয়ে অস্ত্র হাতে হত্যার উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ শিবিরকর্মীদের ওপর। অন্ধকারের মাঝেই প্রাণভয়ে ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। জীবন রক্ষার্থে তারা হল গেটের তালা ভেঙে পার্শ্ববর্তী সৈয়দ আমীর আলী হলে আশ্রয় নেয়। তখন আমীর আলী হলের প্রভোস্ট আবদুর রহমান বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করে বাইরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে খুনি সন্ত্রাসীরা গোটা হল ঘিরে ফেলে। এখানেও শিবিরকর্মীরা নিশ্চয়তা পেলেন না। উপর্যুপরি বোমা ও ককটেলের শব্দে হলকে এক নারকীয় হত্যাপুরীতে পরিণত করল। ঘটনার আকস্মিকতা উপলব্ধি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সায়েদুল ইসলাম ও রাজশাহীর এসপি আলী ইমাম ফোর্সসহ সেখানে উপস্থিত হন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সামনে এমন হত্যাযজ্ঞ চলছে অথচ প্রশাসন নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রক্টর সায়েদুল ইসলাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রায় ৪০/৫০ মিনিট যাবৎ অনুরোধ জানাতে থাকেন কিন্তু এসপি তার কথায় কোনো কর্ণপাত করেননি। প্রক্টরের জোরালো বক্তব্য পুলিশ ভূমিকা নিলেই এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটত না।

পুলিশ যখন সেখানে উপস্থিত তখন রাকসু'র ভিপি রাগিব আহসান মুন্নাসহ সংগ্রাম পরিষদের বিপুল সংখ্যক কর্মী সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ সন্ত্রাসীদের নিরস্ত্র করার জন্য কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং পুলিশের সামনেই সন্ত্রাসীরা হলের ভেতর প্রবেশ করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় পুলিশ প্রহরায় শিবিরকর্মীদের ওপর নির্বিচারে গুলি

www.pathagar.com

চালায়। অনেকের মত খলিলুর রহমানও আহত হলেন। তারপর খোদাদ্রোহী হায়েনারা চাইনিজ কুড়াল, ধারাল কিরিচ ও ছোরা দিয়ে খলিলকে নির্মমভাবে আঘাত করে।

অনেকের ধারণা খলিলুর রহমান সন্ত্রাসীদের উপর্যুপরি আঘাতে হলের মধ্যেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আবার অনেকেই বলেছেন প্রচণ্ড আঘাতে খলিলুর রহমান জ্ঞান হারিয়েছিলেন। পরে তাঁকে সন্ত্রাসীরা হলের বাইরে এনে হত্যা করে।

যাই হোক, রাত ১২টার দিকে খলিলুর রহমানকে মেডিক্যালে নেয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের খুনিরা তাতে বাধা প্রদান করে। পাষণ্ড নরখাদকরা শহীদ খলিলের লাশের গলায় দড়ি দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে প্রথমে লতিফ হলে আনে, তারপর এসএম হলের গেস্ট রুমে নিয়ে যায়। উপরন্তু হায়েনার দল শহীদ খলিলকে নিজেদের কর্মী বলে মিথ্যা দাবি করতেও দ্বিধা করেনি। বহু চেষ্টার পর রাত ৩টার দিকে খলিলুর রহমানকে মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে শহীদ খলিলুর জান্নাতের অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়ে উপরে উঠে গেছেন। শহীদ খলিলকে যখন আমীর আলী হল থেকে দুস্কৃতিকারীরা বের করে আনে তখন হল গেটে প্রক্টর ও এসপি উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা ওই মানুষখেকোদের হাত থেকে শহীদ খলিলকে উদ্ধারের সামান্যতম চেষ্টাও করেননি।

পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা

সন্ত্রাসীরা যখন হল ঘেরাও করে রেখেছিল তখন পুলিশ হলের মধ্যে যেতে অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু প্রক্টরের অনুরোধকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ রাখেনি। অথচ সন্ত্রাসীরা বাইরে থেকে হলে প্রবেশ করল কিভাবে(?) তা সবার কাছেই রহস্যজনক। শহীদ খলিলকে খুন করে জাসদ মৈত্রীর খুনিরা পুলিশের সামনে দিয়ে মৃত খলিলকে হল গেট দিয়ে বের করল। ইচ্ছে করলে পুলিশ বাহিনী সন্ত্রাসীদের হাত থেকে খলিলুর রহমানকে তখনও উদ্ধার করতে পারত। কিন্তু কোনো এক রহস্যময় কারণে তারা তা করেনি।

হল প্রভোস্ট আবদুর রহমান নিজ মুখে স্বীকার করেছেন, 'শিবিরের সমর্থক আমীর আলী হলে বেশি ছিল কিন্তু তারা কাউকে আক্রমণ কিংবা অন্যকোনো কক্ষে অগ্নিসংযোগ করেনি। বাইরে থেকে সন্ত্রাসীরা গিয়েই খলিলকে হত্যা করেছে।'

খলিলকে হত্যা করে দুস্কৃতিকারীরা তাদের কর্মী বলে দাবি করেছিল। কিন্তু সত্য উদ্ভাসিত হওয়ায় তাদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচিত হয়। খলিল হত্যার পর একটি তদন্ত কমিটিও গঠন হল কিন্তু তদন্তের ফলাফল জাতি জানতে পারেনি। পরবর্তীতে বিএনপি সরকারের সাথে আওয়ামী লীগ আঁতাত করে ৬০ জন খুনিকে মামলা থেকে রেহাই দিয়েছে।

www.pathagar.com

একনজরে শহীদ খলিলুর রহমান

নাম : মো: খলিলুর রহমান

পিতার নাম : আয়েজ আলী মন্ডল

স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম- ঘোষকুড়া, ডাকঘর- রামবাড়ী, থানা- নিয়ামতপুর, জেলা- নওগাঁ

ভাই-বোন : ৯ জন

ভাই-বোদের মাঝে অবস্থান : পঞ্চম

পরিবারের মোট সদস্য : ১৬ জন

সর্বশেষ পড়াশোনা : ইসলামিক স্টাডিজ (সম্মান), প্রথম বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জীবনের লক্ষ্য : শিক্ষকতা

সাংগঠনিক মান : সদস্য

আহত হওয়ার স্থান : সৈয়দ আমীর আলী হল

শাহাদাতের স্থান : ঘটনাস্থলেই

আঘাতের ধরন : কাটা রাইফেলের গুলি, হকিস্টিক, রড ও কুড়াল

যাদের আঘাতে শহীদ: জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ইউনিয়ন

শাহাদাতের তারিখ : ২২ জুন, ১৯৯০

মায়ের প্রার্থনা : শহীদের নিজের পিতা-মাতা মৃত হওয়ায় সৎ মা তাঁকে লালন-পালন করতেন। শহীদ হওয়ার পর তাঁর মা তাঁকে শহীদ হিসেবেই কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন।

www.pathagar.com

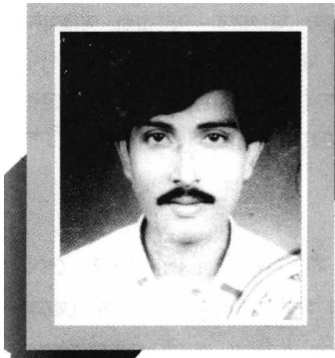

৪০

শহীদ শেখ ফিরোজ মাহমুদ

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। এ দেশ সবুজ-শ্যামল অনাবিল সৌন্দর্যমণ্ডিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইসলামী আন্দোলনের বৃহত্তম সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের অসংখ্য ভাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের মূল্যবান সম্পদ প্রাণকে বিসর্জন দিয়েছেন। সেই শহীদি কাফেলার অন্যতম সদস্য ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র ফিরোজ মাহমুদ।

ব্যক্তিগত পরিচিতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ৪০তম শহীদের নাম শেখ মুহাম্মদ ফিরোজ মাহমুদ। শহীদ শেখ ফিরোজ মাহমুদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর হাতিয়ায়। তাঁর পিতার নাম মাওলানা শেখ আহমদ। ফিরোজ মাহমুদ পরিবারের সদস্যদের একান্ত প্রিয় ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

শিক্ষাজীবন

শহীদ ফিরোজ মাহমুদ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেন। তিনি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে দাখিল ও আলিম পাস করেন এবং ওয়াজেদিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল পাস করেন। মাদ্রাসার ছাত্র হয়েও মেধাবী ছাত্র ফিরোজ মাহমুদ পরবর্তীতে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে উদ্ভিদবিদ্যা কৃতিত্বের সাথে সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন। শহীদ হওয়ার পূর্বে শেখ ফিরোজ মাহমুদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

সাংগঠনিক মান

শহীদ ফিরোজ মাহমুদ একজন সফল সংগঠক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরে আসার পর নিজেকে একজন ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতকর্মী হিসেবে

www.pathagar.com

বিবেচনা করেন। ইসলামী আন্দোলনের উদীয়মান সংগঠক ফিরোজ মাহমুদ ওয়াজেদিয়া কামিল মাদ্রাসার সভাপতি, পাঁচলাইশ থানা সেক্রেটারিসহ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। শহীদ ফিরোজ মাহমুদ সর্বশেষ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্যপ্রার্থী ছিলেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র-সংসদের নির্বাচিত ম্যাগাজিন সম্পাদক ছিলেন।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

ভয়ঙ্কর দিনটি ১৯৯১ সালের ১১ মার্চ। রাত তখন সাড়ে দশটা। শিবিরনেতা শেখ ফিরোজ মাহমুদ লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় অন্য একজন সঙ্গীসহ বাদুরতলা বাসা থেকে দোকানে গিয়েছিলেন। বাসায় ফেরার পথে ছাত্রলীগের দুর্বৃত্তরা একটি মাইক্রোবাসে এসে তাঁদের গতিরোধ করে ধরে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা ফিরোজের বুকে উপর্যুপরি ছুরি চালিয়ে সমস্ত দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের পেছনে কদমতলী রেললাইনের পাশে রেখে চলে যায়। এলাকার লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মুমূর্ষু ফিরোজকে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ রাত সাড়ে ১১টার দিকে ফিরোজকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে। ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করে ফিরোজকে বাঁচিয়ে তোলার। কিন্তু ঘাতকের নৃশংসতার কাছে সবকিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। সারারাত যন্ত্রণায় ভোগার পর সকালে তিনি মহান আল্লার সান্নিধ্যে চলে যান।

১২ মার্চ বিকেলে লালদীঘি ময়দানে শহীদের জানাজার নামাজ আদায়ের পর লাশ ট্রাকে করে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৩ তারিখ রাতে হাতিয়ার কমরউদ্দিন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে পুনরায় জানাজার নামাজ শেষে তাঁকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

শাহাদাতের পর পিতার প্রতিক্রিয়া

শহীদ ফিরোজ মাহমুদের পিতা মাওলানা শেখ আহমদ অত্যন্ত ধৈর্যশীল মানুষ ছিলেন। সন্তানের শাহাদাতের খবর শুনে তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, "শহীদের পিতা হতে পেরে আমি গর্বিত।"

সুপরিকল্পিত ঘটনা

ফিরোজ হত্যার মাত্র একদিন পূর্বে ১০ মার্চ চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিন ও জিএস আজীম উদ্দিনের নেতৃত্বে দুষ্কৃতিকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে ৭ জন ভর্তিচ্ছু শিবিরকর্মীকে আহত করে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধকালীন অবস্থায় ছাত্ররা ভর্তি ফরম সংগ্রহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। আহত ভর্তিচ্ছু শিবিরকর্মীরা হচ্ছেন কাউসার, ফারুক, মিজান, জাহাঙ্গীর, মঞ্জুর, হাশেম ও জামাল। এই ঘটনার পরদিনই ফিরোজ মাহমুদকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়।

তাঁকে হত্যার পেছনে কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁকে হত্যা করার কোনো স্বাভাবিক কারণও ছিল না। সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন শহীদ ফিরোজ

www.pathagar.com

মাহমুদ। তাঁকে শহীদ করার একমাত্র কারণ কুরআনের ভাষায়, "তাঁদের অপরাধ একটাই তাঁরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে।" ইসলামের পথে অগণিত ছাত্রকে দাওয়াত দিয়েছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম কলেজের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে সুপরিচিতিই তাঁর জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে ফিরোজ মাহমুদকে খুন করে।

একনজরে শহীদ ফিরোজ মাহমুদ

নাম : শেখ মুহাম্মদ ফিরোজ মাহমুদ

পিতার নাম : মাওলানা শেখ আহমদ

স্থায়ী ঠিকানা : তমর উদ্দিন, হাতিয়া, নোয়াখালী

সাংগঠনিক মান : সদস্যপ্রার্থী

সর্বশেষ পড়াশোনা : উদ্ভিদবিদ্যা (শেষ বর্ষ), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দায়িত্ব : চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র-সংসদের নির্বাচিত ম্যাগাজিন সম্পাদক

শাহাদাতের তারিখ : ১১ মার্চ, ১৯৯১

শাহাদাতের স্থান : চট্টগ্রামের বাদুরতলা

যাদের আঘাতে শহীদ : ছাত্রলীগ

আঘাতের ধরন : ছুরিকাঘাত

www.pathagar.com

"তারপর তাদের প্রকৃত মালিক ও প্রভু আল্লাহর দিকে তাদের সবাইকে ফিরিয়ে আনা হয়। সাবধান হয়ে যাও, ফায়সালা করার যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র তিনিই এবং তিনি হিসেব গ্রহণের ব্যাপারে অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন"।

সূরা আন-আমঃ আয়াত- ৬২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অ্যালবাম

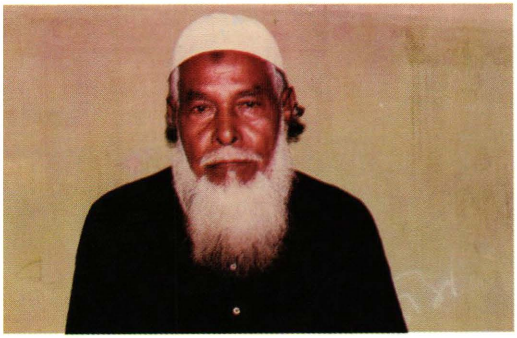

০১

শহীদ সাব্বির আহমেদ

শহীদের গর্বিত পিতা, যিনি আজও পুত্র হারানো ব্যথা নিয়ে বেঁচে আছেন

এই সেই বাড়ি যেখানে শহীদ শাব্বির আহমদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন

যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন শহীদ শাব্বির আহমদ

শহীদের নিথর দেহ পড়ে আছে হাসপাতালের বেডে

www.pathagar.com

শহীদের জানাজায় রাজশাহীর সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ

০২

এই জীর্ণ কুটিরে
জন্মগ্রহণ করেছিলেন
শহীদ আব্দুল হামিদ

পরিবারের সাথে
শহীদের গর্বিত মা

এই মাদ্রাসা থেকে শহীদ
আব্দুল হামিদ ফাজিল পাস
করেছিলেন

www.pathagar.com

গ্রামের মানুষদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য শহীদ আব্দুল হামিদ মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

খাটলিতে চিরনিদ্রায় শায়িত শহীদ আব্দুল হামিদের কফিন

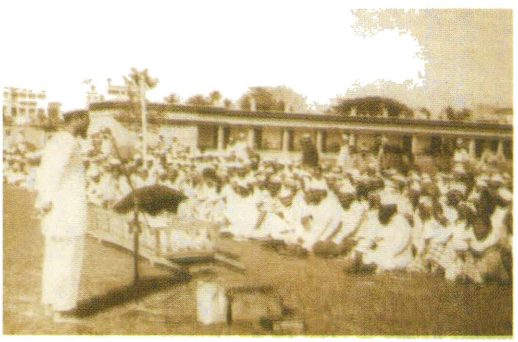

শহীদ আব্দুল হামিদের জানাজাপূর্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আবু তাহের

শহীদ আব্দুল হামিদের কবর

www.pathagar.com

নিজ বাড়ির সম্মুখে
আব্বা-আম্মার সাথে
শহীদ আইয়ুব আলী

আব্বা-আম্মা এখনো আছেন
তবে নেই আইয়ুব আলী
'এই শূণ্যতা পুরণ হবার নয়'

শিক্ষা সফরে বন্ধুদের মাঝে
শহীদ আইয়ুব আলী

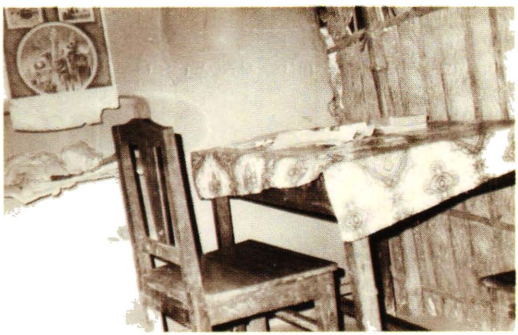

এই পড়ার টেবিলে
অধ্যয়ন করেই
শহীদ আইয়ুব আলী
প্রাথমিক শিক্ষাজীবন
কাটিয়েছেন

www.pathagar.com

শহীদ আইয়ুব আলীর
কফিন

চিরকালের জন্য শায়িত
আছেন শহীদ আইয়ুব আলী

শহীদ আবদুল জব্বার

০৪

বড় ছেলেকে হারিয়ে
নাতি-নাতনীকে নিয়ে ব্যথা
ভোলার চেষ্টা করছেন
শহীদ আব্দুল জব্বারের
বৃদ্ধ মা

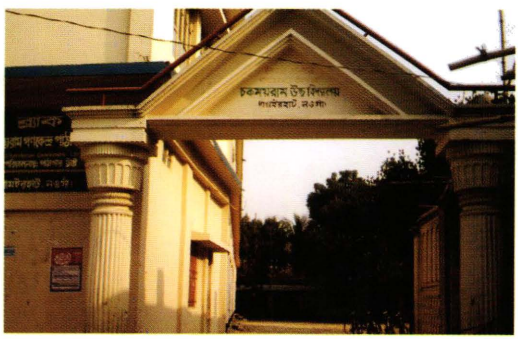

চকময়রাম উচ্চবিদ্যালয়
যেখান থেকে এইচএসসি
পাস করেন
শহীদ আব্দুল জব্বার

স্মৃতি অমলিন

www.pathagar.com

পৃথিবীর মায়া ভুলে নীরবে
অবস্থান করছেন
শহীদ আব্দুল জব্বার

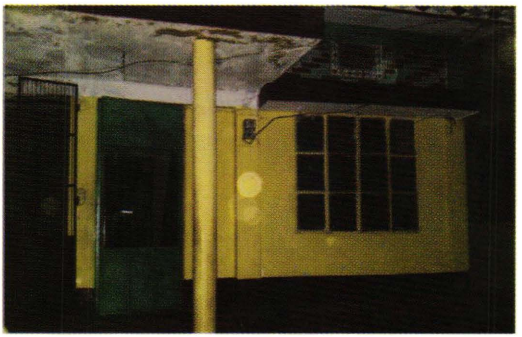

যে বাড়িতে আলোর মুখ
দেখেছিলেন
শহীদ খুরশীদুল আলম

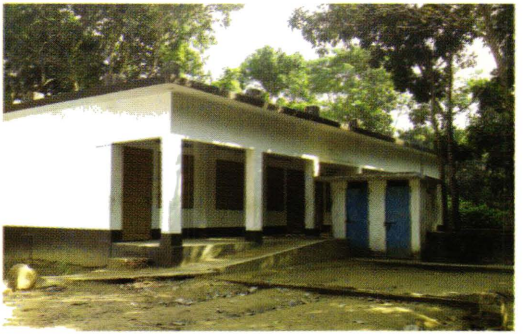

এই স্কুল থেকে
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন
শহীদ খুরশীদুল আলম

শাহাদাতকালে এই মাদ্রাসার
ছাত্র ছিলেন
শহীদ খুরশীদুল আলম

www.pathagar.com

না-জানার দেশে
শহীদ খুরশীদুল আলম

বাড়ির আঙিনায়
শহীদ আব্দুল মতিনের
আম্মা

শহীদ আব্দুল মতিনের
কবর

কুরআন দিবসে ছাত্রসমাবেশে
বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন
কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. সৈয়দ
আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের

www.pathagar.com

১১ মে শহীদদের স্মরণে সড়ক উদ্বোধন করেছেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আব্দুল্লাহ মোঃ তাহের ও পৌর চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান

শহীদ রশিদুল হকের আম্মার সাথে শহীদের ভাতিজা

ছায়া সুনিবিড় শহীদ রশিদুল হকের বাড়ি

শহীদ রশিদুল হকের পিতার সাথে পরিবারের সদস্যরা

www.pathagar.com

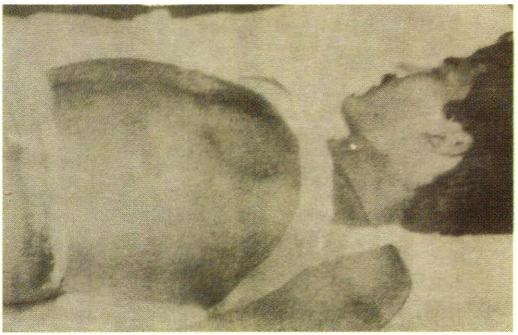

অন্তিম শয়ানে
শহীদ রশিদুল হক

এই জায়গায় চির নিদ্রায়
শায়িত শহীদ রশিদুল হক

পরিবার পরিজনের মাঝে
শহীদ শীষ মোহাম্মদের
গর্বিত পিতা-মাতা

শহীদের কবরে মোনাজাতরত
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল
ইসলাম বুলবুল

www.pathagar.com

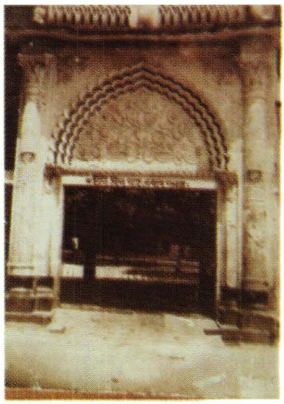

সেই ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দান,
যেখানে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট
ওহিদুজ্জামান মোল্লার হিংস্রতায়
আটজন ভাই শাহাদাতের অমিয়
সুধা লাভ করেন

শহীদ মুহাম্মদ সেলিম

০৯

এখানে শুয়ে আছেন
নিষ্পাপ চাহনির শহীদ
সেলিম

শহীদ সেলিমের
বড় ভাইয়েরা

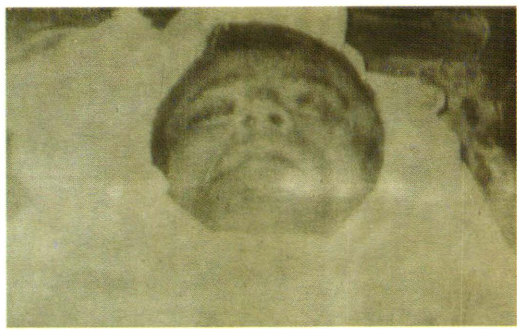

কফিনে ঢাকা
শহীদ সেলিম

www.pathagar.com

পরিবারের মাঝে শহীদের
গর্বিত মা, যে বুকে কষ্ট নিয়ে
আজও বেঁচে আছেন তিনি

যে আর ঘুম থেকে উঠবেন না,
হাসপাতালের বেডে
নীরব হয়ে পড়ে আছেন
শহীদ শাহাবুদ্দীন

কবরের ওপর
শহীদ শাহাবুদ্দীনের
স্মৃতিফলক

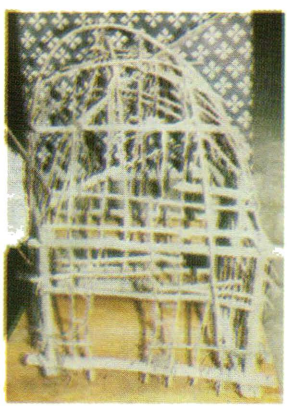

পাখি পোষার জন্য নিজ হাতে এই
খাঁচাটি তৈরি করেছিলেন
শহীদ শাহাবুদ্দীন

www.pathagar.com

১১

অজানার পানে চেয়ে আছেন
শহীদ
মোস্তফা আল মুস্তাফিজ

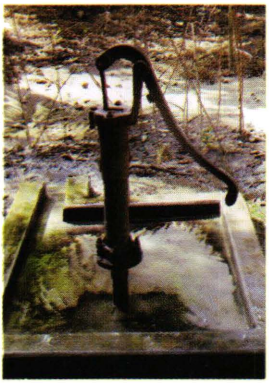

শহীদের কবরের পাশে
নির্মিত টিউবওয়েল

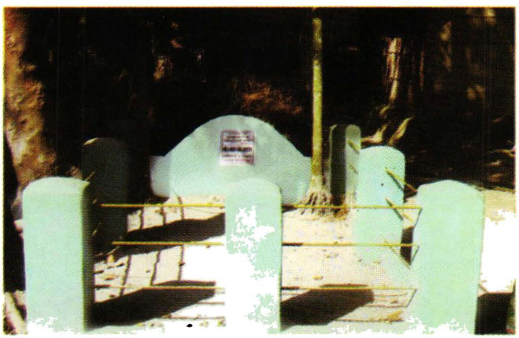

শান্ত সুনিবিড় জায়গায় গভীর
নিদ্রায় শায়িত
শহীদ মোস্তফা আল মোস্তাফিজ

১২

শহীদ
সেলিম জাহাঙ্গীরের
'মা'

www.pathagar.com

যে বাড়িতে
শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীরের
দুরন্ত শৈশব কেটেছে

শাহাদাতকালে
শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর এই
কলেজের অধ্যয়নরত ছাত্র
ছিলেন

এই স্কুল থেকে
শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর
চারটি বিষয়ে লেটারসহ
প্রথম বিভাগে এসএসসি
পাস করেন।

এখানে শুয়ে আছেন
শহীদ সেলিম জাহাঙ্গীর

www.pathagar.com

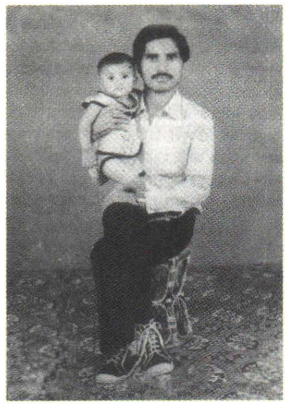

শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে শহীদ
মাহফুজুল হক চৌধুরী

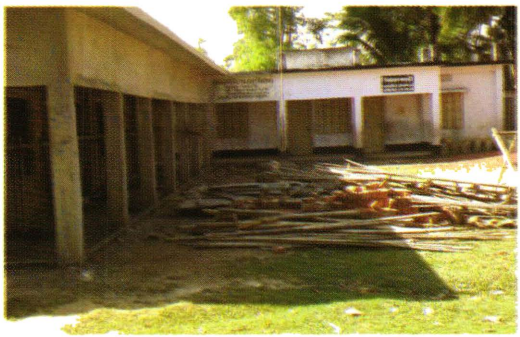

যে বিদ্যালয় থেকে
শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী
প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত
করেছেন

শহীদের সহধর্মিণী
যিনি শহীদের স্মৃতি বুকে
ধারণ করে একমাত্র সন্তানকে
নিয়ে কালাতিপাত করছেন

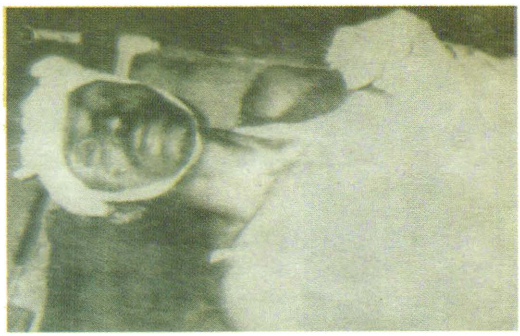

অপলক নেত্রে ঘুমিয়ে আছেন
শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরী

www.pathagar.com

শহীদ মহফুজুল হক
চৌধুরীর নামাজের
জানাযায় মানুষের ঢল

শহীদ মাহফুজুল হক
চৌধুরীর কবর

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

১৪

এইভাবে আর কোন দিন
বক্তব্য দিতে দেখা যাবে না
শহীদ জাফর জাহাঙ্গীরকে

শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর ও
বাকীর খুনিদের
গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ
মিছিলরত চট্টগ্রামবাসী

www.pathagar.com

অন্তিম নিদ্রায় শায়িত
শহীদ জাফর জাহাঙ্গীর

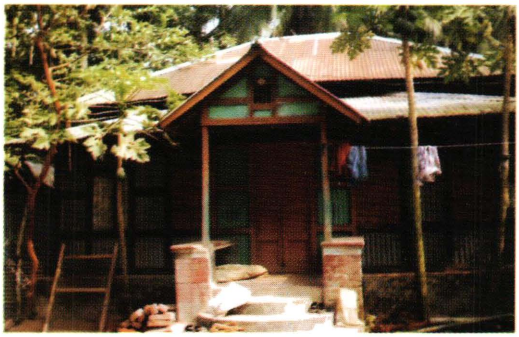

শহীদ বাকীউল্লাহর গ্রামের
বাড়ি, যেখানে তার দুরন্ত
শিশুকাল কেটেছে

এই স্কুলেই
শহীদ বাকীউল্লাহ প্রাথমিক
শিক্ষা সমাপ্ত করেন

শহীদ বাকীউল্লাহ যে মসজিদে
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন
তার পাশেই না ফেরার
জগতে শায়িত

www.pathagar.com

শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে গড়ে তোলা পাঠাগার 'শহীদ বাকীউল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার'

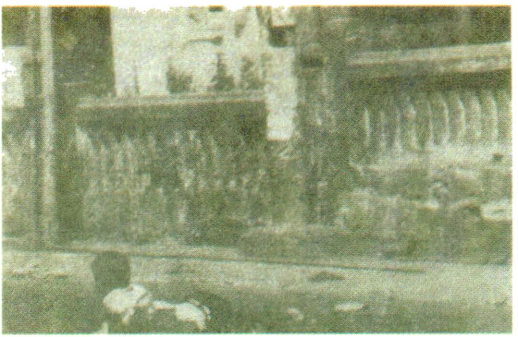

শহীদ আমির হোসাইন শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে মাথা তুলে শত্রুদের দেখে নিচ্ছিলেন

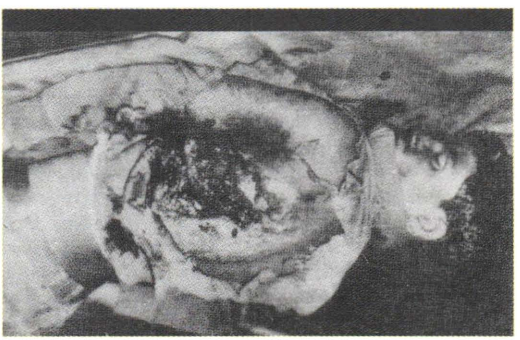

শক্তিশালী বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত শহীদ আমির হুসাইন

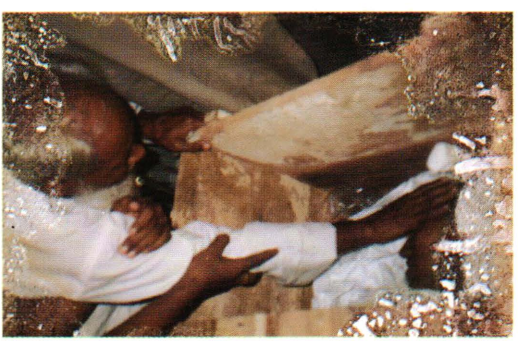

শহিদ আমির হুসাইন এর মুখমণ্ডলে শেষবারের মত হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন গর্বিত বাবা মোয়াজ্জেম হোসেন

www.pathagar.com

শাহাদাত পরবর্তী বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্বদান করছেন সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের

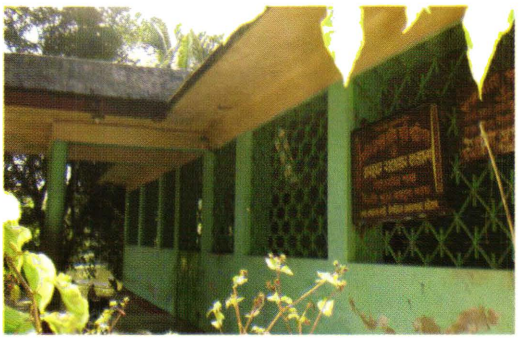

শহীদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত পাঠাগার

শহীদের স্মরণে নির্মিত ছাত্রাবাস

বায়তুশ শরফ আদর্শ মাদ্রাসা, যেখান থেকে দাখিল পরীক্ষায় মাদ্রাসা বোর্ডে সপ্তম স্থান অধিকার করেছিলেন হাফেজ আব্দুর রহিম

www.pathagar.com

নিষ্পাপ মুখটি যেন আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য চেয়ে আছেন

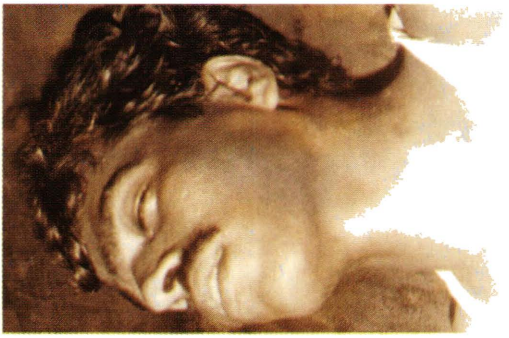

অপলক পানে মহান প্রভুর দিকে তাকিয়ে আছেন শহীদ হাফেজ আব্দুর রহিম

এই কবরে ঘুমিয়ে আছেন শহীদ আব্দুর রহীম

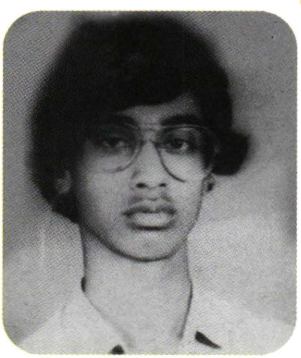

শহীদ জসিমুদ্দীন চৌধুরী

www.pathagar.com

শহীদ জসিম উদ্দিন চৌধুরীর
খুনিদের ফাঁসির দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল

নিজ বাড়ির সামনে
দুই ছেলের সাথে শহীদের
মমতাময়ী পিতা-মাতা

কফিনে শায়িত
শহীদ আব্দুল আজিজ

রংপুর কারমাইকেল কলেজে
নির্মিত আব্দুল আজিজ
বিশ্রামাগার

www.pathagar.com

এখান থেকেই প্রাইমারি
শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন
শহীদ আব্দুল আজিজ

এগোলমুন্ডা দ্বি-মুখী
উচ্চবিদ্যালয়, যেখান থেকে
দ্বিতীয় বিভাগে
এসএসসি পাস করেন

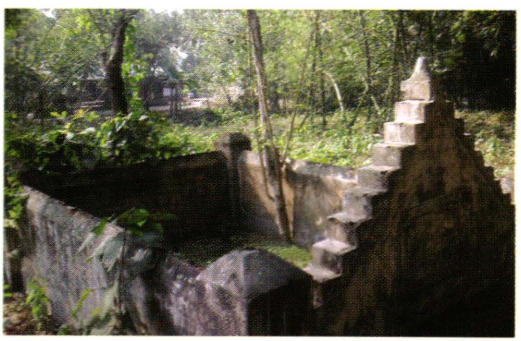

নীরব শহরে অবস্থানরত
শহীদ আব্দুল আজিজ

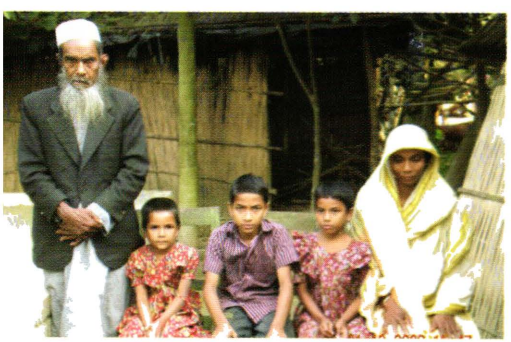

নাতি-নাতনীদের সাথে
শহীদের বৃদ্ধ পিতা

www.pathagar.com

কবরের সামনে নীরবে
দণ্ডায়মান শহীদের পিতা

এই স্কুল থেকে প্রাথমিক
শিক্ষা সমাপ্ত করেন
শহীদ আইনুল হক

শহীদ আইনুল হকের
মায়ের আহাজারি আর
দেখা যাবে না

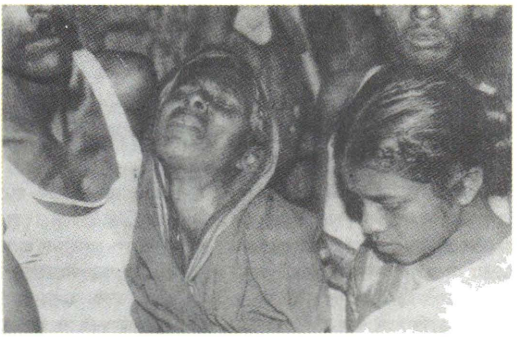

শহীদের ছবি হাতে গর্বিত মা
দেলোয়ারা বেগম

www.pathagar.com

এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেন
ক্ষণজন্মা পুরুষ
শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরী

এই স্কুল থেকে পাঁচটি বছর
শিক্ষাগ্রহণ করেছেন

কলেজ ক্যাম্পাস মুখরিত ছিল
শহীদ নাসিম উদ্দিন চৌধুরীর
পদচারণায়

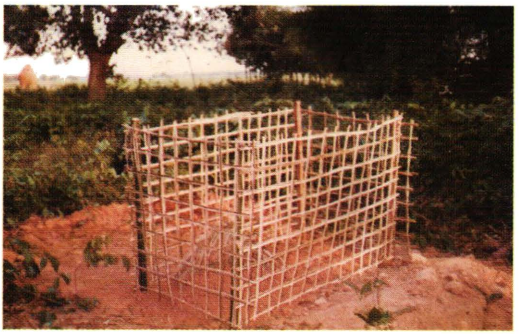

নীরবে অবস্থান করছেন
শহীদ নাসিম

www.pathagar.com

বৃদ্ধ পিতা-মাতা আজও আমিনুল ইসলামের পথ চেয়ে আছেন

শাহাদাতের পর রক্তাক্ত দেহ নিয়ে নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সন্ত্রাসীদের

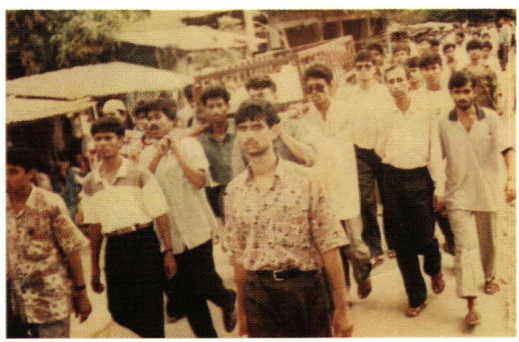

শাহাদাতের পর কফিন নিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শহীদের সাথীরা

আমিনুল ইসলামের শাহাদাত স্মরণে চট্টগ্রামবাসীর শোক মিছিল

www.pathagar.com

অজানা দেশে অবস্থান করছেন
শহীদ আমিনুল ইসলাম

সাদা কফিনে জড়ানো শহীদ
আব্দুস সালাম আজাদের দেহ

শাহাদাত পরবর্তী শহীদের
সাথীদের মিছিল

খুনিদের ফাঁসির দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিলরত শহীদ
আব্দুস সালামের সাথীরা

www.pathagar.com

শহীদের গর্বিত
বৃদ্ধ পিতা-মাতা

আব্দুল লতিফ হলের ২৪৮ নং কক্ষ, যেখানে শহীদ আসলাম হোসাইনের ক্যাম্পাস জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে।

ঘাতকরা এই হকিস্টিক দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ফেলে যায় শহীদ আসলাম হোসাইনকে

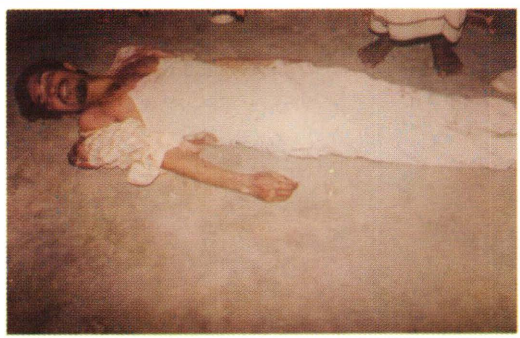

সন্ত্রাসীরা এভাবেই নির্মম নির্যাতনের মাধ্যমে শহীদ করে ফেলে রাখে মেধাবী ছাত্র আসলাম হোসাইনকে

www.pathagar.com

কফিনে শায়িত শহীদ
আসলাম হোসাইন

শাহাদাত-পরবর্তী শোক মিছিল
উত্তর সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন
তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়
সভাপতি আব্দুল লতিফ

সন্তানের কবর জিয়ারত
করছেন বৃদ্ধ পিতা
ডা. জিন্নাত আলী

বিক্ষোভ মিছিলে শহীদের সাথীরা

নাতনী সন্তানকে নিয়ে
শহীদের গর্বিত স্ত্রী
দিলরুবা বেগম

শহীদের জন্মদাত্রী
মা আকলিমা খাতুন

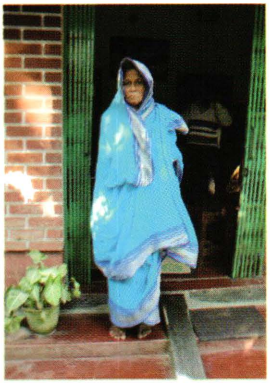

এই বাড়িতেই বেড়ে ওঠেন
শহীদ আসগর আলী

শোক মিছিলে
শহীদের সাথীরা

চিরনিদ্রায় শায়িত
শহীদ আসগর আলী

www.pathagar.com

সঙ্গীত কলেজ, যেখানে শহীদ হওয়ার কিছুদিন পূর্বে শহীদ আসগর প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন

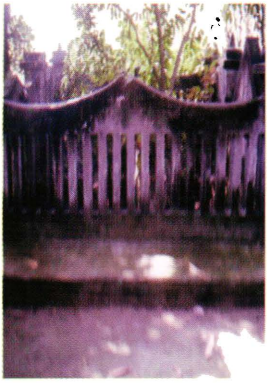

শহীদ আসগর আলীর কবর

শহীদের গর্বিত মা

এই মাদ্রাসা থেকেই দাখিল ও আলিম পাস করেন শহীদ সায়েম

www.pathagar.com

খুনিদের ফাঁসির দাবিতে প্রতিবাদ সভা করছে রংপুর শহর শাখা

নিস্তব্ধ দেহ, শহীদ আবু সাঈদ মোঃ সায়েম

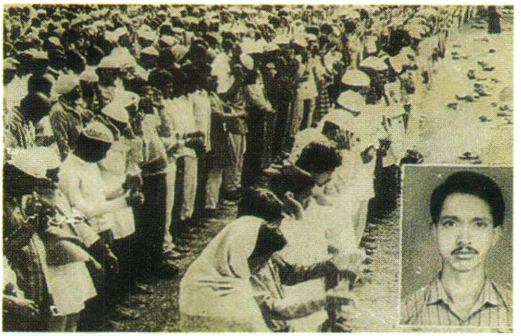

জানাযার নামাযে শোকার্ত মানুষের অংশগ্রহণ

ঘাতকদের ফাঁসির দাবিতে শহীদের সাথীরা

www.pathagar.com

নীরব ঘরে অবস্থান করছেন শহীদ সায়েম

শহীদের মা আজও অশ্রু ঝরান ছেলে হারানোর ব্যথায়

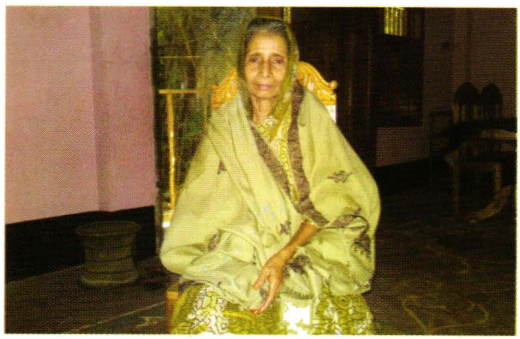

হাসপাতালের বেডে পড়ে আছে শহীদ তারিকুল আলমের নিথর দেহ

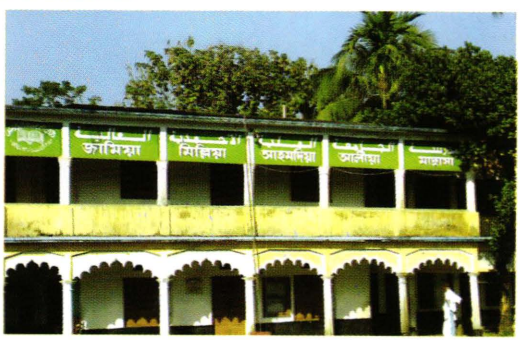

আলিয়া মাদ্রাসা এক সময় শহীদ তারিকুল ইসলামের পদচারণায় মুখরিত ছিল

www.pathagar.com

শহীদ জসীম উদ্দিন মাহমুদ
এই কক্ষে লেখাপড়া করতেন

শহীদ জসীম উদ্দিন
মাহমুদের পিতার সাথে
শিবির নেতৃবৃন্দ

শহীদ জসিম উদ্দিন মাহমুদ
এর জানাজার
নামাজে মানুষের ঢল

শোক মিছিলে
শিবির নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

শহীদ শফিকুল ইসলামের
পরিবারের সাথে গর্বিত
পিতা-মাতা

নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে
শহীদ শফিকুল ইসলামের
লাশ

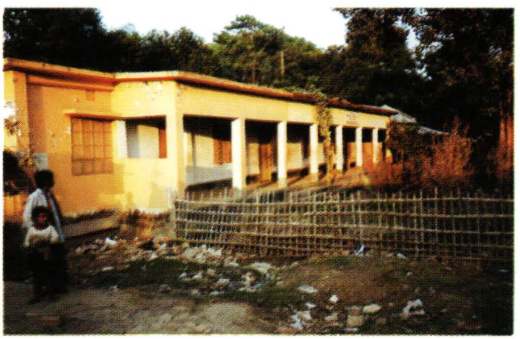

যেখান থেকে পঞ্চম শ্রেণী
পাস করেন
শহীদ শফিকুল ইসলাম

পোস্টমর্টেম এর পর
কফিনবদ্ধ শহীদ শফিকুল
ইসলাম

www.pathagar.com

শোক মিছিলরত
শিবির নেতৃবৃন্দ

অজানা দেশের পানে
শহীদ শফিকুল ইসলাম

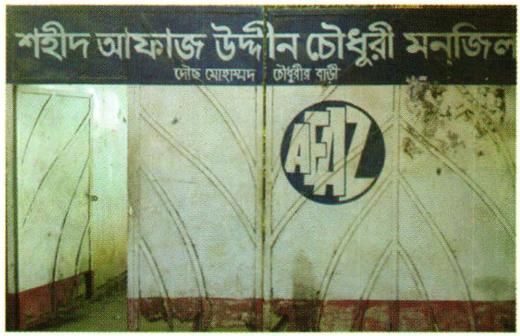

বাড়ির নামকরণ করা হয়েছে
শহীদের নামে

এই কলেজ থেকে এইচএসসি
পাস করেন
শহীদ আফাজ উদ্দিন

www.pathagar.com

রক্তাক্ত দেহ নিয়ে আহাজারি করছেন শহীদদের সাথীরা

শহীদ আফাজ উদ্দিন ভাইয়ের শাহাদাত বার্ষিকীতে আলোচনারত সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান

শহীদের কবর

শহীদ শিহাব উদ্দিন

৩১

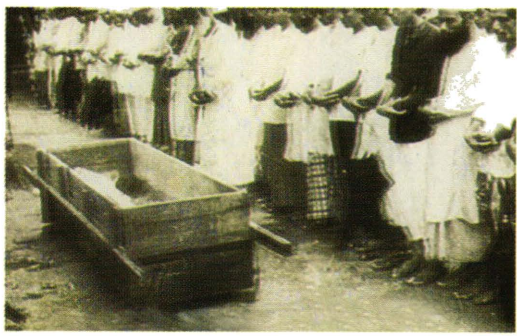

শহীদ শিহাব উদ্দিনের জানাযার নামাযে উপস্থিতির একাংশ

www.pathagar.com

শোক মিছিলে
শহীদের সঙ্গীরা

না ফেরার দেশে
শহীদ শিহাব উদ্দিন

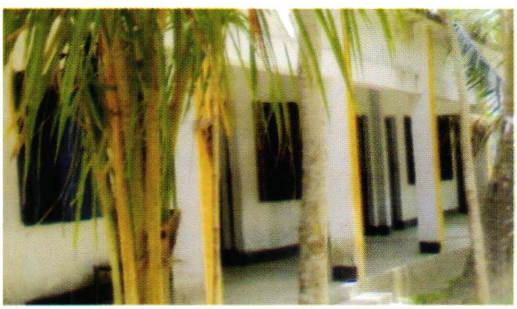

মাছিমপুর ইসলামিয়া ফাযিল
মাদ্রাসা, যেখানে শহীদ
শিহাবুদ্দিনের ষষ্ঠ থেকে
ফাযিল পর্যন্ত দুরন্ত সময়
কেটেছে

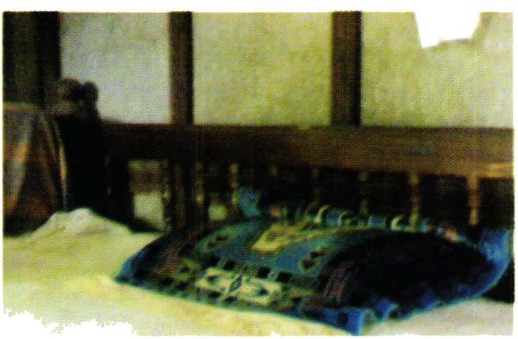

এই খাটটি আর
শহীদ শিহাবুদ্দিনের
স্পর্শ পাবে না

www.pathagar.com

শহীদ মীর আনছার উল্লা

(৩২)

শহীদ মীর আনছার উল্লার
খুনিদের ফাঁসির দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল

সাহসী সৈনিক সবসময়
থাকতেন মিছিলের অগ্রভাগে

শহীদ খোরশেদ আলম

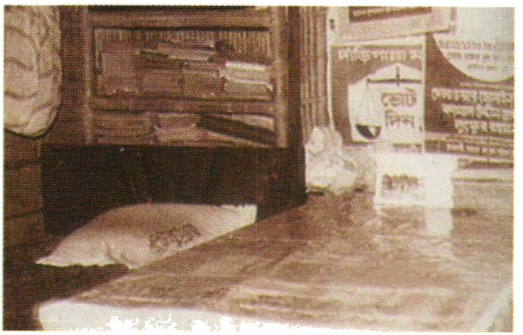

(৩৩)

শহীদ খোরশেদ আলমের
নিথর দেহ

এই বিছানাতেই বিশ্রাম
নিতেন
শহীদ খোরশেদ আলম

জ্ঞানার্জনের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন এই ঘরটিকে শহীদ খোরশেদ আলম

শহীদ খোরশেদ আলমের দুরন্ত বাল্যকাল কেটেছে এই বাড়িতে

ঘুমিয়ে আছেন শহীদ জহির উদ্দিন মোহাম্মদ লিটন মনে হচ্ছে একটু পরই জেগে উঠবেন

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ লিটন ভাইয়ের শৈশবকাল এই বাড়িতে অতিবাহিত হয়েছে

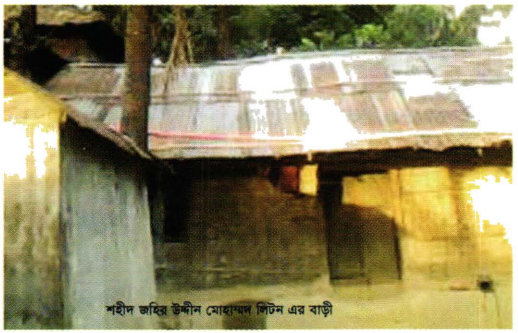

শহীদ জহির উদ্দীন মোহাম্মদ লিটন এর বাড়ী

www.pathagar.com

সন্ত্রাসীদের ফাঁসির দাবিতে
বিক্ষোভ মিছিল

বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত
হয়ে পড়ে আছে
হাফেজ ইয়াহিয়ার দেহ

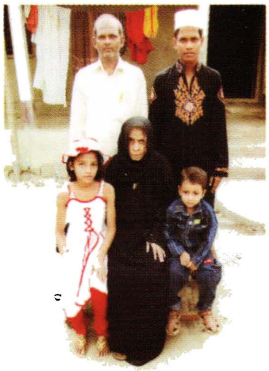

শহীদ আলী হোসাইন-এর
গর্বিত পিতা মাতা

এই বইগুলোর মাঝেই
শহীদ আলী হোসাইন
জ্ঞান অন্বেষণ করতেন

www.pathagar.com

শহীদ আলী হোসেন-এর
নিজ হাতে লেখা
কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত

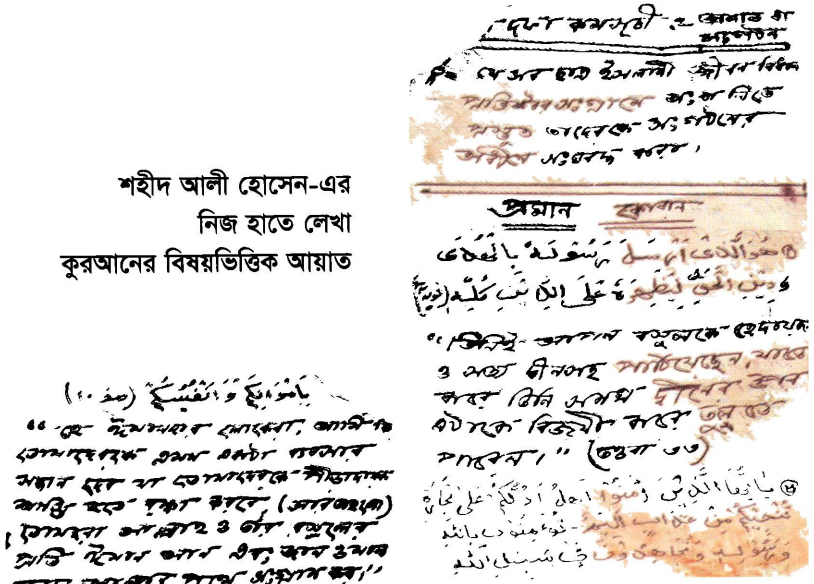

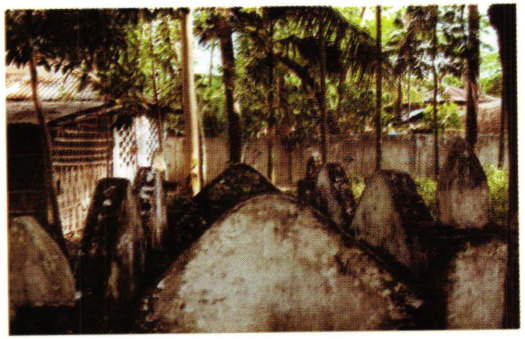

না ফেরার দেশে
শহীদ আলী হোসেন

স্মৃতি অমলিন

www.pathagar.com

শহীদ আব্দুল খালেকের জানাযা পড়াচ্ছেন ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

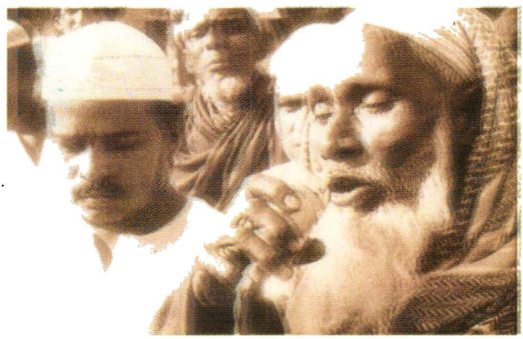

শহীদের লাশকে সামনে নিয়ে শোকাচ্ছন্ন পিতার বক্তব্য

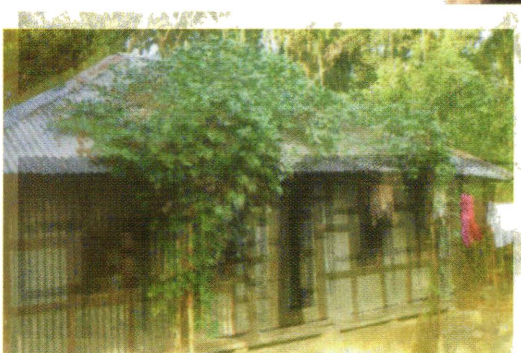

এই কুটিরেই পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন শহীদ আব্দুল খালেক

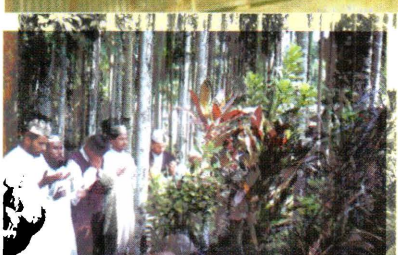

পিতা ও বড় ভাইকে সাথে নিয়ে শহীদ আ. খালেকের কবর জিয়ারত করছেন ঢাকা আলীয়া মাদরাসা সভাপতি নিজামুল হক নাঈম

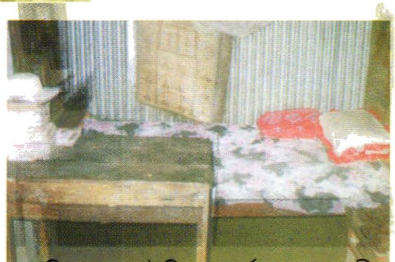

বিছানা ও টেবিল স্পর্শ পায় না শহীদ আব্দুল খালেকের

www.pathagar.com

না জাগার ঘুমে আচ্ছন্ন

শহীদের পদচারনায় আর মুখরিত হয় না এই মাদ্রাসা

শহীদ আব্দুল খালেক আর ফিরবে না নীরব জায়গা থেকে

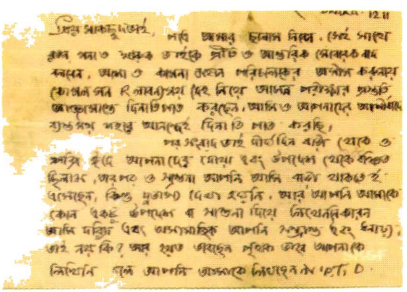

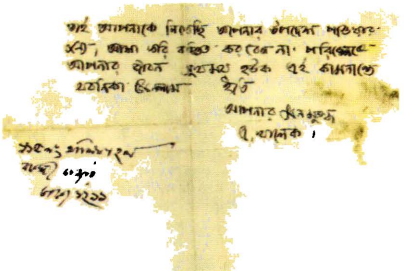

স্মৃতি অম্লান

www.pathagar.com

ভায়ের স্মৃতি ধারণ করে
আছেন
শহীদ মোজাহেরের
একমাত্র বোন

শহীদ মোজাহের আলীর একমাত্র বোন

শহীদ মোজাহেরের
স্মৃতিবিজড়িত ফাযিল মাদ্রাসা

এই বাড়িতেই বেড়ে উঠছিলেন
শহীদ মোজাহের আলী

শহীদ মোজাহের আলীর ভিটা বাড়ী

শহীদ মোজাহের আলীর কবর

বাঁশবাগানে শান্ত সুবিমল
জায়গায় শুয়ে আছেন শহীদ
মোজাহের আলী

www.pathagar.com

শহীদ মোজাহের আলী
ভাইসহ আত্মীয়স্বজন

শহীদ খলিলুর রহমানের
নামাজে জানাযা

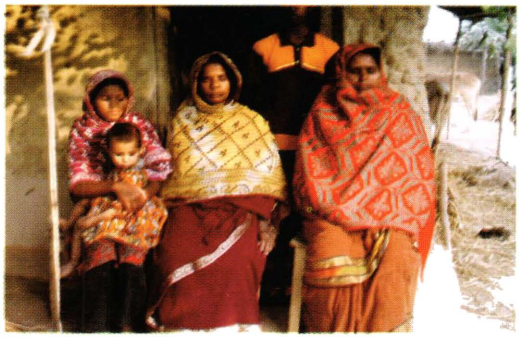

শহীদ খলিলুর রহমানের
পরিবারের সদস্যরা

যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত
শহীদ খলিলুর রহমান

www.pathagar.com

শহীদ ফিরোজ মাহমুদের খুনিদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলে ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুল

ঘুমিয়ে আছেন শহীদ ফিরোজ মাহমুদ, আর জাগবে না

শহীদ ফিরোজ মাহমুদ ভাইয়ের বয়োবৃদ্ধ গর্বিত পিতা মাওলানা শেখ আহমদ

শহীদ ফিরোজ মাহমুদ ভাই এই কবরে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন

www.pathagar.com

শহীদ মাহফুজুল হক চৌধুরীর বড় ভাই

শামসুল হক চৌধুরীর ভাষ্য

'শহীদ মাহফুজ সকল ধরনের মানসিক দুর্বলতার উর্ধ্বে এক নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিল। সে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে ছিল আপসহীন, আনুগত্যের বেলায় অত্যন্ত সচেতন।'

শহীদ হওয়ার পূর্বে স্মরণীয় বাণী

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হলে জীবন দিতে আমি কুণ্ঠিত নই। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতি ঘরে ইসলামী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমি আমরণ চেষ্টা করে যাব।

www.pathagar.com